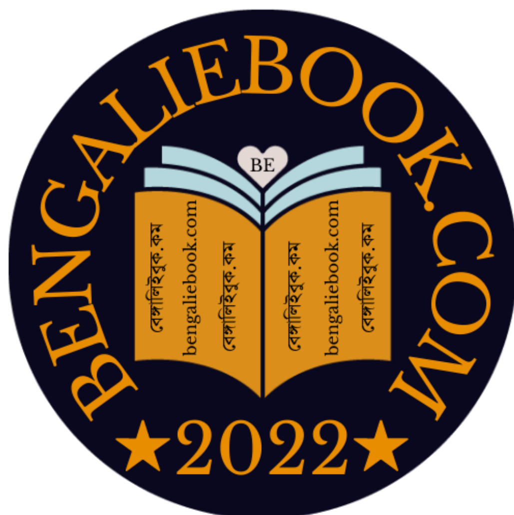
পৃথিবীর সেরা থ্রিলার গল্প

অনীশ দাস অপু



সূচিপত্র

ভূমিকা

বইয়ের নামটি দিয়েছেন প্রকাশক। এর আগে তিনি পৃথিবীর সেরা রূপকথা নামে আমার একটি বই করেছিলেন। বইটি দারুণ চলেছিল। এখনো সমান। তালে চলছে। প্রকাশকের ইচ্ছা পৃথিবীর সেরা শিরোনামে আরও বেশ কিছু বই করবেন।

তবে আমি পাঠকদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি এ বইটিতে আমি দারুণ সব থ্রিলার গল্প দিয়েছি যা তাঁদের অবশ্যই ভালো লাগবে। থ্রিলারের আভিধানিক অর্থ রোমাঞ্চ। তো রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো চমৎকার সব গল্প আছে বইটিতে। বলা বাহুল্য একেকটি একেক স্বাদের। আর থ্রিলার গল্পে। যেসব টুইস্ট থাকা দরকার তার কোনো কার্পণ্যই নেই। কোনো কোনো গল্পের শেষে এমন চমক আছে যা পড়ে পাঠক স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

বইটিতে জেফরি আর্চার, ফ্রেডরিক ফোরসাইথ, জেমস হেডলি চেজ, হেনরি স্লেসার এর মতো বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখকদের দারুণ সব গল্প দেয়া হয়েছে। রয়েছেন এডগার অ্যালান পো, এমব্রোস বিয়ার্স বা রাডিয়ার্ড কীপলিং এর মতো ভিন্টেজ লেখকরাও।

কিছু অপরিচিত লেখকের গল্প আছে বইটিতে। তবে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে তারা অচেনা হলেও বিদেশে রোমাঞ্চ গল্প লেখক হিসেবে যথেষ্টই সমাদৃত। আর আমি চেষ্টা করেছি এসব লেখকের সবচেয়ে চমকপ্রদ গল্পগুলো দিতে।

থ্রিলারের নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার-থ্রিলার, হরর থ্রিলার, মিস্ট্রি-থ্রিলার, ফ্যান্টাসি-থ্রিলার ইত্যাদি। এ বইতে সবরকম থ্রিলার গল্পের সন্নিবেশ ঘটেছে।

জেফরি আর্চারের অ্যান আই ফর অ্যান আই মিস্ট্রি থ্রিলার, রাডিয়ার্ড কীপলিং এর গল্পটি পুরোপুরি অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার, আবার এমব্রোস বিয়ার্সের গল্পটিকে হরর থ্রিলারের কাতারে ফেলা যায়। বোভার ড্রাগন খুবই মজাদার ফ্যান্টাসি থ্রিলার। পাঠক এ গল্পটি পড়ে খুবই মজা পাবেন, সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর সেরা থ্রিলার গল্পতে যে ১৬টি গল্প দেয়া হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন বই থেকে অনুবাদ করা। তবে এখানে কিন্তু বাই কাইন্ডনেস, ওয়েটি প্রবলেম এবং ট্র্যাপ নামে যে তিনটি ভিন্টেজ থ্রিলার দিয়েছি তা বহু আগে লেখা। গল্পগুলো পুরানো-নতুন সব পাঠকের কাছেই চমৎকার লাগবে। তিনটে গল্পই আমার এত প্রিয় যে এ সংকলনে না দিয়ে পারলাম না।

আমাদের দেশে গত কয়েক বছর ধরে থ্রিলার পাঠকদের সংখ্যা বৃদ্ধি। পাচ্ছে। এটি শুভ লক্ষণ। জিনিয়াস এর কর্ণধার ইতিমধ্যেই আমার সঙ্গে কয়েকটি থ্রিলার বই প্রকাশের

বিষয়ে চুক্তি করেছেন। বইমেলার পরে সেই বইগুলোতে হাত দেয়ার ইচ্ছে আছে। বিশ্বখ্যাত সব থ্রিলার লেখকের দুর্দান্ত সব থ্রিলার কাহিনি। আমার বিশ্বাস প্রতিটি বই-ই পাঠকদের মন জয় করতে সক্ষম হবে। অপেক্ষা করুন। আসছি আমি নিত্য নতুন থ্রিলার অনুবাদ নিয়ে!

অনীশ দাস অপু

অ্যান আই ফর অ্যান আই – জেফরি আর্চার

স্যার ম্যাথিউ রবার্টস কিউ সি (কুইনস কাউন্সেল বা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী) ফাইলটি বন্ধ করে তার সামনের ডেস্কের ওপর রাখলেন। তিনি খুব অসন্তুষ্ট। মেরি ব্যাঙ্কসকে তিনি রক্ষা করতে চান তবে ভদ্রমহিলা যে নট গিল্টি বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে সেই ব্যাপারে খুব একটা ভরসা পাচ্ছেন না।

নরম চামড়ার গদিতে হেলান দিলেন স্যার ম্যাথিউ। মামলাটি নিয়ে ভাবছেন। অপেক্ষা করছেন সলিসিটরের জন্য। তিনি স্যার ম্যাথিউকে ব্রিফ করেছেন। তাঁর জুনিয়র কাউন্সেলও আসবে। তাকে এ কেসের জন্য নির্বাচন করেছেন ম্যাথিউ। মিডল টেম্পল কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন আশা করি সঠিক সিদ্ধান্তটিই নেয়া হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় রেজিনা বনাম ব্যাঙ্কসের এ মামলাটি মামুলি একটি মার্ডার কেস। তবে ব্রুস ব্যাঙ্কস তাদের এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে যেভাবে তার স্ত্রীকে দমন করে রাখত, নির্যাতন চালাত, তাতে স্যার ম্যাথিউ নিশ্চিত তিনি এ হত্যা মামলার শাস্তি শুধু কমিয়ে আনতেই পারবেন না, জুরি বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য যদি থাকেন নারী, তাহলে বিবাদীকে খালাস করে আনাও সম্ভব হতে পারে। তবে এখানে একটি জটিলতা রয়েছে।

তিনি একটি সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান দিলেন, যদিও ধূমপান তাঁর স্ত্রী মোটেই পছন্দ করতেন না। এ জন্য বকাও দিতেন। স্যার ম্যাথিউ ডেস্কে, তাঁর সামনে রাখা ভিক্টোরিয়ার ছবিটির দিকে তাকালেন। ছবিটি তাকে তার যৌবনকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে ভিক্টোরিয়া সবসময় তরুণীই থাকবেন মৃত্যু তাঁর জন্য ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি মনোযোগ ফেরালেন তার ক্লায়েন্ট এবং মিটিগেশনের জন্য তার আবেদনের প্রতি। তিনি ফাইলটি আবার খুললেন। মেরি ব্যাঙ্কসের দাবি সে তার স্বামীকে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে শূকরের খোঁয়াড়ের নিচে কবর দেয়নি। কারণ স্বামীর মৃত্যুর সময় সে স্থানীয় হাসপাতালে রোগী হিসেবেই শুধু ছিল না, তখন সে চোখেও দেখত না। স্যার ম্যাথিউ আবারও বুক ভরে ধোঁয়া টানলেন। এমন সময় দরজায় কেউ নক করল।

ভেতরে আসুন, তিনি গাঁক গাঁক করে উঠলেন– শুধু এ কারণে নয় যে নিজের কণ্ঠটি তার পছন্দ, আসলে হুঙ্কার না ছাড়লে ভীষণ পুরু দরজার ওপাশে তাঁর গলা শোনা যাবে না।

স্যার ম্যাথিউর ক্লার্ক দরজা খুলে ঘোষণা করল মি. বার্নার্ড ক্যাসন এবং মি. হিউ উইদারিংটন এসেছেন। দুজন একদম আলাদা স্বভাবের মানুষ, ওঁরা ভেতরে প্রবেশ করলে মনে মনে ভাবলেন স্যার ম্যাথিউ, তবে এ মামলায় উভয়েই তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

বার্নার্ড ক্যাসন পুরানো আমলের সলিসিটর ফর্মাল, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সবসময়ই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পটু। তিনি সারা বছর একইরকম সুট পরে থাকেন, পরিবর্তন হয় না কখনো। ম্যাথিউ প্রায়ই ভাবেন ভদ্রলোক সস্ত রি মার্কেট থেকে একইরকম আধডজন সুট কিনে রেখেছেন কি-না যা তিনি পালাক্রমে প্রতি সপ্তাহে পরিধান করেন।

তিনি তাঁর অর্ধচন্দ্রাকৃতির চশমার ওপর দিয়ে ক্যাসনের দিকে তাকালেন। আইনজীবীটির সরু গোঁফ এবং পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো কেশ চেহারায় সেকেলে একটা ভাব এনে দিয়েছে যা অনেক প্রতিপক্ষকেই বোকা বানিয়ে দেয় যখন তাঁরা ভাবেন লোকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রিটিশ নাগরিক। তবে স্যার ম্যাথিউ নিয়মিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাগ্যিস তার বন্ধুটি কোনো পাবলিক স্পীকার নন, কারণ বার্নার্ড ব্যারিস্টার হলে আদালতে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ানোর স্বাদটি তিনি উপভোগ করতে পারতেন না।

ক্যাসনের এক কদম পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার জুনিয়র কাউন্সেল হিউ উইদারিংটন। উইদারিংটন পৃথিবীতে আসার সময় সৃষ্টিকর্তা তার প্রতি খুব একটা হৃদ্যতা দেখাননি। কারণ ছেলেটার না আছে চেহারা না মস্তিষ্ক। ঈশ্বর ওকে যদি কোনো গুণ দিয়েও থাকেন, তাহলে তা এখনও আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয়নি। বেশ কয়েকবার চেষ্টা-তদবিরের পরে উইদারিংটনকে বার এ সদস্যপদ দেয়া হয়েছে। এ মামলায় যখন উইদারিংটনের নাম জুনিয়র কাউন্সেল হিসেবে প্রস্তাব করা হয় তখন স্যার ম্যাথিউর

ক্লার্কের কপালে ভাঁজ পড়েছিল, তবে প্রত্যুত্তরে স্যার ম্যাথিউ হাস্য করেছেন কেবল, কোনো ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন বোধ করেননি।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্যার ম্যাথিউ, অ্যাশট্রেতে সিগারেটটার গলা টিপে মারলেন এবং উপস্থিত দুই অভ্যাগতকে ডেস্কের অপর পাশের খালি চেয়ারে বসার ইশারা করলেন। ওঁরা বসার পরে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন।

আমার অফিসের আসার জন্য ধন্যবাদ, মি. ক্যাসন, বললেন তিনি। যদিও উভয়েই জানেন সলিসিটরটি বার এর সদস্যপদটি ধরে রাখা ছাড়া আর কোনো কাজ করেন না।

মাই প্লেজার, স্যার ম্যাথিউ, জবাবে বললেন বৃদ্ধ সলিসিটর। মৃদু বো করলেন দেখাতে এখনো তিনি পুরানো সৌজন্যবোধগুলো বজায় রেখেছেন।

আপনার বোধহয় হিউ উইদারিংটনের সঙ্গে পরিচয় নেই, সাদামাটা চেহারার তরুণ ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন স্যার ম্যাথিউ। ও এ মামলায় আমাকে সাহায্য করছে।

উইদারিংটন নার্ভাস ভঙ্গিতে ব্রেস্ট পকেটে রাখা সিল্কের রুমালটি স্পর্শ করল।

না, মি. উইদারিংটনের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি, করিডরে কেবলই দেখা হলো, বললেন ক্যাসন। আপনি এ মামলাটি নিয়েছেন বলে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছে, স্যার ম্যাথিউ।

বন্ধুর ফরমালিটিতে হাসলেন ম্যাথিউ। তিনি জানেন জুনিয়র কাউন্সেল উপস্থিত থাকাকালীন বার্নার্ড কখনোই তাকে তার ডাক নামে ডাকার কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। আপনার সঙ্গে আবার কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি বলে আমি খুবই খুশি, মি. ক্যাসন। যদিও এ মামলায় আপনি আমাকে একরকম চ্যালেঞ্জের মুখেই ফেলেছেন।

খেজুরে আলাপ শেষ, বৃদ্ধ সলিসিটর তার জরাজীর্ণ গ্লাডস্টোন ব্যাগ থেকে বাদামী রঙের একটি ফাইল বের করলেন। আপনার সাথে শেষবার দেখা হওয়ার পরে আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে আরেকবার কথা হয়েছে। তিনি ফাইলটি খুললেন, আপনার মতামত তাঁকে জানিয়েছি। তবে মিসেস ব্যাঙ্কস নট গিল্টির আবেদন করতে বদ্ধপরিকর।

তিনি তাহলে এখনো নিজেকে নিরপরাধ বলে দাবি করছেন?

জি, স্যার ম্যাথিউ। মিসেস ব্যাঙ্কস জোর দিয়ে বলছেন তিনি খুনটি করেননি কারণ স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর স্বামী তাকে অন্ধ করে দেন। আর স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি স্থানীয় হাসপাতালে রোগিণী হিসেবে ভর্তি ছিলেন।

মৃত্যুর সময়টি নিয়ে প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট অস্পষ্ট, পুরানো বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন স্যার ম্যাথিউ। লাশ আবিষ্কার হয়েছে বেশ কয়েকদিন পরে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, মিসেস ব্যাঙ্কসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চব্বিশ কিংবা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই হত্যাকাণ্ডটি সাধিত হয়।

আমিও ওদের রিপোর্ট পড়েছি, স্যার ম্যাথিউ, বললেন ক্যাসন। এবং এর তথ্য উপাত্তগুলো মিসেস ব্যাঙ্কসকে জানিয়েছি। কিন্তু তিনি বারবার বলছেন এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এবং জুরিরা নাকি এ কথা বিশ্বাসও করবেন। বিশেষ করে যখন স্যার ম্যাথিউ রবার্টস আমার ডিফেন্ডার হিসেবে আছেন, ঠিক এ কথাগুলোই তিনি বলেছিলেন যদুর মনে পড়ে। হেসে যোগ করলেন তিনি।

শুনে আমি বিমোহিত হতে পারলাম না, আরেকটি সিগারেট ধরালেন স্যার ম্যাথিউ।

আপনি ভিক্টোরিয়াকে কথা দিয়েছিলেন– এক মুহূর্তের জন্য বর্ম নামিয়ে ফেললেন সলিসিটর। তবে ওই একবারই বললেন কথাটা।

তো তাঁকে কনভিন্স করার একটাই সুযোগ আছে আমার। বন্ধুর মন্তব্য গ্রাহ্যে আনলেন না স্যার ম্যাথিউ।

এবং আপনাকে কনভিন্স করার শেষ সুযোগটি রয়েছে মিসেস ব্যাঙ্কসের। বললেন মি. ক্যাসন।

বেড়ে বলেছেন, বন্ধুর সরস প্রত্যুত্তরের জবাবে মাথা ঝাঁকালেন স্যার ম্যাথিউ। তাঁর মনে হচ্ছে পুরানো বন্ধুটির সঙ্গে এই তরবারি খেলায় তিনি হেরে যাচ্ছেন। এখন প্রত্যাঘাতের সময় এসেছে।

তিনি ডেস্কের খোলা ফাইলে নজর ফেরালেন। প্রথমত, তিনি সরাসরি তাকালেন ক্যাসনের দিকে যেন সহকর্মীটি রয়েছেন কাঠগড়ায়, মাটি খুঁড়ে লাশ বের করার সময় মৃত ব্যক্তিটির জামার কলারে আপনার মক্কেলের রক্ত লেগে ছিল।

আমার মক্কেল তা মেনেও নিয়েছেন, নিজের নোটগুলোতে চোখ বুলাতে বুলাতে শান্ত গলায় বললেন ক্যাসন। তবে...

দ্বিতীয়ত, ক্যাসনকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন না স্যার ম্যাথিউ। যে অস্ত্রটি দিয়ে তার শরীর টুকরো টুকরো করা হয়, একটি কুঠার, সেটি পরদিন খুঁজে পাওয়া যায় এবং ওটার হাতলে মিসেস ব্যাঙ্কসের মাথার চুল পাওয়া গেছে।

আমরা তাও অস্বীকার করছি না, বললেন ক্যাসন।

আমাদের বাছাই করার মতো বেশি জিনিস নেই, বললেন স্যার ম্যাথিউ, চেয়ার থেকে উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করলেন। এবং তৃতীয়ত, যে বেলচা দিয়ে ভিক্টিমের কবর খোঁড়া হয় সেটিরও অবশেষে সন্ধান মিলেছে। এবং তাতে আপনার মক্কেলের হাতের ছাপ ছিল সর্বত্র।

আমরা এটিরও ব্যাখ্যা দিতে পারি, বললেন ক্যাসন।

কিন্তু জুরিরা কি আমাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন, গলার স্বর চড়ালেন স্যার ম্যাথিউ, যখন তারা জানবেন খুন হওয়া লোকটির সহিংসতার লম্বা একটি রেকর্ড রয়েছে, আপনার মক্কেলকে স্থানীয় গায়ে প্রায়ই আহত অবস্থায় দেখা গেছে, গায়ে ক্ষতচিহ্ন, চোখের নিচে কালশিটে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে– এমনকী একবার তার ভাঙা হাতেরও পরিচর্যা করা হয়?

আমার মক্কেল সবসময়ই বলে আসছেন ওসব ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে। খামারে কাজ করার সময়। আর তাঁর স্বামী ছিলেন ওই খামারের ম্যানেজার।

কিন্তু এসব ব্যাখ্যা আমার বিশ্বাসের জায়গায় একটা দাগ ফেলেছে যার বিরোধিতা করা একেবারেই অসম্ভব, বললেন স্যার ম্যাথিউ। ঘরময় চক্কর শেষে নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছেন। ওই খামারে নিয়মিত যাতায়াত ছিল মাত্র একজনের –এক পোস্টম্যানের।

গায়ের আর কারও খামারের ফটক দিয়ে ভেতরে ঢোকাই নিষেধ ছিল। তিনি তাঁর নোটের আরেকটি পৃষ্ঠা ওল্টালেন।

এ কারণেই হয়তো কারও পক্ষে খামারে ঢুকে ব্যাঙ্কসকে হত্যা করা ছিল সহজ, আলটপকা বলে উঠল উইদারিংটন।

জুনিয়রের দিকে বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টি দিয়ে না তাকিয়ে পারলেন না স্যার ম্যাথিউ। ছেলেটা যে এখানে আছে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, মন্তব্য করলেন তিনি। তারপর বলে চললেন, পরবর্তী যে সমস্যাটির আমরা মুখোমুখি হবে তা হলো আপনার মক্কেলের দাবি তাঁর স্বামী তাঁকে গরম ফ্রাইং প্যান দিয়ে আঘাত করার দরুণ তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বেশ সুবিধাজনক ব্যাখ্যা, মি. ক্যাসন, কী বলেন?

আমার মক্কেলের মুখের এক পাশে সেই ক্ষত চিহ্ন এখনো পরিষ্কার রয়েছে, বললেন ক্যাসন। আর ডাক্তাররা বলেছেন তিনি সত্যি অন্ধ হয়ে গেছেন।

বিচারক এবং কাউন্সেলদের কাছে অনুযোগ করার চেয়ে ঢের সহজ ডাক্তারদেরকে বোঝানো, মি. ক্যাসন, ফাইলের আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বললেন স্যার ম্যাথিউ। নেক্সট, লাশের স্যাম্পল যখন পরীক্ষা করা হয়–সৃষ্টিকর্তা জানেন এমন কঠিন কাজটি কে করে–রক্তে প্রচুর পরিমাণে স্ট্রিকনিনের আলামত মিলেছে যে বিষ খেলে একটা হাতিও কুপোকাত হয়ে যাবে।

এটি শুধুমাত্র ক্রাউন হাসপাতালের প্যাথলজিস্টদের মতামত, বললেন মি. ক্যাসন।

এবং আদালতে একটি বিষয় খণ্ডন করা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে, বললেন স্যার ম্যাথিউ, কারণ প্রসিকিউশনের কাউন্সেল মিসেস ব্যাঙ্কসকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কেন রিডিংয়ে এক অ্যাগ্রিকালচারাল সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিলেন চার গ্রাম স্ট্রিকনিন কিনতে। আমি কাউন্সেলের জায়গায় থাকলে অবশ্যই এ প্রশ্নটি বারবার জিজ্ঞেস করতাম।

হয়তো বা, নোটে চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন ক্যাসন, তবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন খামারে ইঁদুরের উৎপাত খুব বেড়ে গিয়েছিল। ওগুলো মুরগি মেরে ফেলছিল। মিসেস ব্যাঙ্কস ভয় পেয়েছিলেন ইঁদুরগুলো ফার্মের অন্যান্য প্রাণীগুলোর না আবার ক্ষতি করে। তিনি তাঁর নয় বছর বয়সী শিশু সন্তানটিকে নিয়েও চিন্তায় ছিলেন।

ও, হ্যাঁ, রুপার্ট। কিন্তু ও তো ওইসময় বোর্ডিং স্কুলে ছিল, নয় কি? বিরতি দিলেন স্যার ম্যাথিউ।

মি. ক্যাসন, আমার সমস্যাটি অতি সাধারণ। তিনি বন্ধ করলেন ফাইল। আমি আসলে ভদ্রমহিলাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্যাসনের একটি ভুরু উত্তোলিত হলো।

মিসেস ব্যাঙ্কস অত্যন্ত ধূর্ত একজন নারী। তিনি ইতিমধ্যে অনেককেই তার এ অবিশাস্য গল্প শুনিয়ে বোকা বানিয়েছেন। তবে মি. ক্যাসন, আপনাকে বলে রাখছি, উনি আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না।

কিন্তু আমরা কী করতে পারি, স্যার ম্যাথিউ, যদি মিসেস ব্যাঙ্কস তাঁর এ কেসে গোঁ ধরে থাকেন এবং তাঁর পক্ষে আমাদেরকে মামলাটি লড়তে অনুরোধ করেন? জিজ্ঞেস করলেন ক্যাসন।

আবার চেয়ার ছাড়লেন স্যার ম্যাথিউ এবং নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগলেন। শেষে সলিসিটরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। তবে আশা করছি ভদ্রমহিলাটিকে মানুষহত্যার জন্য গিল্টি হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ত দিতে রাজি করাতে পারব। তাহলে আমরা যে কোনো জুরির সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হব, বিশেষ করে যে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে তা জুরিরা শোনার পরে। শুনানী চলাকালীন নারীবাদী কোনো সংগঠনও আদালতে তাঁর পক্ষ নিতে পারে। কোনো বিচারক তাঁকে কঠোর কোনো সাজা দেয়ার চেষ্টা করলে প্রতিটি খবরের কাগজ সেই বিচারকের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং লিঙ্গ বৈষম্যকারী হিসেবে। তখন মিসেস ব্যাঙ্কসকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে দুই দিনও সময় লাগবে না। না, মি. ক্যাসন, ওনাকে গিল্টি প্লি তে রাজি করাতে হবে।

কিন্তু তিনি তো নিজেকে নিরপরাধ বলে সবসময়ই দাবি করছেন। তাহলে কীভাবে কী হবে? জানতে চাইলেন ক্যাসন।

স্যার ম্যাথিউর মুখে এক টুকরো হাসি ফুটল। মি. উইদারিংটন এবং আমার একটা প্ল্যান আছে, তাই না, হিউ? উইদারিংটনের দিকে দ্বিতীয়বার ঘুরলেন তিনি।

জি, স্যার ম্যাথিউ, জবাব দিল তরুণ ব্যারিস্টার। খুশি কারণ অবশেষে তার মতামত চাওয়া হয়েছে, যদিও দায়সারাভাবে। স্যার ম্যাথিউ পরিকল্পনার বিষয়ে কোনো ক্লু দিলেন না বলে ক্যাসনও জানার জন্য চাপাচাপি করলেন না।

তাহলে কবে আমরা আমাদের মক্কেলের মুখোমুখি হচ্ছি? সলিসিটরের দিকে মনোযোগ ফেরালেন স্যার ম্যাথিউ।

সোমবার সকাল এগারোটায় যেতে পারবেন? প্রশ্ন করলেন ক্যাসন।

এ মুহূর্তে তিনি আছেন কোথায়? ডায়েরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জানতে চাইলেন স্যার ম্যাথিউ।

হলোওয়েতে, জবাব দিলেন ক্যাসন।

তাহলে আমরা সোমবার সকাল এগারোটায় হলোওয়েতে যাব। বললেন স্যার ম্যাথিউ। এবং সত্যি বলতে কী, মিসেস মেরি ব্যাঙ্কসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমার আর তর সইছে না। ওই মহিলার সাহস আছে বটে, আর কল্পনা শক্তির কথা তো বাদই দিলাম। আমার কথাটা মার্ক করে রাখুন, মি. ক্যাসন, যে কোনো কাউন্সেলের জন্য তিনি নিজেকে দারুণ প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন।

.

হলোওয়েতে কারাগারের ইন্টারভিউ রুমে স্যার ম্যাথিউ প্রবেশ করে এই প্রথম মেরি ব্যাঙ্কসকে দেখলেন এবং চমকে গেলেন। কেস ফাইলের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি জানেন ভদ্রমহিলার বয়স সাঁইত্রিশ, তবে তাঁর সামনে কোলে হাত রেখে পলকা এবং ভঙ্গুর চেহারার, ধূসর চুলের যে মহিলাটি বসে আছেন দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তবে ভদ্রমহিলার চমৎকার চোয়ালের গঠন এবং ছিপছিপে দেহ দেখে অনুমান করা যায় একদা তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন।

ক্রিম কালারের ইটের কামরাটির মাঝখানে একটি ফরমিকা টেবিল আর খান কয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ক্যাসন স্যার ম্যাথিউকে মিসেস ব্যাঙ্কসের বিপরীত দিকের চেয়ারটিতে বসতে বললেন। ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো আসছে। আললাটি সরাসরি পড়েছে মিসেস ব্যাঙ্কসের গায়ে। স্যার ম্যাথিউ এবং

জুনিয়র সলিসিটরের দুই পাশে বসলেন। প্রধান কাউন্সেল শব্দ করে এক কাপ কফি ঢেলে নিলেন নিজের জন্য।

গুড মর্নিং, মিসেস ব্যাঙ্কস, বললেন ক্যাসন।

গুড মর্নিং, মি. ক্যাসন, প্রত্যুত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা, যেদিক থেকে কথা ভেসে এসেছে সেদিকে সামান্য মাথা ঘোরালেন। আপনি বোধহয় সঙ্গে কাউকে নিয়ে এসেছেন।

জি, মিসেস ব্যাঙ্কস। আমার সঙ্গে আছেন স্যার ম্যাথিউ রবার্টস কিউ সি, তিনি আপনার ডিফেন্স কাউন্সেল হিসেবে কাজ করবেন।

মিসেস ব্যাঙ্কস সামান্য মাথা ঝাঁকালেন। স্যার ম্যাথিউ চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন, এক কদম সামনে বেড়ে বললেন, গুড মর্নিং, মিসেস ব্যাঙ্কস। তারপর ঝট করে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন সামনে।

গুড মর্নিং, স্যার ম্যাথিউ, জবাব দিলেন মিসেস ব্যাঙ্কস, তার মুখের একটি পেশীও কাঁপল না, এখন তাকিয়ে আছেন ক্যাসনের দিকে। আপনি আমার হয়ে মামলা লড়বেন জেনে খুবই খুশি হলাম।

আপনাকে স্যার ম্যাথিউ কিছু প্রশ্ন করতে চান, মিসেস ব্যাঙ্কস, বললেন ক্যাসন। যাতে তিনি ঠিক করতে পারবেন কীভাবে আপনার মামলাটি নিয়ে এগোবেন। প্রসিকিউশনের কাউন্সেলের ভূমিকা পালন করবেন তিনি, যাতে আপনি বুঝতে পারেন উইটনেস বক্সে কী ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।

বুঝতে পারছি, প্রত্যুত্তরে বললেন মিসেস ব্যাঙ্কস। আমি স্যার ম্যাথিউর যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে খুশিই হবো। আমি নিশ্চিত তাঁর মতো একজন খ্যাতিমান মানুষের পক্ষে এ কথা প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে একজন পলকা শরীরের অন্ধ মেয়ে মানুষের পক্ষে ষোল স্টোন ওজনের একজন পুরুষকে কুপিয়ে হত্যা করা সম্ভব নয়।

যদি কিনা সেই দুশ্চরিত্র ষোল স্টোন ওজনের মানুষটিকে কোপানোর আগে বিষ খাইয়ে দেয়া হয়, মৃদু গলায় বললেন স্যার ম্যাথিউ।

যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই জায়গা থেকে পাঁচ মাইল দূরে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা কেউ যদি এমন কাজ করতে পারে তাহলে তার হিম্মত আছে স্বীকার করতেই হবে, জবাবে বললেন মিসেস ব্যাঙ্কস।

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় যদি সত্যি সেটা ঘটে থাকে, বললেন স্যার ম্যাথিউ। আপনি বলছেন মাথার পাশে আঘাত পেয়ে আপনি অন্ধ। হয়ে গেছেন।

জি, স্যার ম্যাথিউ। আমি নাশতা বানানোর সময় আমার স্বামী উনুন থেকে ফ্রাইং প্যানটি তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে আমাকে আঘাত করে। আমি মাথা নুইয়ে ফেলেছিলাম, তবে প্যানের কিনারা বাড়ি খায় আমার মুখের বাম পাশে। তিনি বাম চোখের ওপরে একটি দাগে হাত ছোঁয়ালেন। গভীর ক্ষতচিহ্ন। সারাজীবনই হয়তো ওটা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হবে।

তারপর কী হলো?

আমি রান্নাঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরলে টের পাই কেউ এসেছে ঘরে। তবে লোকটা কে বুঝতে পারছিলাম না তার কণ্ঠ শোনার আগ পর্যন্ত। লোকটা ছিল জ্যাক পেমব্রিক, আমাদের পোস্টম্যান। সে আমাকে কোলে করে তার গাড়িতে তোলে এবং লোকাল হসপিটালে নিয়ে যায়।

আর আপনি যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন পুলিশ আপনার স্বামীর লাশ উদ্ধার করে?

জি, স্যার ম্যাথিউ। পার্কমিড হাসপাতালে আমি প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। গির্জার যাজক প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসত। ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম ব্রুস আমাকে ছাড়া কীভাবে চলছে।

আপনার কাছে কি ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হয়নি হাসপাতালে থাকাকালীন আপনার স্বামী একটিবারের জন্যও আপনাকে দেখতে আসেননি? জিজ্ঞেস করলেন স্যার ম্যাথিউ। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর কফির কাপটি টেবিলের কিনারে ঠেলে দিচ্ছিলেন।

না। আমি বিভিন্ন সময় ওকে হুমকি দিয়েছিলাম ওকে ছেড়ে চলে যাব এবং আমার মনে হয় না... কাপটা খসে পড়ল টেবিল থেকে এবং পাথুরে মেঝেতে পড়ে বিকট শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

লাফিয়ে উঠলেন মিসেস ব্যাঙ্কস তবে ভাঙা কাপের দিকে ফিরে তাকালেন না।

আপনি ঠিক আছেন তো, মি. ক্যাসন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

দোষটা আমার, বললেন স্যার ম্যাথিউ। বড্ড আনাড়ি আমি।

ক্যাসন হাসি চেপে রাখলেন। উইদারিংটন পাথর মুখ করে থাকল।

প্লিজ বলে যান, স্যার ম্যাথিউ ঝুঁকে ভাঙা কাপের টুকরোগুলো তুলতে লাগলেন মেঝে থেকে। আপনি বলছিলেন আমার মনে হয় না..

ও, হাঁ, বললেন মিসেস ব্যাঙ্কস। আমার মনে হয় না আমি ফার্মে ফিরলাম কী ফিরলাম না তাতে ব্রুসের কিছু এসে যেত।

তা তো বটেই, টেবিলে কাপের ভাঙা টুকরোগুলো তুলে রাখলেন স্যার। ম্যাথিউ। আপনি কি আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন পুলিশ কেন কুঠারের হাতলে আপনার একটি চুল খুঁজে পেয়েছিল যে অস্ত্রটি দিয়ে আপনার স্বামীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছে?

জি, স্যার, ম্যাথিউ। আমি ব্যাখ্যা দিতে পারব। আমি ওর নাশতা বানানোর জন্য কিছু কাঠ কাটছিলাম চুল্লি ধরাব বলে।

তাহলে আমাকে এ প্রশ্নটি করতেই হচ্ছে কুঠারের হাতলে আপনার হাতের কোনো ছাপ ছিল না কেন, মিসেস ব্যাঙ্কস?

কারণ আমি গ্লাভস পরে কাজটি করছিলাম, স্যার ম্যাথিউ। আপনি যদি অক্টোবরের মাঝামাঝিতে কোনো খামারে সকাল পাঁচটার সময় কাজ করতে যান তাহলে বুঝতে পারবেন ঠাণ্ডা কাহাকে বলে।

এবারে ক্যাসন তাঁর মুখে হাসি ফুটতে দিলেন।

আপনার স্বামীর জামার কলারে যে রক্তের দাগ পাওয়া গেল তার ব্যাখ্যা কী? ক্রাউনের ফরেনসিক বিজ্ঞানীরা বলছেন ওটা আপনার রক্ত?

আপনি ভালো করে চোখ বুলালে ওই বাড়ির অনেক কিছুর ওপরেই আমার শরীরের রক্তের দাগ দেখতে পাবেন, স্যার ম্যাথিউ।

আর বেলচায় যে আপনার হাতের ছাপ ভর্তি? ওইদিন সকালে নাশতা বানানোর আগে কি কোনো খোঁড়াখুঁড়ি করছিলেন?

না। তবে তার আগের সপ্তাহে প্রতিদিনই আমাকে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়েছে।

ও, আচ্ছা, বললেন স্যার ম্যাথিউ। এবারে অন্য একটি বিষয় নিয়ে কথা বলব যে কাজটি বোধহয় আপনাকে প্রতিদিন করতে হয় না। বিশেষ করে স্ট্রিকনিন কেনার বিষয়টি। প্রথমত, মিসেস ব্যাঙ্কস, আপনার এতটা বিষ কেনার দরকার পড়ল কেন? দ্বিতীয়ত, এ জিনিস কিনতে সাতাশ মাইলের দূরের রিডিং শহরেই বা গেলেন কেন?

আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে রিডিংয়ে কেনাকাটা করতে যাই, ব্যাখ্যা দিলেন মিসেস ব্যাঙ্কস। আশপাশে অ্যাগ্রিকালচারাল কোনো সাপ্লায়ার নেই।

স্যার ম্যাথিউর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি আসন ছাড়লেন। মন্থর গতিতে মিসেস ব্যাঙ্কসকে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলেন। ওদিকে ক্যাসন একঠায় তাকিয়ে রইলেন মিসেস ব্যাঙ্কসের চোখের দিকে। কিন্তু চোখজোড়া অপলক একদিকেই চেয়ে আছে।

স্যার ম্যাথিউ তাঁর ক্লায়েন্টের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন। সকাল ১১:১৭। তিনি জানেন তার টাইমিং হতে হবে নিখুঁত কারণ তিনি নিশ্চিত শুধু চতুর নয়, অসম্ভব ধূর্ত এক মহিলার সঙ্গে কাজ করছেন। ভুলে যেয়ো না, নিজেকে মনে মনে বললেন তিনি, ব্রুস ব্যাঙ্কসের মতো পাজি লোকের সঙ্গে যে এগারো বছর ঘর সংসার করতে পারে, টিকে থাকতে তাকে ধূর্ততার পরিচয় দিতেই হবে।

আপনি কিন্তু এখনো বললেন না কেন অতটা বিপুল পরিমাণের স্ট্রিকনিন আপনার দরকার হয়েছিল, ক্লায়েন্টের পেছনে দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন তিনি।

আমাদের অনেকগুলো মুরগি মারা যাচ্ছিল, জবাব দিলেন মিসেস ব্যাঙ্কস বিন্দুমাত্র মাথা না নাড়িয়ে। আমার স্বামীর ধারণা ছিল এসব ইঁদুরের কাজ। ওরাই মুরগিগুলোকে মেরে ফেলছে। সে ইঁদুর মারার জন্য আমাকে বেশি পরিমাণে বিষ কিনে আনতে বলে। চিরতরে নিকেশ করো ঠিক এ কথাটাই বলেছিল সে।

কিন্তু শেষে দেখা যাচ্ছে আপনার স্বামীই নিকেশ হয়ে গেলেন। চিরতরে –এবং নিঃসন্দেহে ওই একই বিষ প্রয়োগে। বললেন স্যার ম্যাথিউ।

রুপার্টের নিরাপত্তা নিয়েও আমি চিন্তিত ছিলাম, কাউন্সেলের ব্যাঙ্গোক্তি এড়িয়ে গেলেন মিসেস ব্যাঙ্কস।

কিন্তু ওই সময় তো আপনার ছেলে বোর্ডিং স্কুলে ছিল, নয় কি?

জি। তবে ওই সপ্তাহের ছুটিতে ওর বাড়ি ফেরার কথা ছিল।

আপনি ওই সাপ্লায়ারের দোকানে আগে কখনো গিয়েছিলেন?

নিয়মিতই যাই, বললেন মিসেস ব্যাঙ্কস। স্যার ম্যাথিউ আরেকটা চক্কর দিয়ে আবার তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মাসে অন্তত একবার ওই দোকানে যাওয়া হয় আমার, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। তিনি মাথাটা ডানদিকে একটু ঘোরালেন।

স্যার ম্যাথিউ নিশ্চুপ রইলেন। আরেকবার ঘড়ি দেখার ইচ্ছেটি দমন করলেন। তিনি জানেন আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটি ঘটবে। একটু পরেই ইন্টারভিউ রুমের দূর প্রান্তের দরজাটি খুলে গেল এবং বছর নয়ের একটি বাচ্চা ঘরে ঢুকল।

ওঁরা তিনজন চুপচাপ দেখলেন বাচ্চাটি নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে মিসেস ব্যাঙ্কসের দিকে। রুপার্ট ব্যাঙ্কস তার মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসল। তবে কোনো সাড়া পেল না। আরও দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। তাকে ঠিক যেভাবে করতে বলা হয়েছিল সেভাবেই করল। মিসেস ব্যাঙ্কসের চাউনি স্থির হয়ে আছে স্যার ম্যাথিউ এবং মি. ক্যাসনের মাঝখানে।

ক্যাসনের মুখের হাসিতে এবার প্রায় বিজয় উল্লাস ফুটে ওঠার জোগাড়।

ঘরে কেউ এসেছে নাকি? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ব্যাঙ্কস। দরজা খোলার শব্দ পেলাম যেন।

না, বললেন স্যার ম্যাথিউ। শুধু আমি আর মি. ক্যাসন ছাড়া আর কেউ নেই এ ঘরে। উইদারিংটন এখনও নিজের জায়গায় প্রস্তরবৎ বসে আছে।

আবার মিসেস ব্যাঙ্কসকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগলেন স্যার ম্যাথিউ। জানেন এটাই শেষ সুযোগ। তিনি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছেন ভদ্রমহিলাকে বোধহয় ভুল বিচারই করেছেন। মিসেস ব্যাঙ্কসের ঠিক পেছনে আবার এসে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকালেন জুনিয়রের উদ্দেশ্যে। সে ভদ্রমহিলার সামনেই বসে আছে।

উইদারিংটন তার ব্রেস্ট পকেট থেকে সিল্কের রুমালটি বের করল। ধীরে সুস্থে ভাঁজ খুলল। তারপর টেবিলে সমান করে বিছাল। মিসেস ব্যাঙ্কসের চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

উইদারিংটন ডান হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করল, মৃদু আঁকাল মাথা, তারপর বাম চোখের ওপর হাত রাখল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে চট করে কোটর থেকে চোখের মণিটি খুলে বের করে সিল্কের রুমালের ওপর রাখল। ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড চোখের মণিটি পড়ে রইল রুমালের ওপর, তারপর সে ওটা মুছতে লাগল। বৃত্ত ঘেরা শেষ করলেন স্যার ম্যাথিউ, বসলেন চেয়ারে। দেখলেন ঘাম ফুটেছে মিসেস ব্যাঙ্কসের কপালে।

উইদারিংটন বাদাম আকারের কাঁচের জিনিসটি রুমাল দিয়ে মোছা শেষ করে মুখ তুলে সরাসরি তাকাল মিসেস ব্যাঙ্কসের দিকে। তারপর মণিটি তার শূন্য কোটরে ঠেসে ঢোকাল। মিসেস ব্যাঙ্কস ঝট করে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন মুখ। নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করলেন দ্রুত, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

চেয়ার ছাড়লেন স্যার ম্যাথিউ। হাসলেন তাঁর ক্লায়েন্টের দিকে তাকিয়ে। ক্লায়েন্টও ফিরিয়ে দিলেন হাসি।

মন থেকেই বলছি, মিসেস ব্যাঙ্কস, বললেন তিনি, মানুষ হত্যার জন্য গিল্টি প্লি করা হলে আমি সত্যি খুব আশ্বস্তবোধ করব।

(সত্যি ঘটনা অবলম্বনে)

আ টাফ টাসল – অ্যামব্রোস বিয়ার্স

১৮৬১ সালের শরতের এক রাত। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কেন্দ্রেস্থলের এক জঙ্গলে বসে আছে লোকটা। ওই সময় তো বটেই, এখনো ওই এলাকা চিট মাউন্টেন এলাকার সবচে দুর্গম অঞ্চল বলে পরিচিত। যেখানে লোকটা একা বসে আছে, তার কাছ থেকে মাইল দুয়েক দূরে ফেডারেল ব্রিগেডের ক্যাম্প। লোকটা শত্রুর হামলার আশঙ্কা করছে। সে ফেডারেল ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের একজন তরুণ অফিসার, নাম ব্রেইনার্ড বাইরিং। পদবি তার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, এ মুহূর্তে সে তার ঘুমন্ত কমরেডদের পাহারার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। বিচ্ছিন্ন একটা দলের প্রতিনিধিত্ব করছে সে আসলে।

তার রেজিমেন্টের লোকগুলোকে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার পরপরই একটা ইরেগুলার লাইনে ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করেছে। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢুকে, পাহাড় আর ঘন ঝোঁপঝাড়ের ভেতরে গিয়ে মিশেছে। লোকগুলো পনেরো বা বিশ গজ পর-পর অবস্থান নিয়েছে।

আগামী চার-ঘণ্টার ভেতরে যদি অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে তা হলে নতুন আরেকটি দল এসে এদের জায়গায় পাহারায় বসে যাবে। রিজার্ভ দলটি বর্তমানে এক ক্যাপ্টেনের অধীনে খানিক দূরে বিশ্রাম নিচ্ছে। তরুণ অফিসার তার দুজন সার্জেন্টকে বলে রেখেছে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই সাথে-সাথে যেন তাকে জানিয়ে রাখে।

যে জায়গায় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পাহারা দিচ্ছে, ওটা বেশ নির্জন। তবে বেইনার্ড বাইরিং-এর ভয়ডর কম। বয়সেও তরুণ হলেও যুদ্ধ করার প্রচুর অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। বহু শুঁকে সে নিজের হাতে নিধন করেছে, বুক কাঁপেনি একটুও। কিন্তু লাশকে তার সাংঘাতিক ভয়। কারণটা লেফটেন্যান্টের নিজেরও জানা নেই। লাশের দিকে তাকাতে পারে না সে। বমি আসে। হয়তো মৃত্যুকে ভয় করে বলেই লাশ দেখতে পারে না বাইরিং। তাকে রেজিমেন্টের অত্যন্ত সাহসী একজন সৈনিক বলে জানে সবাই, কিন্তু লাশের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা এবং আতঙ্কের কথা জানে না। কেউ।

নিজের লোকদের যথাযথ স্থানে বসিয়ে, সার্জেন্টদের দায়িত্ব ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়ে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ব্রেইনার্ড বাইরিং। আরাম পেতে কোমরে আটকানো তরবারির বেল্টটা ঢিলে করে দিল সে, হোলস্টার থেকে ভারী পিস্তলটা খুলে পাশে রাখল। এখন বেশ ভাল লাগছে। তবে কান খাড়া করে আছে বাইরিং। মাটিতে গাছের পাতা পতনের শব্দও তার কান এড়িয়ে যাচ্ছে না।

চাঁদের আলোয় আশপাশের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। তবে এত বেশি নির্জন পরিবেশ যেন কেমন কেমন লাগে। মাঝে-মাঝে অবশ্য একটা দুটো পাখি রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে ডেকে উঠছে। প্রতিধ্বনিটা মিলিয়ে যাবার পরে আবার সব চুপ। নিজেকে বিশাল প্রকৃতির মাঝে বড় একা লাগল বাইরিং-এর। সে আনমনা হয়ে কীসব ভাবছিল, হঠাৎ জঙ্গলের ধারে, রাস্তায় জিনিসটার দিকে চোখ পড়তে সতর্ক হয়ে উঠল। বাইরিং শপথ করে বলতে পারে একটু আগেও ওটা ওখানে ছিল না। গাছের ছায়ায় জিনিসটার অর্ধেক

অংশ ঢাকা পড়েছে, তবে যেটুকু চাঁদের আলোয় দেখা গেল, বোঝা গেল ওটা আসলে একটা মানুষ। চট করে তরবারির বেল্টে একটা হাত চলে গেল বাইরিং-এর, বাকি হাতটা দিয়ে চেপে ধরল পিস্তল শত্রওর হামলার জন্যে প্রস্তুত।

কিন্তু নড়ল না লোকটা। পিস্তল হাতে তার দিকে পা বাড়াল বাইরিং। লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, উর্ধ্বাংশ ছায়ায় ঢাকা, তার সামনে গিয়ে ঝুঁকে। দেখল বাইরিং। লাশ একটা।

ভয়ানক কেশে উঠল সে, ঘৃণা এবং ভয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল ওখান থেকে, আবার গিয়ে বসে পড়ল গুঁড়িতে। সামরিক সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগার ধরাল। দেশলাই নিবে যাবার সাথে সাথে অন্ধকারে স্বস্তি অনুভব করল সে; ওটাকে আর দেখতে হবে না। কিন্তু তারপরও চুম্বকের মতো যেন তার দৃষ্টি গিয়ে ঠেকল লাশটার গায়ে। মনে হলো ওটা যেন একটু এগিয়ে এসেছে তার দিকে।

দুত্তেরি! বিড়বিড় করল লেফটেন্যান্ট। লাশটা কী চায় আমার কাছে?

সে ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গুনগুন করে একটা সুর ভাজতে লাগল। হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে আবার তাকাল লাশের দিকে। লাশটার উপস্থিতি একই সাথে তাকে ভীত এবং বিরক্ত করে তুলছে। ছায়া থেকে সরে এসেছে লাশ। চেহারাটাকে এখন স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় বিকট সাদা লাগল মরা মুখটাকে। লাশের কোট

এবং ওয়েস্ট কোট খোলা, ভেতরে সাদা শার্ট দেখা যাচ্ছে। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ছড়ানো, বা হাঁটুটা উঠে আছে ওপর দিকে। গোটা অবয়ব এবং আকৃতি বাইরিং-এর কাছে রোমহর্ষক এবং ভয়াবহ ঠেকল।

সে আবার লাশটা থেকে চোখ সরিয়ে নিল, আগডুম-বাগডুম ভাবছে। মানুষ কেন মরে, মরা লাশকে কেনই বা তারা ভয় পায়, তাদের ভেতরে এত কুসংস্কার কেন কাজ করে, এইসব চিন্তা।

নানা দার্শনিক চিন্তা করেও লাশটার উপস্থিতির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না বাইরিং। একবার ভাবল এখান থেকে চলে যাবে। এজন্যে উঠেও দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কমরেডদের কাছে গেলে একটা লাশের ভয়ে সে পাহারা বাদ দিয়ে পালিয়ে এসেছে শুনলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, তার চরিত্রের দুর্বলতম দিকটি প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এই চিন্তা করে সে দমে গেল।

সে যে কাপুরুষ নয়, সাহসী এটা প্রমাণ করার জন্যে আবার লাশের দিকে ফিরল বাইরিং। লাশটার ডান হাতটা ছায়ায় পড়ে আছে, এ ছাড়া সব আগের মতোই আছে। মনে-মনে স্বস্তি বোধ করল বাইরিং।

হঠাৎ ডান হাতে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। লাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হাতের দিকে তাকাল। এত জোরে সে তরবারি চেপে ধরেছে যে ব্যথা হয়ে গেছে হাত। ভঙ্গিটা

মারমুখী গ্ল্যাডিয়েটরদের মতো, যেন এক্ষুনি। ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে ওর, ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। ধীরে-ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক হতে দিল বাইরিং, লম্বা করে দম নিল। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলো নিজের কাছে। হাস্যকরই তো। একটা লাশ, প্রাণহীন একটা জড় পদার্থকে সে কেন জানের শত্রু ভাবছে? হঠাৎ কে যেন হেসে উঠল খলখল করে। লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল বাইরিং, সভয়ে তাকাল চারপাশে, বুঝতে পারল না আসলে সে নিজেই হেসে উঠেছে মনের অজান্তে।

এবার ভয় পেল বাইরিং। তীব্র ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করল, কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করল পা দুটো, নড়তেই চাইছে না। ঝি ঝি ধরে গেছে। বাধ্য হয়ে ধপ করে আবার বসে পড়ল সে গুঁড়ির ওপর। ঘামে ভিজে গেছে মুখ, সারা শরীরও ভিজে গেছে ঠাণ্ডা ঘামে। দাঁত কপাটি লেগে গেছে ওর, চিৎকার দিতে পারছে না। খরখর আওয়াজ উঠল পেছনে, ঘাড় ফিরে দেখার সাহস হলো না বাইরিং-এর। লাশটার ভৌতিক সঙ্গীরা কি কবর থেকে উঠে এসেছে ওর ওপর চড়াও হতে? নাকি কোনো নিশাচর প্রাণী? কিন্তু সাহসই পেল না সে পেছন ফিরে দেখতে। আঠার। মতো তার চোখ লেগে রয়েছে লাশের দিকে।

এমন সময় নড়ে উঠল লাশ। বাইরিং কি প্রচন্ড ভয়ে দৃষ্টি ভ্রমের শিকার হয়েছে? মরা মানুষ আবার নড়াচড়া করতে পারে নাকি? কিন্তু বাইরিং স্পষ্ট দেখছে নড়ছে লাশটা। ওই তো হাত নাড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাঁপটা মারল বাইরিং-এর মুখে। ভয়ে শিউরে উঠল সে। মাথার ওপর গাছের ডালপালাগুলো বাতাসে আন্দোলিত হলো। বাইরিং-এর মনে

হলো ওগুলো মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। কোত্থেকে একটা ছায়া এসে পড়ল লাশের গায়ে। তারপর সরে গেল। ভয়ঙ্কর জিনিসটা উঠে দাঁড়াচ্ছে! ঠিক তখন গুলির আওয়াজ শোনা গেল পিকেট লাইন থেকে অনেক দূরে, কিন্তু জোরে।

গুলির শব্দ বাইরিং-এর দুঃস্বপ্নটাকে ভেঙে দিল খানখান করে। লাফ মেরে সিধে হল সে। আর তখনি বৃষ্টির মতো গুলি হতে লাগল তার সামনে থেকে। চিৎকার চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা, আর্তনাদ ইত্যাকার বিচিত্র সব শব্দও ভেসে এল। জঙ্গলের পেছন দিকে, ঘুমন্ত ক্যাম্পে আকস্মিক হামলা করেছে শত্রুপক্ষ। শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ। জঙ্গলের মধ্য থেকে গুলি করতে-করতে বেরিয়ে এল ফেডারেল সৈন্যরা। একদল সশস্ত্র পাহাড়ি লোক, বাইরিং যেখানে বসে ছিল, সেদিকে গুলি চালাতে-চালাতে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার বাঁকে। তার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রিজার্ভ বাহিনীকে। দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। জঙ্গলের এখানে সেখানে বন্দুকের খালি কার্তুজ, স্যাডেল, গুলিবিদ্ধ ঘোড়া পড়ে আছে দেখতে পেল তারা। ফেডারেল কমান্ডার এলাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে এসে অধীনস্তদের দুএকটা হুকুম দিয়ে চলে গেল। সৈনিকরাও ঘণ্টাখানেক পর আর কোনো হামলার আশঙ্কা দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল যে যার বিছানায়।

পরদিন সকালে একটা ফ্যাটিগ পার্টি (যুদ্ধের পাশাপাশি রাস্তা নির্মাণ, মালবহনসহ টুকটাক নানা কাজ করে যে সৈন্যদল) জঙ্গলে ঢুকল একজন ক্যাপ্টেন এবং সার্জেন্টের তত্ত্বাবধানে, তারা আহত এবং নিহতদের খোঁজে এসেছে। জঙ্গলের মাথায়, রাস্তার একপাশে দুটো লাশ দেখতে পেল তারা, পড়ে আছে পাশাপাশি। একজন ফেডারেল

অফিসার, বাকিজন কনফেডারেট প্রাইভেট। অফিসারের গলার ভেতরে আমুল বিঁধে আছে একটা তরবারি, উপুড় হয়ে আছে সে, রক্তে ভেসে গেছে চারপাশ। পাশের লোকটার বুকে ঢুকে আছে তরবারি, সারা শরীরে কমপক্ষে পাঁচটি মারাত্মক জখমের দাগ।

ক্যাপ্টেন মৃত অফিসারকে চিৎ করে শোয়াল। চমকে উঠল সে। ঈশ্বর! আঁতকে উঠল সে, এ তো বাইরিং। অপর লাশটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে, মনে হয় মৃত্যুর আগে দুজনে জবর লড়াই করেছে।

সার্জন বাইরিং-এর তরবারিটা পরীক্ষা করল। এটা ফেডারেল ইনফ্যান্ট্রির তরবারি, ক্যাপ্টেনের সাথেও আছে অমন একটা। বাইরিং-এর বেল্টে একটা পিস্তলও গোঁজা আছে। তবে গুলি ছোঁড়া হয়নি।

সার্জন তরবারি রেখে এবার অপর লাশটার দিকে এগোল। এই লোকটাকে নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে মারা হয়েছে। তবে শরীরে রক্তের চিহ্ন নেই। বাম পা-টা শক্ত হয়ে উঠে আছে আকাশের দিকে। পা-টা সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সার্জন, উল্টো খুলে এল ওটা শরীর থেকে। সাথে-সাথে ভস করে পচা একটা গন্ধ ধাক্কা মারল ওদের নাকে।

দুজনেই এবার মুখ তুলে চাইল, ভয় এবং বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

অ্যা সিম্পল মিসটেক – ম্যাক্স ভ্যান ডারভির

অনেক সয়েছে সে। হ্যারী লোথারিওর আর ক্ষমা নেই। তাকে এবার অবশ্যই মরতে হবে।

মোনা রোপ দোকান থেকে কম দামী একটা হ্যাট কিনল, লিপস্টিক কিনল আরেক দোকান থেকে, আর বেলচাটা কম দামে পেয়ে গেল এক ডিসকাউন্ট স্টোরে। জিনিসগুলো নিয়ে ভাড়া করা সেডানে উঠল মোনা। চোহারায় নিস্পৃহ ভাব ধরে রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে খুবই নার্ভাস।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাল মোনা যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না সে। বাণিজ্যিক এলাকা ছাড়িয়ে রিভারভিউ বুলেভার্দের দিকে মোড় নিল মোনা। তার বা দিকে সবুজ ঘাসের প্রশস্ত লন সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত বাড়িগুলো। আর ডানের ঢাল গিয়ে মিশেছে নদীর কিনারায়। এদিকে বড় বড় গাছপালার আড়ালে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে বড় লোকদের দামী বাড়ির ছাদ।

বুলেভার্দ থেকে মোড় ঘুরে বার্নহিল্ট ড্রাইভওয়েতে চলে এল মোনা, পাথুরে, সুদৃশ্য একটি বাড়ির ডাবল গ্যারেজের বন্ধ দরজার সামনে ব্রেক কষল। পার্স থেকে দ্রুত চাবি নিয়ে

দরজা খুলল সে, সেডানটাকে ভেতরে ঢোকাল, তারপর আবার ফিরে চলল বুলেভার্দের উদ্দেশে।

এক সেকেন্ডের জন্য ঘাড় ঘুড়িয়ে বাড়িটার দিকে চাইল মোনা, উঁচ করে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধল বুকে। স্যালি লাফহার্টি, তার বাল্য বন্ধু, হিউস বার্নহিল্টকে বিয়ে করে কত সুখে আছে! ওরা দুজনেই এখন ইউরোপে, সামার বিজনেস ভ্যাকেশন কাটাতে গেছে। যাবার আগে স্যালি তাঁর বাড়ির একগোছা ডুপ্লিকেট দিয়ে গেছে মোনাকে।

উইকএন্ডে যে কোন সময় চলে আসিস এখানে। বার বার বলেছে স্যালি।

এটা ফ্রান্সের রিভিয়েরা নয় বটে, কিন্তু এখানে এলে তোর মন ভাল হয়ে যাবে। নদীতে ইচ্ছেমত সাঁতার কাটতে পারবি, পার্টি দিতে পারবি।

মোনা বুলেভার্দের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা ট্যাক্সি ডাকল। বিশ মিনিট পরে আবার ডাউন টাউন চলে এল। দুই ব্লক পরে ওর পার্ক করা গাড়িটার দিতে দ্রুত এগুলো সে। এখন পর্যন্ত সব কিছু প্ল্যান মাফিক ঠিকঠাক চলছে। কপালের ঘাম মুছল মোনা, ঘামে ভেজা হাতের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকাল, গাড়ির সীটে রাখা বেদিং স্যুট দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করল, তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে মোনা রোপ, যে বাড়িতে হ্যারী রোপের সঙ্গে দীর্ঘ ষোলোটা বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছে সে।

তবে আর নয়। আর হ্যারীর সাথে এক সঙ্গে থাকতে রাজি নয় মোনা। নাটকের মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে, এইবার ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।

অভিজাত এই এলাকায় পুবদিকে বেটিফেয়ার চাইল্ডদের বাড়ি। মোনা, দেখল হলুদ শর্টস পরা বেটি লম্বা একটা কাঁচি নিয়ে তাদের বাগানে কাজ করছে। বাগান থেকে কয়েক গজ দূরে মোনাদের বাসা। নিজের বাসার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে। বেটি মুখ তুলে চাইল, বলল, হাই!

মোনা গাড়ি থেকে নামতে নামতে কষ্ট করে হাসি ফোঁটাল ঠোঁটে। হাই!

আজ খুব গরম পড়েছে, না? সাঁতার কেটে এলে?

মোনা মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠল এই কথায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বেদিং স্যুটটা বেটির উদ্দেশ্যে নাড়ল। সব কিছু কি চমৎকার খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। মোনা রোপ যে বুধবার বিকেলটা সুইমিং পুলে কাটিয়েছে তার সাক্ষ্য বেটিই দেবে। বলবে, অফিসার, মোনা ওইদিন যখন বাড়ি ফেরে তখন প্রায় পাঁচটার মত বাজে। ওর হাতে একটা বেদিং স্যুট ছিল। সে ওটা আমার দিকে তাকিয়ে নেড়ে ছিল।

মোনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গ্যারেজে গেল, গাড়িটা যথাস্থানে রাখল, তারপর বাড়িতে ঢুকল। বেটি ফেয়ারচাইল্ডের চোখের আড়াল হতেই চঞ্চলা হরিণী হয়ে উঠল সে। রান্নাঘরের সিঙ্কে সুইম স্যুটটা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পর ওটাকে ইউলিটি রুমের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল।

রান্না ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মোনা। বেটি ফেয়ারচাইল্ড আবার ঘাস কাটার কাঁচে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর বদভ্যাস আছে বেটির। বিশেষ করে মোনার ব্যাপারে আগ্রহ তার প্রবল।

একটা হাইবল তৈরি করে সিগারেট ধরাল মোনা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা পনেরো। আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর বাসায় ফিরবে হ্যারী।

ড্রিঙ্কটা নিয়ে কিচেন টেবিলে বসল মোনা হাঁটু ভাঁজ করে। ওর পা একটু পরপর ঝাঁকি খেলো, জোর করে স্থির হয়ে থাকল মোনা। এয়ারকুলারের থার্মোস্টাটের ক্লিক শব্দে হঠাৎ চমকে উঠল। আবার পা ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। মোনা এবার আর ঝাঁকুনি থামাতে চেষ্টা করল না। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চোখ তুলল। পাঁচটা ষোলো এখনও চল্লিশ মিনিট। ওর হাতের লোমের গোড়ায় ফুটে উঠেছে স্বেদ বিন্দু। সিঙ্কে গিয়ে মুখ ধুলো মোনা, কলের নিচে হাত মেলে ধরল। গড, এত ঘামছে কেন সে? ঘর তো ঠাণ্ডা। নাকি খুনের আগে সব খুনীরই এ রকম অবস্থা হয়?

আরেকটা হাইবল তৈরি করল মোন প্রচুর সময় নিয়ে, আগেরটার চেয়ে বড়। হ্যারী নিখোঁজ হলে পুলিশ প্রথমেই তার কারণ জানতে চাইবে। ষোলো বছরের দাম্পত্য জীবনে, বিখ্যাত জুতো তৈরির কারখানা পাইপার এ যে মানুষটা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আঠারো বছর কাজ করে গেছে সে কেন হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যাবে?

হ্যারী রোপের কোনও পাওনাদার নেই, যাদের ভয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। টাকা পয়সারও অভাব নেই তার। ব্যাঙ্কে মোটা অঙ্কের অর্থ গচ্ছিত আছে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। আছে চমৎকার একটি বাড়ি, দামী আসবাবপত্র, দুটো গাড়ি। হ্যারী রোপ জুয়া খেলে না, মদ্যপ নয়, অসৎ পথে টাকাও ওড়ায় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হ্যারীর সম্পর্ক খুবই ভালো। তারা জানে, স্বর্ণকেশী মোনা রোপা চল্লিশোর্ধ্ব বয়সেও যৌবনকে ধরে রেখেছে শক্ত হাতে এবং স্বামীর প্রতি সে খুবই বিশ্বস্ত।

আচ্ছা, এক মিনিট। হ্যারীর স্ত্রীর ব্যাপারে একটা কথা বলা যাক। মোনা রোপ কি তার স্বামীকে কোন কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে? নাকি এমন কোন কারণ থাকতে পারে যে মোনা হ্যারীকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলল, তারপর হ্যারী নিখোঁজ বলে পুলিশকে জানাল?

কিন্তু মোনা তার স্বামীকে খুন করবে কেন? সেফ ডিপোজিটের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যে টাকা আছে, ওটার জন্য? উঁহু, বিশ্বাস হয় না। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা দিয়ে মোনা বড়লোক হতে পারবে না। জীবন বীমা? হ্যারী রোপ জীবন বীমা করেনি। তাহলে দেখা

যাচ্ছে স্বামী নিখোঁজ হলে কিংবা মারা গেলে মোনা রোপ কোনদিক থেকেই লাভবান হতে পারছে না।

আয়নায় নিজেকে মুখ ভেঙচাল মোনা, তাকাল বাইরে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড ঘাস কাটছে না, কিন্তু এখনও বাগানে আছে। ও কেন ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে বুঝতে কষ্ট হয় না। পঁচিশের কোঠায় বয়স, হালকা পাতলা বেটির মনে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। মেয়েটাকে দুই চোখে দেখতে পারে না মোনা।

আরও পাঁচ মিনিট পর হ্যারীর কনভার্টিবলটাকে আসতে দেখল মোনা। বেটিদের বাগানের বেড়ার সামনে দিয়ে আসার সময় কি যেন বলল সে। বেটিকে। বেটি হাতের হলদে দড়ির ফাঁসটা দুলিয়ে হাসল। হ্যারী ওর দিকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়ি ঢোকাল গ্যারেজে।

হ্যারী যখন কিচেনে ঢুকল মোনা ততক্ষণে তার জন্য একটা নতুন ড্রিঙ্ক নিয়ে তৈরি। হ্যারীর বয়স মোনার সমান হলেও খাটো, রোগা আর মাথায় ছোট চুল বলে ওকে আরও কম বয়েসী দেখায়। কাঁধে কোট, আলগা টাই, জামার বোতাম খুলতে খুলতে হ্যারী মোনার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাই, সইটি। আমার জন্যই ড্রিঙ্কটা বানিয়েছ বুঝি?

মাথা দোলাল মোনা।

তুমি বিকেলে সাঁতার কেটেছ?

হ্যাঁ।

রান্না ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে হ্যারী বলল, ড্রিঙ্কটা বাথটাবে দিয়ে যাও। আমি গোসল করব। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি?

এটা হ্যারীর বহুদিনের অভ্যাস। শীত হোক আর গ্রীষ্মই-ঘরে ফেরার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গোসল করা চাই।

মোনা হাত মুঠি করল, প্রাণপণে চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে। কান পাতল। কোন সাড়াশব্দ নেই। কপালে ভাঁজ পড়ল মোনার, সাবধানে লিভিং রুমে গেল। ওর বিপরীত দিকে বেডরুম, দরজা খোলা। হ্যারী করছেটা কি?

এখনও টাবে ঢুকছে না কেন? এই সময় বাথরুম থেকে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। ঢিল পড়ল পেশীতে কিছুক্ষণ পর থেমে গেল শব্দটা। হ্যারী টাবে ঢুকেছে।

রান্না ঘরে ফিরে এল মোনা, ড্রয়ার খুলে বাঁকানো একটা হাতুড়ি বের করল, জুতো খুলে নিঃশব্দে পায়ে ঢুকল শোবার ঘরে। বাথরুমের দরজা ভেজানো। গলা ছেড়ে গান গাইছে

হ্যারী। একটানে দরজা খুলে ফেলল মোনা। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজছে হ্যারী, মোনার দিকে পিঠ।

সোজা খুলির ওপর প্রথম আঘাতটা করল মোনা। আঘাতের চোটে সামনের দিকে ছিটকে গেল হ্যারী, কোমর ভেঙে পড়ে গেল বাথরুমের মধ্যে। গলা দিয়ে একটা আওয়াজও বেরুল না। উন্মাদিনীর মতো হাতুড়ি চালাতে লাগল মোনা, হ্যারী মারা গেছে বুঝতে পেরে এক সময় থামল।

এই সময় গম্ভীর কণ্ঠটা শুনতে পেল মোনা।

হ্যারী, বাড়ি আছ?

মুখ সাদা হয়ে গেল মোনর, শূন্য দৃষ্টিতে চাইল।

হেই, আমি রয়েস। বাড়িতে আছ নাকি, হ্যারী?

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড!

কিভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে জানে না মোনা, হঠাৎ দেখল। সে চলে এসেছে বেডরুমে। হাতে এখনও হাতুড়িটা। স্রেফ জমে গেল মোনা। এ হাতুড়ির কারণে তো সেও মারা পড়বে!

হ্যারী?

মোনা বিদ্যুৎগতিতে হাতুড়িটা বালিশের নিচে চালনা দিল। রয়েস ফেয়ারচাইল্ড সম্ভবত ইউটিলিটি রুমের কাছে চলে এসেছে। জোর করে শক্তি সঞ্চার করল মোনা, বলল, আসছি, রয়েস। টলতে টলতে সে পা বাড়াল সামনে।

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড লম্বা, সুদর্শন তরুণ। ওর এক মাথা ঝাঁকড়া কালো চুলের দিকে চাইলেই বুক কেমন শিরশির করে মোনার। রয়েসের সপ্রতিভ উপস্থিতি সব সময়ই তাকে মুগ্ধ করে। রয়েস এই মুহূর্তে ইউটিলিটি রুমের স্ক্রীন ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। বিশালদেহী রয়েসের সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হলো মোনর।

হাই, আন্তরিক গলায় ডাকল রয়েস।

আমি বাথরুমে ছিলাম। হাসার চেষ্টা করল মোনা। জল পড়ার শব্দে তোমার গলা প্রথমে শুনতে পাইনি।

আজ রাতে তুমি আর হ্যারী কোথাও যাবার প্ল্যান করেছ? জানতে চাইল রয়েস।

নাহ্, বলল সে। আমার আর প্ল্যান করে কোথাও যাওয়া হয় না। তবে সন্ধ্যাবেলায় ডাউন টাউনে যাব ভাবছি। কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তারপর নাইটশোতে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে ছবি দেখব।

এত ব্যাখ্যার দরকার ছিল না, রয়েসের হাসি আরেকটু প্রসারিত হলো। ভেবেছিলাম রাতে হ্যারীর সঙ্গে কার রেস দেখতে যাব।

কিন্তু, আমি তো...

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড চকিতে একবার মোনার দ্বিধান্বিত মুখের দিকে তাকাল, লক্ষ করল মোনা কনভার্টিবলটার দিকে চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হ্যারী তো বাসায় আছে, তাই না? বেটি বলল কিছুক্ষণ আগে নাকি ও বাসায় ফিরেছে। ভাবলাম একবার জিজ্ঞেস করেই যাই ও আমার সঙ্গে যাবে কি-না।

কিন্তু হ্যারী তো ওষুধের দোকানে গেছে, অম্লান বদনে মিথ্যে কথাটা বলল মোনা।

তাই? একটু থেমে রয়েস বলল, কিন্তু ওকে তো বেরুতে দেখলাম না। ঠিক আছে, ও এলে একবার আমার বাসায় নক করতে বোলো।

আ-আচ্ছা বলব। গলাটা হঠাই যেন বসে গেল মোনার। দাঁড়িয়ে পড়ল রয়েস।

এনিথিং রং, মোনা? জ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

দুর্বলভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মোনা, উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে। আ-আমি...মানে আমার শরীরটা ঠিক ভাল ঠেকছে না। সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে আসার পর থেকে খারাপ লাগছে। যাকগে, এটা এমন কোন ব্যাপার নয়। রয়েস, তুমি...যদি কিছু মনে না করে গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবে?

অবশ্যই দেব।

মানে বলছিলাম কি, হ্যারীও নেই, আমি বাসায় একা। দরজাটা বন্ধ থাকলেও একটু কম চিন্তা থাকে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলল রয়েস ফেয়ারচাইল্ড।

হ্যারীকে আমার কথা বলতে ভুলো না।

ভুলব না।

গ্যারেজের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল মোনা, গা ছেড়ে দিল স্ক্রীন ডোরের কবটে। ওর বুক ধুকধুক শব্দ করছে, পায়ে কোন জোর নেই। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করার যুক্তিটা নিতান্তই খেলো ছিল, বুঝতে পারে। মোনা। কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপদে কাজ সারা তার খুবই প্রয়োজন

এখন দ্রুত কাজগুলো করতে হবে মোনাকে। রয়েস আবারও আসতে পারে। ইস্, আজ রাতেই কেন হ্যারীকে নিয়ে রেস দেখার ভূত চাপল ওর মাথায়?

শিউরে উঠল মোনা, ঝোলানো লম্বা কম্বলটার এক প্রান্ত খামচে ধরল। তারপর দৌড়ে গেল বাথরুমে। ছোটখাট হ্যারীর গায়ে এত ওজন! বাথরুম থেকে ওকে টেনে তুলতে জান বেরিয়ে গেল মোনার। ধপাস করে লাশটা মেঝেতে ফেলল ও, দুটো তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছল তারপর একটা কম্বলে মৃত হ্যারীকে পেঁচাল। জামাকাপড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করল। প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে টাকা গুনল মোনা। মাত্র তেইশ। ডলার। টাকাগুলো নিয়ে ওয়ালেটটা যথাস্থানে রেখে দিল সে।

আবার ঘামতে শুরু করেছে মোনা। কিন্তু এখন আগের মতো আর দুর্বল লাগছে না। ধীরে ধীরে হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে সে। কম্বলে মোড়ানো হ্যারীর লাশটা টানতে টানতে গ্যারেজে নিয়ে এল মোনা। গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক খুলল চাবি দিয়ে। কিন্তু এখন

ওকে ভেতরে ঢোকাবে কী করে? গোটা লাশ দুহাতে তোলার শক্তি নেই মোনার। ভয়ানক ভারী হ্যারীর শরীর।

প্রথমে হ্যারীর পা দুটো ধরল মোনা, বাম্পারের ওপর রাখল। লাশটা ডিঙিয়ে ওর পেছন চলে এসে সে ঝুঁকল, দুহাতের বেড়িতে শক্ত করে কোমর ধরে টান দিল। মেঝে ছেড়ে শুন্যে উঠে গেল হ্যারী, কিন্তু নিতম্ব বেঁধে গেল ট্রাঙ্কের কোনায়। থেতলানো মাথাটা বিশ্রীভাবে ঝুলছে। ঘাড়ের পেছনে হাত নিয়ে এল মোনা, মাথাটা সোজা করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে। ট্রাঙ্কের এক কোনায় বসার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল নিষ্প্রাণ দেহটা। হড় হড় করে ওকে সামনের দিকে টান দিতেই ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল হ্যারী।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে মোনার, যেন কয়েক মাইল পথ দৌড় এসেছে। ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো দিয়ে লাশটাকে ঢাকল সে, বন্ধ করল ট্রাঙ্ক। তারপর কম্বলটা আবার ইউটিলিটি রুমের মেঝেতে বিছাল। জিনিসটা ভিজে গেছে, কিন্তু শুকিয়ে যাবে শিগগিরই। এখন আর কোন কাজ নেই। এখন কাজ শুধু কালক্ষেপণ।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ভারী কষ্টের, যন্ত্রণাদায়ক। মোনা ভাবতে থাকে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু। কিন্তু জোর করে অশুভ চিন্তাগুলো মন থেকে দূর করে দেয় সে। বেহুদা টেনশনে ভুগছে সে। সাজানো প্ল্যানের মধ্যে সামান্য ছন্দপতন ঘটিয়েছে কেবল রয়েস ফেয়ারচাইল্ডের আকস্মিক আবির্ভাব। কিন্তু তার কারণে পরিকল্পনাটি একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

.

সাতটা বাজার মিনিট কয়েক আগে রয়েস ফোন করল। জানতে চাইল মোনা হ্যারীকে তার কথা বলতে ভুলে যায়নি তো।

না, রয়েস। ও এখনও ওষুধের দোকান থেকে ফেরেনি। ও বোধহয় গিনোর বারে গেছে। নইলে এত দেরি হবার তো কথা নয়।

ঠিক আছে, আমি হ্যারীকে ওখানেই খোঁজ করছি, মোনা।

ফোন রেখে দিল মোনা। কাজটা এখন তাকে আরও আধ ঘণ্টা আগে করতে হবে। ভেবেছিল সাড়ে সাতটার আগে বাইরে যাবে না, কিন্তু এখনই বেরুলে রয়েস আবার হুট করে হাজির হলে বিপদে পড়বে মোনা। দ্বিতীয়বার তার মুখোমুখি হতে চায় না সে। সামাল দিতে পারবে না।

.

কনভার্টিবলটাকে নিয়ে বেরুচ্ছে মোনা, দেখল রয়েস জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। ইচ্ছে হলো ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটায়, চোখের পলকে শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়।

দাঁতে দাঁত চাপল মোনা। না, আতঙ্কিত হলে চলবে না। আতঙ্ক ওকে ফাঁদে ফেলবে, আর তার নিশ্চিত পরিণাম ডেথ চেম্বার। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে বার্নহিল্টদের বাড়িতে চলে এল মোনা। এখানে, ডাবল গ্যারেজের ভেতরে সে ভাড়া করা গাড়িটা রেখে গেছে। হ্যারীর লাশ আর জামাকাপড়ের স্তূপ সেখানে ঢোকাল সে, ট্রাঙ্কের মধ্যে বেলচাটা রাখল, আর বিকেলে কেনা অন্যান্য জিনিসপত্রগুলোর স্থান হলো কনভার্টিবলে।

এবার ডাউনটাউনে চলে এল মোনা, বুকের মধ্যে ভয় চেপে দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়াল, খামোকা এটা ওটার দাম জানতে চাইল। ঘণ্টাখানেক পর একটা ড্রাগস্টোরে সে যখন ঢুকল, ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। ওর বন্ধু প্যাট ডডসনের সঙ্গে আরও আধঘণ্টা পর দেখা করার কথা। হয়তো প্যাট ইতোমধ্যে রেডি হয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে তার জন্য।

একটা বুঁদ থেকে ফোন করল মোনা প্যাটকে। প্যাট যা বলল শুনে হিম হয়ে গেল সে। মোনা আজ রাতের প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করা যায় না? আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার বাসায় ফোন করছি। কেউ ধরে না। আমার খুব মাথা ধরেছে মোনা। আমি ছবি দেখতে যেতে পারব না, তাই।

মোনার পা কাঁপছে থরথর করে। যদি বিশেষ কোন সাক্ষী দরকার হত তাহলে প্যাট ডড়সনই হত তার অন্যতম সাক্ষী। তু-তুমি ওষুধ খাওনি? কথা খুঁজে পাচ্ছে না মোনা। কোনমতে বলল, বাইরে বেরুলে ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ধরাটা নিশ্চয়ই ছেড়ে যেত।

ঘুম, মোনা, এটাই এখন আমার একমাত্র ওষুধ। আরেকদিন না হয় তোমার সঙ্গে ছবি দেখব। সুস্থ হলে কাল রাতে?

না, ইতস্তত করল মোনা, অনুরোধ করে লাভ হবে না বুঝে বলল, আমি আজ রাতেই ছবিটা দেখব, প্যাট, কাল নয়।

ঠিক আছে, দেখো তাহলে। যেতে পারছি না বলে আবারও দুঃখিত।

ড্রাগস্টোর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। শরীর ভয়ানক দুর্বল ঠেকছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। চিন্তাভাবনাগুলো সব গিঠই পাকিয়ে গেছে। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না, নিজেকে শাসাল ও, ভাবতে হবে। ভেবেচিন্তে প্রতিটি পা ফেলতে হবে। আউল ফাউল না ঘুরে মনস্থির করে ফেলল মোনা। বাঁক ঘুরে সিনেমা হলের দিকে এগোল। হলের সামনে আসতেই চট করে আইডিয়াটা মাথায় খেলে গেল।

দ্রুত পায়ে ফিরে এল পার্ক করা কনভার্টিবলে, বিকালে কেনা জিনিসগুলোর প্যাকেট দুটো নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকল। লিপস্টিকের প্যাকেটটা টিকেট কাউন্টারের জানলার পাশে ফেলে সেটের দিকে তাকাল। কাউন্টারের মেয়েটা বুথের দরজা খুলে ডাক দিল, ম্যাম?

ঘুরল মোনা, মেয়েটা ছোট্ট প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেছে ওর দিকে। হাসল সে, মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগ্রহে। প্রবেশ করল। এখন একটু স্বস্তি লাগছে। প্রয়োজনের সময় কাউন্টারের মেয়েটা ওকে অন্তত স্মরণ করতে পারবে।

ছবিটা কমেডি ধাঁচের। অন্যসময় হলে মোনা এই ছবি দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যেত, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর হল থেকে বেরিয়ে ও আবিষ্কার করল আসলে পর্দার দিকে তাকিয়েছিল শুধু, কিছুই দেখেনি।

সময় কাটানো মোনার জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে অস্থির হাতে কনভার্টিবলের রেডিওর সুইচ অন করল। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর হচ্ছে। আগামী ছয় ঘণ্টার মধ্যে প্রবল ঝড় শুরু হতে পারে, সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন সংবাদ পাঠক। তাই নগরবাসীদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। মোনা কপাল কোঁচকাল। আসন্ন ঝড়টা তাকে সাহায্য করবে না বিপদে ফেলবে?

বাড়ি ফেরার সময় মোনা দেখল ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ির আলোকিত জানালা দিয়ে একটা মুখ তাকে লক্ষ করছে। আড়ষ্ট হাসল মোনা। ভালোই হলো বেটি জানল সে কখন ছবি দেখে ফিরেছে।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে প্যাকেটগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল মোনা। আধঘণ্টা পর সমস্ত বাতি নিভিয়ে অন্ধকার একটা জানালার সামনে এসে বসল। এখান থেকে ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মধ্যে বেটির আকৃতি ফুটে উঠতে দেখল সে জানালার কাঁচে। কিন্তু রয়েসকে দেখা গেল না। এখন রাত একটা। বেটি এখনও ঘুমাতে যাচ্ছে না কেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বেটি ঝড়বাদল খুব ভয় পায়। ঝড়বৃষ্টি হবে শুনলে সে ঘুমাতে পারে না।

নিয়তি দেখছি আমার সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করেছে, ভাবল মোনা। তার বাইরে বেরুবার ব্যাপারটা বেটির চোখে কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। আর ঝড়ঝনঝার রাতে ফেয়ারচাইল্ডরা নিশ্চয়ই আশা করে না মোনার সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবে?

সময় হয়েছে বুঝতে পেরে সামনের দরজা দিয়ে বেরুল মোনা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ফেয়ারচাইল্ডদের জানালার দিকে, কেউ উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখতে। অন্ধকারে চোখ সইয়ে উঠান পেরোল সে, উঠে এল ফুটপাথে। জলদি পা চালাচ্ছে মোনা। হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। তারা জ্বলছে। ঝড় নাও আসতে পারে।

শপিং সেন্টারের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, এখানে সারারাত ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়, একটা ক্যাবে ড্রাইভারকে মুখ হাঁ করে ঘুমাতে দেখল মোনা। দরজা। খুলে ব্যাকসীটে বসল সে। আশা করল অন্ধকারে ড্রাইভার তাকে ভালমত লক্ষ করতে পারবে না।

ড্রাইভার মোনার দিকে প্রায় তাকালই না, ঘুম ঘুম চোখে মাত্র একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল। মোনা তাকে রিভারভিউ বুলভার্ডে যেতে বলল। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়ার সঙ্গে পঞ্চাশ সেন্ট বকশিশ দিল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল একটা অন্ধকার বাড়ি লক্ষ করে। খানিকটা এগিয়ে। যখন বুঝল ড্রাইভারের চিহ্নও নেই কোথাও ফিরে এল সে বুলেভার্দে পার হল রাস্তা, এগিয়ে চলল বার্নহিল্টদের বাড়ি অভিমুখে।

হ্যারীকে কবর দেয়ার জায়গাও ঠিক করে রেখেছে মোনা। গত রোববার বিকালে ওদিকটা ভাল মত দেখে যায় সে। হাইওয়ে ছাড়িয়ে একটা সরু মেঠো পথ চলে গেছে গাছপালার মধ্যে দিয়ে, শেষ হয়েছে একটা খাদের মাথায়, ওখানে।

ভাড়া করা সেডানটা নিয়ে মোনা এখন সেদিকেই চলেছে। হেডলাইটের আলো চিরে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। মেঠো রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামাল মোনা, লাইটের সুইচ অফ করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সে বেলচা নিয়ে। গভীর একটা কবর খুঁড়ল ত্রস্ত হাতে, স্বামীর দলা পাকানো লাশ আর পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেলল গর্তে।

দূরে, শহরের সীমানার কালো আকাশে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ, গুরগুর আওয়াজ ভেসে এল কয়েক সেকেন্ড পর। কবরে মাটি ভরাট করার সময় একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ভর করল মোনর। বৃষ্টি হলে ভেজা মাটিতে তার গাড়ির চাকার ছাপ থেকে যাবে। সুতরাং বৃষ্টির আগেই হাইওয়েতে ফিরতে হবে তাকে।

এবড়োথেবেড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ব্যাক করছে মোনা, যান্ত্রিক বাহনটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। আস্তে নিজেকে পরামর্শ দিল মোনা, সাবধানে চালাও মেয়ে। এমন বিদঘুঁটে জায়গায় কোন সমস্যায় পড়লে বারোটা বেজে যাবে তোমার।

হাইওয়েতে উঠে আসতেই সশব্দে চেপে রাখা শ্বাস ফেলল মোনা। ঝড় আসছে। একটু বিরতির পরপরই আলো হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশ। নদীর ব্রিজটা সামনেই। ওর সামনে কিংবা পিছনে কোন গাড়ি নেই বলে স্বস্তি পেল মোনা।

ব্রিজে উঠে গাড়ি থামাল সে। চট করে নেমে বেলচাটা রেলিং-এর ওপর দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। মাইল দুয়েক দূরে শহরের আলোকমালা, ফ্যান্টাসি ছবির মত জ্বলছে। সন্তুষ্টি বোধ করল মোনা, গাড়ি ছেড়ে দিল আর তক্ষুনি ওর বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড।

সামনে আলো জ্বলছে। অথচ মোনা ভাল করেই জানে এখানে আলো জ্বলার কোন কারণ নেই। সম্ভবত রোড ব্লক, ঘূর্ণায়মান লাল বিকন। বাতিগুলো যেন পিশাচের চোখ।

পুলিশ! যেভাবেই হোক ওরা তার কুকীর্তির কথা জানে গেছে আর এখানে অপেক্ষা করছে কখন সে শহরে ফিরবে তার জন্য।

ব্রেকে আলতো একটা পা রাখল মোনা। চোখ দুটো কোন সাইড রোড, খুঁজছে।

কিন্তু পুলিশ কী করে এত তাড়াতাড়ি টের পেল? দ্রুত মাথা হাতড়াল মোনা। নাহ্, টের পাবার কোন প্রশ্নই নেই। নির্ঘাত সামনে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর এ জন্যই রোড ব্লক।

ধীরগতিতে গাড়ি চালাল। হেড লাইটের আলোতে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ অফিসারের আকৃতি পরিস্কার হয়ে উঠল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতের লাল আলো দিয়ে সামনে আসতে ইশারা করল মোনাকে, মোনা খেয়াল করল রাস্তার একটা পাশ শুধু বন্ধ-যারা শহর ছেড়ে আসছে শুধু তাদের গাড়ি থামানো হচ্ছে। আরেক পুলিশ অফিসার লাল ফ্ল্যাগলাইটের আলো দিয়ে ইঙ্গিত করল-যেতে পারে মোনা। রোড ব্লক পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পড়ল মোনা। চিরিক চিরিক ঝলসে বিদ্যুৎ বিকট শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়ল।

মোনার গাড়ি থামাতে ইচ্ছে করল, মন চাইছে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে একটু সুস্থির হতে। কিন্তু এগিয়ে চলল সে, ডাউনটাউন থিয়েটার পার্কিং লটের দিকে গাড়ি ছোটাল।

দুই ব্লক পরে কার রেন্টাল এজেন্সি, তার পরেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করল মোনা। একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বলল, শপিং সেন্টার কমপ্লেক্সে যাবে। বাতাসে ঝঅপটায় রাস্তার খড়কুটো উড়তে শুরু করেছে, ভাড়া মিটিয়ে মাত্র ফুটপাথে পা রেখেছে মোনা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল গায়ে।

তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো বাড়ির দিকে ছুটল মোনা। তিনটে ব্লক পরেই তার বাড়ি। দরজা গিয়ে ঘরে ঢোকা মাত্র প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। নিজেকে এত দুর্বল লাগল, মনে হলো যে, একটা হপ্তা না ঘুমালে সে আর শক্তি ফিরে পাবে না।

কিন্তু ঘুম এল না। দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে থাকল মাথা। অনেক কিছু পিছনে ফেলে এসেছে সে, আরও কত কি সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে। অন্ধকারে হাতড়ে রান্না ঘরে ঢুকল মোনা, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বেটি এখনও ঘুমায়নি? নাকি জেগে থাকার ভান করছে?

আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল মোনা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাল। আরেকটু হলেই মস্ত এক ভুল করতে যাচ্ছিল সে। বেটি জেগে থাকলে আলো জ্বললেই সে দেখতে পেত মোনার গায়ে বাইরের পোশাক...।

মোনা কাপড় পাল্টাল। রাতের পোশাক পরল। হঠাৎ বালিশের নিচে রাখা হাতুড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল ও, হাতুড়িটা নিয়ে রান্না ঘরে গেল, ওটাকে একটা ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আলো জ্বালল, সিগারেট ধরাল। এখন বেটি ফেয়ারচাইল্ড ওকে ইচ্ছে মতো দেখুক। দেখুক ঝড়ের রাতে তার মতো আরও একজন নির্মম সময় কাটাচ্ছে।

মোনা কফি বানিয়ে নিল। পরবর্তী চারটে ঘন্টা তার কাটল মারিজুয়ানা সেবন করে আর বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি শুনে।

সকাল সাতটার দিকে ঝড়ের তান্ডব থেমে গেল, শুধু বর্ষণধারা অব্যাহত রইল। আটটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মোনা শুনল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রয়েস ফেয়ারচাইল্ড। আরও মিনিট বিশেক কাটিয়ে দিল সে কাপড় পরতে। তারপর বেরিয়ে পড়ল কনভার্টিবলটা নিয়ে। দেখল জানালার পাশে বসে আছে বেটি, ওকে লক্ষ করছে।

থিয়েটার পার্কিং সেটে চলে এল মোনা, ভাড়া গাড়িটা, এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করল। ইচ্ছে করলে কাল রাতেই কাজটা করতে পারত সে। কিন্তু তাতে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। রাত সাড়ে তিনটায় গাড়ি ফেরত দিতে গেলে এজেন্সি সহজেই তাকে চিনে রাখত, কিন্তু সকাল নটা বিশ-এ সেই আশঙ্কাটা নেই।

অ্যাটেনডেন্ট লোকটা লম্বা-চওড়া কিন্তু নোংরা, দেখে মনে হয় গোসল শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়।

কাজ শেষ, ম্যাম? জিজ্ঞেস করল সে।

শান্ত গলায় জবাব দিল মোনা, হ্যাঁ। ভাড়া চুকিয়ে পা বাড়াল অফিসের বাইরে।

পেছন থেকে ডাক দিল লোকটা, শুনুন, শুনুন! গাড়ির হাবক্যাপটা কোথায় ফেলে এসেছেন, ম্যাম?

মোনা থমকে দাঁড়াল, ঘুরল। লোকটা সেডানের ডান দিকের হুইলের পাশে দাঁড়ানো, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে মোনার দিকে। হুইলের ওপর কোনও হাবক্যাপ নেই।

মোনা কোন কথা বলতে পারল না। ওর জিভটা যেন আঠা দিয়ে লেগে আছে টাকরায়। হাবক্যাপটা হারাল কিভাবে? কোথায় কবরে? নাকি মেঠো রাস্তাটার কোথাও? অথবা থিয়েটার পার্কিং লটে।

আ-আমাকে কি এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? তোতলাতে তোতলাতে বলল মোনা।

লোকটা মোনার আগাপাশতলা যেন চাটল চোখ দিয়ে। নিজের সঙ্গে বোধ হয় যুদ্ধ করছে। তার পাতলা ঠোঁটজোড়া একদিকে বেঁকে গেল, বিড়বিড় করে বলল, না, আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আমাদের বীমা করা আছে।

কাঠ হয়ে এজেন্সি অফিস থেকে বেরুল মোনা, এগোল কনভার্টিবলের দিতে। গাড়ি নিয়ে শপিং সেন্টার সুপার মার্কেটে চলে এল ও, খামোকা বেশ কিছু মুদি সওদা কিনল। তারপর ফিরে এল বাড়িতে। ওর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। কাঁপা হাতে কফি ঢালল কাপে, চুমুক দিল। হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাটা ছাড়া আর সবকিছুই এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে পুলিশে খবর দেয়ার আগে আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। এখন দশটা চল্লিশ বাজে। পাইপার-এর নম্বরে ফোন করল মোনা।

পাইপারের যে লোক ফোন ধরল, সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানাল, না, মি. রোপ এখনও অফিসে পৌঁছেননি। আর এভাবে তিনি কখনোই অনুপস্থিত থাকেন না। অফিসে আগে না জানিয়ে মি. রোপ আজ পর্যন্ত কোথাও যাননি। পাইপার কি এ ব্যাপারে মিসেস রোপকে কোন সাহায্য করতে পারে?

কিন্তু মোনার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সে এবার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে রিং করে মিসিং পারসনস ব্যুরোর নাম্বারটা চাইল। ও ধারের লোকটা নিরাসক্ত গলায় বলল তার স্বামী হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় ফিরে আসবেন, মিসেস মোনা খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন। হয়তো গতকালকের ঝড় জলের জন্যে তিনি অতি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, অফিসার।

ঠিক আছে, আপনি যদি অন্য কোন আশঙ্কা করে থাকেন তাহলে আমরা কি এখান থেকে লোক পাঠাতে পারি–

সত্যি পাঠাবেন? প্লীজ!

ব্যাঙ্কস নামে এক তরুণ সার্জেন্টকে পাঠাল ওরা। লোকটার বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ। সে মোনাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। মনে হলো মোনার কষ্ট সে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। সার্জেন্টকে পছন্দ হয়ে গেল মোনার তার প্রশ্নের ধরণ শুনে। হ্যারি সম্পর্কে বিস্তারিত নোট নিল সে, বলল মোনা যেন তার স্বামীর জন্যে খুব বেশি চিন্তা না করে। আশা করা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

মিনিট বিশেক পর বিদায় হলো সার্জেন্ট। বেটি ফেয়ারচাইল্ড এল মোনার সঙ্গে কথা বলতে। রাতে বোধ হয় ঘুমায়নি, চোখ বসে গেছে, কিন্তু তাকে বেশ কৌতূহলী আর উত্তেজিত দেখাল।

একটু আগে যে গাড়িটা দেখলাম, হড়বড় করে বলল বেটি, পুলিশের গাড়ি মনে হলো! কি হয়েছে, মোনা?

মোনা ওকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল।

যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে কথাটা শুনে এমনভাবে, বেটি বলল, হ্যারি কাল রাতে বাসায় ফেরেনি?

অফিস থেকে ফেরার পর আমাকে বলল ওষুধের দোকানে যাচ্ছে। তারপর থেকে ওর আর কোন সংবাদ নেই।

কোথায় যেতে পারে, বলো তো?

আমি জানি না, বেটি।

অফিসে খোঁজ নিয়েছ?

মোনা মনে মনে উল্লাস বোধ করল। সকালেই নিয়েছি। কিন্তু ওরা বলল হ্যারি অফিসে যায়নি...

হা ঈশ্বর। শ্বাস টানল বেটি। সব ঘটনা দেখছি এক সঙ্গে ঘটছে! প্রথমে ঝড় এল, তারপর ব্যাঙ্ক ডাকাতি, আর এখন হ্যারি–

ব্যাঙ্ক ডাকাতি?

রেডিওতে শোননি? কাল রাতে ডাউনটাউনের একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। সারা শহরে রোড ব্লক বসানো হয়েছে। আর...

বেটির কথা কানে ঢুকছে না মোনার। কাল রাতে রোড ব্লকে পড়ে কি রকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল মনে পড়তেই পেট ফেটে হাসি এল ওর। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল ও। বেটি জিজ্ঞেস করল, মোনা, হ্যারি হঠাৎ করে এভাবে নিখোঁজ হওয়ার কারণ কী, বলো তো?

মোনা কোন জবাব দিল না।

পরদিন আবার এল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। গৎ বাঁধা প্রশ্নগুলো করল। মোনার যখন সমস্ত জবাব ফুরিয়ে গেল, সার্জেন্ট উদাসীন মুখ করে বলল, আপনি বোধ হয় জানেন, মিসেস রোপ, আপনার স্বামী কি পরনারীতে আসক্ত ছিলেন?

মোনার আঁতকে ওঠার অভিনয়টা নিখুঁত হলো। সবাই যুবতী, বলে চলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। ধারণা করা হচ্ছে ওরা প্রত্যেকে পাইপার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত।

মোনার চেহারা করুণ হয়ে উঠল।

এসব কেস-এ আমরা প্রথমেই যে জিনিসগুলো চেক করি তা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা, দাম্পত্য সুখ–।

মোনা রাগের ভান করল। আমাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো।

জী?

আর হ্যারী কখনও–

আমি দুঃখিত, মিসেস রোপ, বাধা দিল সার্জেন্ট। আমরা তদন্ত করে দেখেছি আপনার স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে তরুণী আর যুবতী কয়েকটি মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

মোনা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। সার্জেন্ট চলে যেতেই সে রান্নাঘরে ঢুকল, কাপে কফি ঢেলে তাতে বুরবন মেশাল, তারপর নীরবে পানীয়টা উৎসর্গ করল তার মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে : চিয়ারস, হ্যারী লোথারিও রোপ!

.

শনিবার, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস একটা বোমা ফাটাল। পাইপার কোম্পানিতে হ্যারীর কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেছে সে বেশ কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

ক-কত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না? জানতে চাইল মোনা।

দশ হাজার ডলারের মতো।

আপনাদের কি ধারণা হ্যারী টাকাগুলো নিয়ে পালিয়েছে?

তার সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তারা কেউ পালায়নি, শুধু হ্যারী। আর টাকাগুলোর কোন খবর নেই।

আচ্ছা! বলল মোনা। এতদিনে বুঝতে পারল হ্যারী মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার টাকা কোত্থেকে জোগাড় করত। এই মেয়ে ঘটিত ব্যাপার নিয়ে অনেক ঝগড়া হয়েছে তার হ্যারীর সঙ্গে। কিন্তু হ্যারী তাকে পাত্তাই দেয়নি। শেষ তক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মোনা। তারপর...

সত্যি, এটা খুব হৃদয়বিদারক সংবাদই বটে।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসের কথায় চমক ভাঙল মোনার। চোখ তুলে চাইতেই দেখল মোনা তার দিকে চেয়ে আছে সার্জেন্ট। আমি ভাবছিলাম... ইতস্তত গলায় বলল মোনা। ভাবছিলাম কয়েকদিনের জন্যে ধরুন, ধরুন হপ্তাখানেকের জন্য যদি বাইরে যাই কেমন হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হবে। বিশেষ করে যেখানে টাকা পয়সার প্রশ্ন জড়িত... আমার আসলে এখন দিন কয়েক কোথাও একা কাটিয়ে আসা দরকার।

নির্দিষ্ট কোথাও যেতে চাইছেন, মিসেস রোপ? আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।

লেক চার্লসের নাম শুনেছেন?

জ্বী।

ওখানে একটা বাড়ি আছে। ওখানে আমি আর হ্যারী একবার ...যাকগে, কিছু ভাববেন না। বাড়িটার নাম শেডি ওকস।

ঠিক আছে, মিসেস রোপ।

তাহলে আমি যেতে পারি?

অবশ্যই পারেন।

শহর ছেড়ে ওইদিন বিকালেই বেরিয়ে পড়ল মোনা। মাইল বিশেক যাবার পর ওর সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। শেডি ওকসের আশপাশে। পুলিশি ছায়া আবিষ্কার করল মোনা। একটি যুবক বয়সের ছেলেকে ওর কাছে পিয়ে প্রায়ই ঘুরঘুর করতে দেখল সে।

মঙ্গলবার সকালে অবশ্য যুবক ভণিতা ছেড়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল মোনাকে নিয়ে তার শহরে ফিরতে হবে।

আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না হ্যারী তার দশ হাজার ডলারসহ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? তিক্ত গলায় বলল মোনা।

আপনার স্বামীর খোঁজ পাওয়া গেছে, মিসেস রোপ। আর আমার ধারণা তিনি খুন হয়েছেন। গম্ভীর গলায় বলল সে।

হেডকোয়ার্টারে দুজন পুলিশ অফিসার জেরা করল মোনাকে। সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস লেফটেন্যান্ট পোলিং নামে একজন অমায়িক স্বভাবের অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। পোলিং খুব বিনীতভাবে মোনার কাছে জানতে চাইল হ্যারী যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন আসলে কি কি ঘটেছিল। সব বিস্তারিত বর্ণনা দিল মোনা।

সপ্রতিভভাবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে। মোনা জানে ওর গল্প খতিয়ে দেখা হবে, পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড জানাবে ঘটনার দিন বিকালে মোনাকে সে মিউনিসিপ্যাল পুল থেকে পাঁচটার সময় সাঁতার কেটে আসতে দেখেছে, আর মোনা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার সাক্ষী কেটে আসতে দেখেছে, আর মোনা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার সাক্ষী দেবে রয়েস ফেয়ারচাইল্ড। আর প্যাট ওডসন বলবে সে কথা দিয়েও বুধবার রাতে মোনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে পারেনি। সিনেমা হলের টিকেট বিক্রেতা মেয়েটাও মোনাকে স্মরণ করতে পারবে। বলবে হ্যাঁ, এক মহিলা ওইদিন নাইট শোতে ছবি দেখতে এসেছিলেন। ভুলে তার একটা প্যাকেট ফেলে যাচ্ছিলেন কাউন্টারে। আর ছবি দেখে মোনা কখন ফিরেছে সে ব্যাপারেও বেটি সাক্ষী দেবে। জানাবে, যখন ঝড় শুরু হয় ওই সময় সে রোপদের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছে।

প্রশ্নপর্ব শেষ হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মোনা। লেফটেন্যান্ট পোলিং মোথা ঝাঁকিয়ে নরম গলায় বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, মিসেস রোপ, আপনাকে প্রশ্ন করা আমাদের দরকার ছিল।

অবশ্যই। টাকা পয়সার ব্যাপারটাও যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত। তবে আমি কল্পনাও করিনি হ্যারী টাকা চুরি করতে পারে।

আমরা এ জন্যই আপনাকে লেক চার্লসে যেতে দিয়েছি, বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস।

আপনারা কি ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে হ্যারীর কোথাও সাক্ষাৎ হবে? আমি টাকার কথা কিছুই জানতাম না, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। ব্যাপারটা আমার জন্যে খুবই মর্মবেদনার কারণ ছিল।

আমরা ধারণা করতে পারছি টাকাটা বেশিরভাগ কোথায় ব্যয় হয়েছে, বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং।

মানে...হ্যারীর সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তাদের কথা বলছেন?

মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। আমাদের আরও সন্দেহ ওদেরই কেউ হাতুড়ির বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে খুন করেছে হ্যারীকে।

পাথর হয়ে গেল মোনা।

আপনি নৃশংস ঘটনাটা শুনবেন, মিসেস রোপ?

মোনা জানে না সে সায় দিয়েছে কিনা, কিন্তু লেফটেন্যান্ট পোলিং গল্পটা শুরু করল: আমাদের ধারণা বুধবার রাতে আপনার স্বামী ওষুধের দোকানের কথা বললে বেরিয়ে পড়েন। হয়তো আগেই কথা হয়েছিল, কিংবা এও হতে পারে পথে মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তারা সন্ধ্যাটা একত্রে কাটায়। তারপর সন্ধ্যারই কোন এক সময় মেয়েটা আপনার স্বামীকে ভারী এবং ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে। সম্ভবত হাতুড়ি জাতীয় কিছু হবে। মেয়েটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তারপর সে লাশটাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়। কবর খুঁড়ে আমরা যখন লাশটা বের করি, মুর্দার পরনে কোন কাপড় ছিল না। কিন্তু তার জামা কাপড়গুলো কবরের মধ্যেই পাওয়া গেছে। আর তার ওয়ালেট। ওটাও খালি ছিল।

লে-লেফটেনান্ট, তোতলাচ্ছে মোনা, আ-আপনি কিন্তু এখনও বলেননি কিভাবে...কিভাবে আপনার হ্যারী খোঁজ পেয়েছেন।

একটা বাচ্চার কৌতূহলের কারণে, মুখ অন্ধকার করে বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং। একটা হাবকাপ ছিল তার কৌতূহলের কারণ। ছেলেটা ওখানে ভবঘুরের মতো ঘুরে

বেড়াচ্ছিল। একটা খাদের পাশে, ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে চকচকে হাবক্যাপটা তার নজর কেড়ে নেয়। খাদটার পাশে স্তূপ করা মাটির দেখে তার নতুন কবর বলে সন্দেহ হয়। হাত দিয়ে কবরটা খুঁড়তে শুরু করে। থামল যখন নগ্ন পা জোড়া চোখে পড়ল, তখন। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল সে।

একটা...হাবক্যাপ? বিড়বিড় করে বলল মোনা।

এখন সেই গাড়িটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যেটার চাকা থেকে জিনিসটা খুসে পড়েছে, বলল পোলিং।

পা-পারবেন?

সেটাই তো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, মিসেস রোপ। এ যেন খড়ের গাদায় সূঁচের সন্ধান করছি আমরা।

যদি...যদি আপনারা খোঁজ পান?

তাহলে বুঝব আমরা খুনী মেয়েটাকে পেয়ে গেছি।

.

অবিশ্বাস্য মন্থর গতিতে কাটতে লাগল দিন। খবরের কাগজে ফলাও করে হ্যারী খুনের রহস্য ছাপা হচ্ছে। পুলিশ হন্যে হয়ে হাবক্যাপবিহীন গাড়ির সন্ধানে ব্যস্ত। তারপর বেটি আর রয়েস ফেয়ারচাইল্ডদের অদম্য কৌতূহল তো আছেই। আর যতদিন যাচ্ছে, টের পাচ্ছে মোনা, ওর চারপাশে পুলিশী প্রহরার সংখ্যাও বাড়ছে। তবে পুলিশ খুনীর কোন সন্ধানই করতে পারছে না। মোনা মাত্র নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করেছে। এই সময় মূর্তিমান আতঙ্কের মতো হাজির হলো নোকটা।

সেদিন সন্ধ্যায় মোনার দোরগোড়ায় চওড়া কাঁধের লম্বা এক লোক উপস্থিত হলো। তার পরনে নোংরা, জীর্ণ পোশাক, মুখে কৃত্রিম হাসি, ঠোঁটে সিগারেট। তার পেছনে একটি গাড়ি, ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা।

মোনা আগন্তুককে না চেনার ভান করল। কী চাই? জিজ্ঞেস করল সে।

ভণিতা রাখুন, ম্যাম, বলল লোকটা। আমি ফ্রেড টেলর। আমাকে আপনি ভাল করেই চেনন। আমার পেছনের গাড়িটাকেও।

নিমিষে মোনার মুখের রক্ত সরে গেল।

দেখুন, আমি পুলিশের কাছে যেতে পারতাম। বলতে পারতাম এক মহিলাকে আমি চিনি, যিনি আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে হাবক্যাপ ছাড়া ওটাকে ফিরিয়ে এনেছেন।

মি. টেলর, আমি–

আপনার ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, মিসেস রোপ। এছাড়াও হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাসহ আপনার স্বামীর দশ হাজার ডলার নিয়ে পলায়নের ঘটনাও বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছে ওরা।

ফ্রেড টেলর মোনাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকল, একটা চেয়ার টেনে বসল। বসে পড়ো, খুকি, ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল সে। দাঁত বের করে বলল, বসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

কিসের কথা? চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

হারানো দশ হাজার ডলার সম্পর্কে, হানি। ওখান থেকে আমাকে পাঁচ দিলেই আমি একেবারে বোবা হয়ে যাব। বেশি চাইনি কিন্তু। মাত্র অর্ধেক। সিগারেট টানতে টানতে টেলর বলল, দেখো, আমি খুব ভালো করেই জানি এসব ঘটনা কিভাবে ঘটে। স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচনা দেয় তার অফিস থেকে টাকা মারতে। দুজনে মিলে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে স্ত্রী বলে, চলো, দক্ষিণ আমেরিকাটা একবার ঘুরে

আসি। কিন্তু স্বামী বেচারার আর দরজার বাইরে পা রাখার সৌভাগ্য হয় না। স্ত্রী তার চোদ্দটা বাজিয়ে দেয়। তারপর সে একাই মজা করতে থাকে।

বাহ্, দারুণ গপপো ফঁদতে জানো দেখছি। বলল মোনা। তাই কি? হাসল ফ্রেড টেলর, তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। হঠাৎ তার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। হানি, আমি এখানে গপপো মারতে আসিনি। আমি পাঁচ হাজার ডলার চাই নতুবা পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব।

মি. টেলর, প্লীজ... অন্ধের মতো শব্দ হাতড়াচ্ছে মোনা। কী বলবে বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এই ছিল তার কপালে। মি. টে-টেলার, ঢোক গিলে বলল সে, তোমাকে...তোমাকে কি একটা ড্রিঙ্ক দেব? টাকাটা...ইয়ে মানে, আমাকে জোগাড় করতে হবে।

ফ্রেড টেলরকে বিস্মিত দেখাল, কিন্তু কথাটা তার মনে ধরেছে বোধ হয়। মোনার সর্বাঙ্গে দ্রুত একবার নজর বোলাল সে, তারপর বলল, ঠিক আছে, মিসেস রোপ, তোমার কথায় ভরসার গন্ধ পাচ্ছি। তুমি বন্ধু হতে চাইছ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমারও তাতে আপত্তি নেই।

মোনা রান্নাঘরে ঢুকল। তাকে অনুসরণ করল ফ্রেড টেলর। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে মোনা। কিন্তু একই সঙ্গে ঝড়ের গতিতে মাথা চলছে। এই মূর্তিমান আতঙ্কটার হাত থেকে তাকে রক্ষা পেতেই হবে। সে এক বোতল বুরবন বের করল। ফ্রেড মন্তব্য করল, খাসা মাল।

কাবার্ড থেকে দুটো গ্লাস বের করল মোনা, ফ্রিজ খুলল। আইস কমপার্টমেন্টে বরফের কিউবগুলো ট্রের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে আছে। মোনা কিউবগুলো ছোটাতে চেষ্টা করছে, টের পেল ফ্রেড অশ্লীলভাবে তার শরীরের সঙ্গে গা ঠেসে ধরেছে। গলা ফটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল মোনার। কিন্তু ফ্রেড বলল, দেখি, আমি কিউবগুলো নিচ্ছে। সিধে হয়ে গেল মোনা, কিন্তু ফ্রেড ওর কাঁধ চেপে ধরল, চোখে চিকচিক করছে কামনা।

ঝুঁকল ফ্রেড, চুমু খাবে। ঝট করে মুখ সরিয়ে নিল মোনা। এক মুহূর্তের জন্যে ফ্রেডের মুখ ছুঁয়ে গিয়েছিল মোনার চিবুক, বোটকা একটা গন্ধ পেল মোনা। বিদ্যুদ্গতিতে হাতটা ওপর দিকে উঠে এল, ঠাস করে ফ্রেডের গালে চড় কষাল সে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু মোনাকে অবাক করে দিয়ে ছেড়ে দিল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্রেড মোনার দিকে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

ঠিক আছে, খুকী। তোমার বন্ধুত্ব তাহলে স্রেফ ভান! যাকগে, টাকাটা আমার এক্ষুণি চাই! বের করো শিগগির।

মোনা হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

আবার কাঁধ চেপে ধরল ফ্রেড ভয়ানক ঝকি দিতে লাগল। মাগী! টাকা কোথায় রেখেছিস শিগগির বল! গর্জে উঠল সে।

গা-গাড়িতে! ফুঁপিয়ে উঠল মোনা।

ঝাঁকুনি বন্ধ করল ফ্রেড, তীক্ষ্ণ চোখে চাইল মোনার দিকে। মোনা যন্ত্রমানুষের মতো হাঁটতে লাগল, ফ্রেড ওর সঙ্গে এগোল। গ্যারেজে চলে এল দুজনে। মোনা সব কাজ যেন করছে একটা ঘোরের মধ্যে। জানে না কিসের জন্যে সে গ্যারেজে এসেছে, আসলে অবচেতনভাবে ও একটা অস্ত্র খুঁজছিল পশুটাকে শায়েস্তা করতে, ওর হাত থেকে রক্ষা পেতে। গ্যারেজে কি সে রকম কিছু নেই?

শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে মোনা, পাশে দাঁড়ানো ফ্রেড টেলর বলল, এই গাড়িতেই তো, নাকি?

না ট্রাঙ্কে, পকেট হাতড়ে চাবি বের করল মোনা, ট্রাঙ্ক খুলল। খোলা ট্রাঙ্কটা মুখ ব্যাদান করল মোনর দিকে চেয়ে, ওঠার মধ্যে জ্যাক আর লাগ রেন্টটা পড়ে আছে।

খুকী...

কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল ফ্রেড। দেখল মোনা ট্রাঙ্কের মধ্যে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। এবার কি একটা ধরে টানতে লাগল মোনা, ছোটাতে পারছে না।

ফ্রেড মোনার কোমরে হাত রাখল, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল গ্যারেজের দরজার ওপরে।

টাকাটা এখানে আছে, খুকী? কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে। লাইনিং-এর পেছনে?

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মোনা।

ফাঁদে পা দিল ফ্রেড টেলর। ট্রাঙ্কের মধ্যে উঁকি দিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল, লাইনিং ছিঁড়তে শুরু করল। টায়ার রেঞ্চটা মোনার সাহায্যে আসার জন্যেই যেন অদূরে অপেক্ষা করছিল। সামনে বাড়ল মোনা, ঝট করে তুলে নিল লোহার ভারী অস্ত্রটা, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে মরণ আঘাত হানল ফ্রেডের মেরুদণ্ডে।

আর্তনাদ করে উঠল সে, প্রবল ঝাঁকি খেল শরীর। ট্রাঙ্কের ডালায় প্রচণ্ড জোরে থেতলে গেল মাথা। এবার রেঞ্চটা ঘুরিয়ে ফ্রেডের উরুর পিছনে মারল মোনা। গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল ফ্রেডের, মাথাটা ট্রাঙ্ক থেকে বের করেছে মাত্র, তৃতীয় আঘাতটা করল মোনা ওর মুখে। তারপর যেন খুনের নেশা পেয়ে গেল ওকে। একের পর এক বাড়িতে ফ্রেডের মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল।

রেঞ্চটা লাশের গায়ে ফেলে ট্রাঙ্ক বন্ধ করল মোনা, হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফোঁপানির মতো শ্বাস বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, শরীরে সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে কাজটা করতে পেরেছে মোনা। ট্রাঙ্কের ভেতরে লোকটা আর কখনও তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

টলমল পায়ে ঘরে ফিরল মোনা। জট পাকানো চিন্তা-ভাবনাগুলো গোছাতে চেষ্টা করল। ফ্রেড টেলরের লাশটা কোথাও ফেলতে হবে। নদীতে ফেলা যায়। কিন্তু তেমন কোন নির্জন জায়গা মিলবে কি?

হঠাৎ দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ! ভয়ানক চমকে উঠল মোনা, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে গেল শরীর। ওঠার শক্তি পাচ্ছে না। আবার বেল বাজল। পারব। না, কাঁপতে কাঁপতে ভাবল মোনা, আমি আর পারব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, গভীর শ্বাস টানল একটা, দাঁতে দাঁত চেপে পা বাড়াল সামনের দরজার দিকে। দরজা খুলতেই শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নামতে থাকল। চিৎকার দিতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামাল দিল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস চোখ কুঁচকে, বলল, শুভ সন্ধ্যা, মিসেস রোপ। কোন। সমস্যা?

স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মোনা। না, জবাব দিল সে। কণ্ঠ ভাঙা শোনাল। মানে– মাঝ পথে থেমে গেল সে। তারপর বলল, মানে আপনাকে এই সময়ে ঠিক আশা করিনি। ভেবেছিলাম ওই লোকটাই আবার এল কিনা!

আচ্ছা? প্রশ্নবোধক চোখে চাইল ব্যাঙ্কস।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল মোনা। একটা লোক এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। একজন সেলসম্যান। লোকটা ভালো না। আমি ওকে বের করে দেই। আর আপনি যখন বেল বাজালেন, ভাবলাম...ইয়ে মানে ওই লোকটাই বুঝি আবার এসেছে। ওকে আরও কড়া কিছু কথা শোনাবার ইচ্ছে নিয়েই দরজা খুলেছিলাম আমি।

হয়তো লোকটা কাছে পিঠে কোথাও থাকতে পারে, বলল সার্জেন্ট। তবে ওখানে গাড়ি পার্ক করা তার উচিত হয়নি।

সম্ভবত তাড়াহুড়োয় কাজটা করেছে সে। বলল মোনা। থাকগে, আপনার জন্য কি করতে পারি, বলুন?

তেমন কিছুই না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়ালে কৃতার্থ হব, মিসেস রোপ।

এক্ষুনি দিচ্ছি।

সার্জেন্টকে রান্নাঘরে নিয়ে এল মোনা, তার এহেন অদ্ভুত অনুরোধে খানিকটা হতচকিত সে। গ্লাসে পানি ঢালল মোনা। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, মোনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে চলে এল। ড্রাইভওয়েতে গাড়িটার দিকে আবার চাইল সার্জেন্ট। আমি কি ওই সেলসম্যানকে খুঁজে বের করে বলব গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে নিতে?

না, মোনার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। থাক, যার গাড়ি সেই সময়মত নিয়ে যাবে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

ঠিক আছে, মিসেস রোপ। গুড নাইট, সার্জেন্ট।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল মোনা। সার্জেন্ট গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দরজা খুলল। রেজিস্ট্রেশন বুকের ওপর চোখ বোলাল, তারপর রাস্তায় উঠল। এদিক ওদিক বার দুই তাকাল সবশেষে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা কালো সেডানে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

.

এখন মোনার করণীয় কাজ একটাই। কনভার্টিবল গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সার্জেন্ট যদি মোনার কল্পিত সেলসম্যানের জন্যে কোথাও অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সে

মোনাকে অনুসরণ করবে না। সে শুধু ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটার দিকে নজর রাখবে। হয়তো সারারাত সে এখানেই থাকবে। ভাড়া করা সেডানও নড়বে না। পরদিন সহজেই মোনার গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে। এক সেলসম্যান তার ড্রাইভওয়েতে গাড়িটা পার্ক করে তার বাসায় এসেছিল। কিন্তু লোকটাকে পছন্দ হয়নি বলে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোনা ভেবেছে সেলসম্যান হয়তো পড়শীদের কারও বাড়িতে গেছে। না, মোনা জানে না, লোকটা কেন তার গাড়ি নিতে আর ফিরে আসেনি।

মোনা কনভার্টিবলটাকে গ্যারেজ থেকে বের করল, বড় রাস্তায় উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ কালো সেডানটা যেন মাটি খুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল, মোনা বাধ্য হলো ব্রেক কষতে।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস ওর কাছে এল। খোলা জানালায় ঝুঁকে বলল, আপনার বয়ফ্রেন্ডটি কোথায়, মিসেস রোপ? সার্জেন্টের চেহারা পাথরের মতো কঠিন।

মোনা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল, সাদা হয়ে গেল আঙুলের গাঁট। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, সার্জেন্ট।

আপনাদের এখানে কোন সেলসম্যান আসেনি, মিসেস রোপ। আর আপনার উঠানে ওটা একটা ভাড়া করা গাড়ি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটা লোক লুকিয়ে আছে। অবৈধ সম্পর্ক শুধু পুরুষরাই করে না, কথাটা নিশ্চয়ই জানেন। এটা কি সম্ভব নয় যে আপনিও অনেকদিন ধরে কারও সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছেন? এটাও কি সম্ভব নয়

যে আপনি আর আপনার প্রেমিক দুজনে মিলেই আপনার স্বামীর হত্যা পরিকল্পনা করেছেন? আর এটাও বা অসম্ভব কি যে সেই পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আপনার প্রেমিক প্রবর? এই প্রশ্নগুলো আমাকে ভীষণ তাড়া করছে, মিসেস রোপ।

সার্জেন্ট! খাবি খেল মোনা। এসব আপনি কি বলছেন? আমি আজই আপনার বসের সঙ্গে কথা বলব। জানেন আমি তা পারি।

জ্বী, মিসেস রোপ, বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। তা আপনি পারেন। ঠিক আছে, লেফটেন্যান্ট পোলিংকে ফোন করুন আর বলুন–

ওহ্ সার্জেন্ট, দিস ইজ অ্যাবসার্ড! ঝট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মোনা।

আপনার গাড়ির চাবি, প্লীজ।

কি? চিৎকার করে উঠল মোনা।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ কনভার্টিবলটাকে পরীক্ষা করল। মোনার হার্টবিট বেড়েই চলল। ট্রাঙ্ক বেয়ে রক্ত পড়ছে না তো? মোনা মনে করতে পারল না ফ্রেডকে হত্যা করার সময় ওর শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল কিনা...

চাবি, মিসেস রোপ? হাত বাড়াল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, অপেক্ষা করছে।

হতবুদ্ধি মোনা এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

হতে পারে আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্ল্যান করেছেন, বলল সে। হতে পারে সে ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে। ট্রাঙ্কটা তাই আমাকে খুলে দেখতে হবে।

গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল মোনার, ঘুরে দাঁড়াল, দৌড় দেবে। কিন্তু সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস ওর চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। খপ করে সে মোনার কব্জি ধরে ফেলল, গাড়ির সঙ্গে ওকে ঠেসে ধরে সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল গায়ে। খোলা জানালার দিকে হাত বাড়াল সার্জেন্ট, একটানে ইগনিশন সুইচ থেকে খুলে আনল চাবির গোছা, মোনাকে চেপে ধরে নিয়ে এল গাড়ির পেছনে। গোছা থেকে সঠিক চাবিটা বের করে ট্রাঙ্কের তালায় লাগাল ব্যাঙ্কস। তারপর একটানে ডালাটা তুলে ফেলল ওপরে।

ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, আর একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মোনা রোপ।

উইঙ্ক থ্রি টাইমস – জন চার্টারস

আমান্ডা উইন্টারটন তার কুমারী জীবনের প্রায় অবসান ঘটাতে চলেছে।

ভাবনাটি তার শরীরে শিহরণ তুলল, ঝিমঝিম করে উঠল মাথা, মুদে এল চক্ষু এবং নিঃশ্বাস হয়ে উঠল ঘন। সে তার টাইপিং ডেস্কের ড্রয়ার খুলে পেন্সিল খোঁজার ভান করল পাছে অফিসের অন্য মেয়েরা তার জ্বলজ্বলে চেহারাটা দেখে ফেলে এবং তাকে নিয়ে নিতান্তই অবাচীন ও নিষ্ঠুর তামাশায় মেতে ওঠে। ওরা তাকে পেছনে কুমারী বুড়ি বলে ঠাট্টা করে, কখনও কখনও সামনে বলতেও কসুর করে না।

যেহেতু ওরা বয়সে তরুণী এবং সুন্দরী, ছোট ছোট স্কার্ট পরে যেসব সেলসম্যান আসে তাদের প্রত্যেককে সুঠাম পায়ের ঝলক দেখিয়ে দেয় এবং আপত্তিকর সব কথা বলে যা শুনলে ঝাঁ ঝাঁ করে কান, কাজেই তারা যে আমাকে পাত্তা দেবে না এবং কুষ্ঠরোগীর চোখে দেখবে সেটাই স্বাভাবিক।

আমার বয়স আটত্রিশ, একুট বেশিই রোগা, লম্বাটে গড়নের সিরিয়াস চেহারা এবং আঁখিজোড়া বড়বড়। সে তার চুল সবসময় খোঁপা করে রাখে কারণ চুল খুলে দিলে কেশরাজি লুটিয়ে পড়বে তার টাইপরাইটারের ওপর।

গত সতের বছর ধরে, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আমাকে তার পঙ্গু বাপের সমস্ত দেখাশোনা করতে হচ্ছিল। দরদহীন এ সমাজে যারা গ্রাহ্যই করে না আমান্ডার বাপ বাঁচল কী মরল, সামান্য পেনশনের ওপর নির্ভরশীল মানুষটা আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর মেয়েকে। লোকটার জীবন হুইলচেয়ারে আটকে ছিল, মেয়ে ছাড়া তাঁর কেউ নেই।

ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে তারা। প্রতিদিন একই রুটিন: বাবার নাস্তা তৈরি করে আমান্ডা, লাঞ্চ রেডি করে রাখে, তারপর ছোটে অফিসে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হয় ডিনার বানাতে। তারপর বাপকে সময় দিতে হয়, তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, মাঝে মধ্যে সাদা কালো টিভিতে অনুষ্ঠান দেখে, পয়সার অভাবে রঙিন টেলিভিশন কেনা হয়নি, অতপর বিছানায় গমন; পরদিন একই রুটিনের পুনরাবৃত্তি।

মাঝে মধ্যে দুএকটি শনিবারে সে স্থানীয় সিনেমা হলে মুভি দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পায়। তবে আমান্ডা দেখতে সুন্দরী নয় এবং বাসায় গিয়ে বাবার সেবা যত্ন করতে হবে, এরকম অজুহাতে বিরক্ত হয়ে যায় বন্ধুরা। তারা ওর কথা বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, এর ফলে বন্ধুত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে আমাকে পরবর্তী আরও বহুদিন অপেক্ষায় থাকতে হয় যদি কোনো পুরুষ ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

তবে এসব ঘটনা ঘটনা আমাকে না হতাশ করে না তিক্ততায় ভরিয়ে তোলে মন। সে তার বাবাকে ভালবাসে এবং তার বোধে এসেছে কোনো মানুষই সারাক্ষণ সুখে থাকে

পারে না; তার জীবনের এ বোঝ সে খুশি মনেই মেনে নিয়েছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে অন্তত সুস্থ এবং নিরোগ আছে, লাফ দিয়ে চলন্ত বাসে উঠতে পারে, এক দৌড়ে সিঁড়ি বাইতেও তার সমস্যা। নেই, যে কাজগুলো তার বাবা আর কোনদিন করতে পারবেন না। অনেক। বছর পরে আমান্ডা বুঝতে পেরেছে তার শাদী হওয়ার কোনো চান্সই নেই; কোনো পুরুষ চলৎশক্তিহীন একজন মানুষকে তার শ্বশুর হিসেবে মেনে। নেবে না। এতেও কিছু মনে করছে না আমান্ডা। এক চোখ বন্ধ করে কেউ কেউ সেক্স এবং বিয়ে ছাড়া থাকতে পারে এবং ভান করতে পারে এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই, যদিও কোনো উষ্ণ মধ্য রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে যৌবন জ্বালায় কাউকে কাউকে খুব জ্বলতে হয় এবং কামনার গলা টিপেও হত্যা করতে হয়।

আমান্ডা ম্যানেজারের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে। কাজটি সে উপভোগও করে তবে মুশকিল হলো প্রকান্ড অফিসটি আরও চার জনের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। আর সেই চারজনের প্রত্যেকেই তরুণী, আকর্ষণীয় এবং যথেষ্ট সফিসটিকেটেড। তারা ওকে ঘৃণা করে না, ভৎর্সনাও করে না। তাদের কাছে ও স্রেফ কুমারী বুড়ি, বসের সেক্রেটারি, তাকে ওরা পাত্তাই দেয় না তবে মাঝে মধ্যে মজা করার ইচ্ছে হলে ওরা। চার অক্ষরের শব্দটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে আর সেই শব্দটি শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যায় আমান্ডা এবং ভান করে কিছু শোনেনি।

আমান্ডা ডেস্কের ড্রয়ার থেকে মুখ তুলে চাইতে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে লাল চুলের, লম্বা লম্বা পায়ের অধিকারিণী অকালপক্ব আইরিন।

কী হয়েছে, আমান্ডা, তোমার মুখচোখ কেমন গনগন করছে। আমাদের বাজে কথাটা শুনে ফেললে নাকি?

এইলিন, ছিপছিপে এবং সফিসটিকেটেড, সারাক্ষণই বিরক্তিতে কুঁচকে থাকে চেহারা, নিজের ডেস্ক থেকে মুখ তুলে চাইল।

বুঝতে বোধহয় একটু দেরিই করে ফেলেছ, তাই না? আমি তো ভাবলাম তোমার মাসিক টাসিক বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয়।

ওদের কথা শুনে চটে গেল আমান্ডা।

তোমাদের মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না। অনেক পড়াশোনা করে এই-ই শিখেছ বুঝি? নাকি জীবনে কোনোদিন স্কুলেই যাওনি? পিথাগোরাসের সূত্র কী জানো?

না, তবে আমি ওর শিশ্ন দেখেছি! আইরিনের চটাস জবাবে মেয়েগুলো হাসিতে ফেটে পড়ল। এমনকী আমান্ডাও হাসল। আজ তাকে কিছুই আপসেট করতে পারবেন না। ঘড়ি দেখল। প্রায় পাঁচটা বাজে। ঘুরতে থাকো ঘড়ির কাঁটা, ঘোয়রা আমার নিয়তির দিকে, আমার কুমারীত্বনাশের দিকে। যে কাজটি করে অবশেষে আমি পরিপূর্ণ নারী হবো।

.

মাস তিনেক আগে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে আমান্ডার বাপ চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে ডাকছিলেন, অনুযোগের সুরে বলছিলেন তাঁর খুব মাথা ব্যথা করছে। ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে আমান্ডা ছুটে যায় বাবার বেডরুমে। তারপর ডাক্তারকে ফোন করে। আধঘন্টা বাদে ডাক্তার এসে হাজির হন। কিন্তু ততক্ষণে মারা গেছেন আমান্ডার বাবা। ব্রেইন হেমারেজ, বলেন ডাক্তার।

পরের দুটো মাস নিদারুণ এক শূন্যতার মাঝে কেটে যায় আমান্ডার, জীবনে এই প্রথম অনুভব করে সে বড় একা, তাকে আর ছুটতে ছুটতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে হবে না, রাতের খাবার রান্না করার প্রয়োজন। নেই, শনিবার সকালে মুদি দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। এখন সে বাইরে ঘুরতে যেতে পারে, যা খুশি দেখতে পারে, মাঝ রাতে কিংবা রাত তিনটার সময় বাসায় ফিরলেও কিছু আসে যায় না। সে এখন একা।

একদিন বাসে চড়ে কাজে যাওয়ার সময় সে খবরের কাগজের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে পাতায় একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পায় :

এসকর্ট সার্ভিস। মেয়েরা তোমাদের কি সুদর্শন সঙ্গী প্রয়োজন যে তোমাদের বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাবে, তোমাদের সঙ্গে ডিনার করবে, তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যাকে স্বচ্ছন্দে

পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে? আমাদের পুরুষ মডেলরা ভদ্র এবং শিক্ষিত। বিস্তারিত লিখে পাঠানোর ঠিকানা...।

আমান্ডা ওই বিজ্ঞাপনটি বেশ কয়েকবার পড়েছে, ভাবছিল সে তার। নামটা পাঠিয়ে দেবে কি-না কিংবা কীভাবে ওদের ব্যাখ্যা করবে যে সে সিডিউসড হতে চায়। এক রাতে দুই গ্লাস শেরী পান করার পরে চিঠিটি লিখেই ফেলল আমান্ডা।

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের বিজ্ঞাপন অনুসারে, আমি আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরে আসব এবং আমার একজন এসকর্টের প্রয়োজন হবে। তাকে কমবয়েসী কিংবা খুব বেশি সুদর্শন না হলেও চলবে কারণ আমার নিজেরই বয়স আটত্রিশ। তাকে রাত নয়টায় বিলটন টাওয়ার্স হোটেলে আসতে বলবেন এবং ডেস্কে আমার খোঁজ করতে বলবেন। আমি এ চিঠির সঙ্গে ত্রিশ ডলার পাঠিয়ে দিলাম।

একান্ত আপনার
(মিস) আমান্ডা উইন্টারটন

বেশ কয়েকবার কাটাকুটির পরে চিঠিটি পড়ে সন্তুষ্ট হলো ও। সহজ সরল, ব্যবসায়িক টাইপের চিঠি। একবার ভেবেছিল ছদ্মনাম দেবে পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা

ওটা জটিল এবং অপ্রয়োজনীয় ভেবে। এরমধ্যে কোনো দুনম্বরী নেই। ও একটি সন্ধ্যার জন্য একজন সঙ্গী চাইছে, ব্যস। তবে লোকটি আসার পরে ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেয় তা দেখা যাবে।

কয়েকদিন পরেই এজেন্সি থেকে চলে এল জবাব। অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা হয়েছে জনৈক মি. চার্লস হ্যাকফোর্থ শুক্রবার রাত নটা নাগাদ নির্দেশিত হোটেলে পৌঁছে যাবেন। ভদ্রলোকের পরনে থাকবে ডার্ক সুট, তবে টুক্সেডো বা ডিনার জ্যাকেটের প্রয়োজন হলে তিনি তা পরিধান করবেন। সেক্ষেত্রে ফী একটু বেশিই দিতে হবে। চিঠির শেষে, মিস উইন্টারটনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এসকর্ট সার্ভিসে যারা কাজ করেন তাঁরা যথার্থ ভদ্রলোক এবং তিনি নিশ্চয় অত্যন্ত সন্তুষ্টিবোধ করবেন।

সেটা পরদিন সকালে তোমাকে জানাতে পারব, মনে মনে বলল আমন্ডা।

আমান্ডা ভাবছে কত টাকা সঙ্গে নেবে। ১০০ ডলারে চলবে? লোকটাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এলে খরচা কমে যেত তবে তার বাবার স্মৃতি এখনো বড় জ্বলজ্বলে, তাছাড়া আমান্ডার ধারণা এসব কাজের জন্য হোটেল সুইটই ভালো হবে।

টেলিফোনে বিলটন টাওয়ার্সের সুইট বুক করল ও। একটু কেমন যেন অপরাধবোধ হচ্ছে। তবে পাত্তা দিল না আমান্ডা। আজ শুক্রবার রাত। এখন অফিস ত্যাগ করার সময় হলো। অন্য মেয়েগুলোর দিকে আদুরে চোখে তাকাল আমান্ডা। সোমবার সকালে

ওদের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন ও ওদেরই একজন হবে আর কুষ্ঠরোগী হয়ে থাকবে না, কুমারীও রইবে না। তবে ওরা ব্যাপারটা খেয়াল করবে কিনা কে জানে।

.

শহরের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালাচ্ছে চার্লি চমৎকার মুড নিয়ে। যদিও মাঝেমধ্যে নিজেকে গাল দিচ্ছে পথ চিনতে না পেরে ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ার জন্য। কী করে মানুষ এই ইস্পাত কাঠ পাথর আর কাঁচের জঞ্জালের মধ্যে বাস করে ভেবে পায় না সে। যাক তবু এরা চার্লির নিসর্গ ঘেরা গায়ে যে ভিড় জমায়নি তাই ই ঢের।

চার্লির ভাগ্যই বলতে হবে বুড়োটা হঠাৎ করেই তাকে টেল ট্রাক্টর কন্ট্রাক্টের কাজটা পাইয়ে দিয়েছে। এসব কাজ সাধারণত বেনই করে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল আর বুড়ো এরকম বড় একজন মক্কেলকে হারাতে চায়নি। কাজেই চার্লিকে তার চেনাজানা গণ্ডি থেকে টেনে বের করে এনে অচেনা শহরে পাঠানো হয়েছে। ওরা ওর জন্য নামী দামী বিলটন টাওয়ার্স হোটেলে রুমও ভাড়া করেছে। এরকম দামী কোনো হোটেলে আগে কখনো থাকেনি চার্লি।

ড্রাইভিং মিররের দিকে তাকিয়ে হাসল চার্লি। তার মুখটা ভাঙাচোরা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। তবে চেহারা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি চার্লি। যদিও গত দুই বছর ধরে

প্রতিদিন সকালে সে অনিচ্ছাসত্বেও ব্যায়াম করার চেষ্টা করছে ঠেলে ওঠা মধ্যবয়স্ক ভুড়িটাকে বাগে আনতে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না তেমন।

সে একজন ভালো সেলসম্যান এবং নিজের কাজটিকে ভালোবাসে। চাষাভুষো মক্কেলদের অনেকেই তার বন্ধু। সে প্রচুর খায়, প্রচুর মদ পান। করে এবং মাগিবাজিও করে। বিয়েশাদী করেনি কারণ তার বিশ্বাস একজন ভালো সেলসম্যানকে কখনো বাড়ির মায়ায় জড়াতে নেই।

সে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল গাড়ি। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করল বিলটন টাওয়ার্সটা কোনদিকে। লোকটা তার দিকে তাকাল এবং চার্লি গ্রাম থেকে এসেছে বুঝতে পেরে বিরক্ত গলায় রাস্তার ওপাশে চোখ তুলে চাইতে বলল, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেন নাকি, মিয়া? ঝাঁঝাল সুর তার কণ্ঠে।

চার্লি মুখ তুলে তাকাল। সত্যিই তো রাস্তার ওপাশে আকাশ ছোঁয়া। ভবনটির প্রবেশপথে নিয়ন বাতিতে জ্বলজ্বল করছে নাম দ্য বিলটন টাওয়ার্স। সমস্যা হলো এখানে আসতে তাকে অন্তত আটবার ট্রাফিক জ্যামে পড়তে হয়েছে।

লোকটাকে ধন্যবাদ দিল চার্লি। ইন্ডিকেটর বাতি নিভিয়ে রোদে পোড়া হাতটা বের করে তার শেভ্রলে ঢুকিয়ে দিল কতগুলো গাড়ির সারির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িগুলো ব্রেক কষল, তারস্বরে হর্ন বাজাতে লাগল। একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হলো। অবিচলিত চার্লি কোনাকুনিভাবে গাড়ি চালাতে লাগল। গাড়ি নিয়ে এসে থামল পেভমেন্টের সামনে। ইউনিফর্ম পরা এক নিগ্রো দারোয়ান ওকে দেখে মজা পেয়ে হাসছিল।

বাহ, দেখালেন বটে। আপনি নিশ্চয় শহুরে লোক নন, স্যার। মুখ টিপে হেসে চার্লির গাড়ির দরজা খুলে দিল দারোয়ান। চাবিটা রেখে যান। আমি আপনার গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করছি। আপনার মালপত্র পাঠিয়ে দেব, স্যার। কী নাম আপনার?

পার্কার। চার্লি পার্কার। ধন্যবাদ। সে লোকটার কালো হাতে একখানা নোট গুঁজে দিয়ে পা বাড়াল লবি অভিমুখে।

.

আমান্ডা উইন্টারটন ধীরে সুস্থে ঘুরে দেখছে জমকালো সুইটটি।

দামী দামী আসবাব, মেঝেতে পুরু কার্পেট, দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকর্ম, আলোকিত কুলুঙ্গিতে রাখা ছোট ছোট ভাস্কর্য সব খুঁটিয়ে দেখল।

বেডরুমে, যেখানে সাঙ্গ হবে তার অনাঘ্রাতা যৌবন, আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে নীল মখমলের বেড কাভারে ঢাকা বিছানা, নীল কার্পেট এবং পর্দায় চোখ বুলাল। সবকিছু কী সুন্দর পরিপাটি এবং গোছানো।

আমান্ডা আশা করছে মি. চার্লস হ্যাকফোর্থকে বিছানায় নিতে বিশেষ ঝামেলা হবে না; ও বইটই পড়ে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েছে। তাছাড়া নিজেরও কিছু কৌশল খাটাবে আমান্ডা।

এখন কাজে লাগাতে হবে পরিকল্পনার কুশলী অংশ। ও শেরাটন স্টাইলের লেখার টেবিলে বসে ড্রয়ার থেকে হোটেলের অলংকৃত একখন্ড সাদা কাগজ বের করল। তারপর মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লিখল :

প্রিয় মি. হ্যাকফোর্থ,

আমার পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল ঘটেছে। আপনি যখন এখানে আসবেন তখন আমি থাকব না। আপনি অনুগ্রহ করে আমার ২১২২ নম্বর সুইটের চাবি নিয়ে সোজা সেখানে চলে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আপনার জন্য ওখানে হুইস্কি এবং বরফের ব্যবস্থা করা আছে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব।

ইতি

আমান্ডা উইন্টারটন

একটি সুদৃশ্য খামে চিঠিখানা ভরে ওটা বন্ধ করল আমান্ডা। বড় বড় অক্ষরে লিখল চার্লস হ্যাকফোর্থ। সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে শুধু সাইডবোর্ডের একটি ডিম লাইট জ্বালিয়ে রাখল আমান্ডা। মিটমিটে আলো হলেও দেখা যাচ্ছিল স্কচের বোতলটি কোথায় রাখা আছে।

সে এলিভেটরে চেপে লবিতে চলে এল এবং চিঠিখানা ও ২১২২ নম্বর সুইটের চাবি হেড পোর্টারের হাতে তুলে দিল। নটা বাজতে আর কয়েক মিনিট বাকি। আমান্ডা বুফে বারে পা বাড়াল, খানিকটা সময় কাটাতে।

.

কোম্পানির খরচে পেট পুরে ডিনার সারল চার্লি পার্কার। উদার চিত্তে ড্রাই মার্টিনি এবং আধ বোতল ওয়াইন শেষ করল। ঈর্ষা নিয়ে ভাবল এই তো জীবন যে জীবন বেন এ এলাকায় এসে দারুণ উপভোগ করে। অথচ চার্লিকে কিনা কাজ করতে গিয়ে থাকতে হয় চাষাভুষোদের কোনো মফস্বলের এক তারা হোটেলে যেখানে শুধু স্থানীয় ড্রাগস্টোরেই খাবার মেলে। খেতে হয় গরুর মাংস অথবা আলুভাজা, এক ক্যান বিয়ার এবং আন্ট ম্যাবেলের বিখ্যাত আপেল পাই।

নটা প্রায় বাজে। লম্বা সফরে বড় ক্লান্ত চার্লি। টেল ট্রাক্টরস এর ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাল সকাল দশটায় তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। [কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ওখানে তোমার উপস্থিত থাকতে হবে, খোকা। পই পই করে বলে দিয়েছে বুড়ো। কারণ উনি শনিবার সকালে আসছেন শুধুমাত্র এই কন্ট্রাকটা সই করতে!] এখন মখমলের চাদর বিছানো বিছানায় শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে যাবে চার্লি। সে উঠে দাঁড়াল, বিলে সই করল, বুঝতে পারছে আজ একটু বেশিই গিলে ফেলেছে। তারপর সাবধানে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড ডাইনিং রুম থেকে।

লবিতে অনেক ভিড়। পোর্টারের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল চারি। বিধ্বস্ত চেহারার দুই অ্যাটেনডেন্ট হোটেলের বোর্ডারদের চাবি বুঝিয়ে দিচ্ছে, আবার একই সঙ্গে লিখে রাখছে স্পেশাল ফোনকলগুলোর কথা এবং ইস্ট্রাকশনগুলো। ঘুম ঘুম চোখে লোকের ভিড়টাকে লক্ষ করছিল চার্লি। হঠাৎ পোর্টার তাকে জিজ্ঞেস করল :

জি, স্যার। কত নম্বর রুম?

কী? ওহ্, ২১২২ প্লিজ।

পোর্টার চাবির দঙ্গল থেকে চার্লির চাবিটি খুঁজে নিয়ে ওকে দিল। এক মুটকি মহিলা ওকে পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা খেল এবং ওরা পা মাড়িয়ে দিল। চলে যেতে যেতে

অগ্নিদৃষ্টিতে দেখল সে চার্লিকে। চার্লি বিনীত ভঙ্গিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল।

আকাশ ছোঁয়া প্রকাণ্ড ভবনটির উপরের কোনো এক তলায় পুরু কার্পেটে মোড়া করিডরের সামনে এসে ওকে উগরে দিল এলিভেটর।

লম্বা করিডর। অসংখ্য সাইন পোস্ট দেখতে দেখতে বিভ্রান্ত চার্লি। সে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল কত মাইল লম্বা কার্পেট পাতা হয়েছে সৃষ্টিকর্তাই জানেন। প্রতিটি করিডরের দৈর্ঘ, ভবনের উচ্চতা আর ফ্লোরের সংখ্যা মাপার চেষ্টা করছিল ও। মাথা গুলিয়ে যাওয়ার মতো সংখ্যা। ও তালায় চাবি ঢুকিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

ঘরে একটি মাত্র বাতি জ্বলছে। হয়তো মেইড এসে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এর আগে যখন ও গোসল করছিল তখন সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। মেয়েটি ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলেছিল পরের বার এসে সে পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে যাবে। চার্লি মেয়েটির আচরণে মুগ্ধ। তার মনে হয়েছে সে যতবার হাত ধোবে ততবারই কোনো না কোনো সুন্দরী মেইড পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে আসবে।

বাতির আলোয় সাইডবোর্ডে এক বোতল স্কচ চোখে পড়ল চার্লির। হোটেল সার্ভিসের দাক্ষিণ্য। চার্লি ভাবল হোটেল কর্তৃপক্ষ কি প্রতিটি রুমেই একটি করে ফ্রি স্কচের বোতল দেয় নাকি শুধু এরকম জমকালো সুইটগুলোতে। ও গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে পান করল।

বেডরুমের বাতি জ্বেলে নিয়ে কাপড় খুলতে লাগল। ওর পাজামা খুঁজে পেল না। তবে ও নিয়ে মাথা ঘামাল না। প্রচণ্ড ক্লান্ত শরীরে রাজ্যের ঘুম নেমে এলো।

.

প্রসন্ন, ভাবগম্ভীর চেহারা নিয়ে ঘরের কিনারে বসে ধীরে ধীরে দুটো ব্রান্ডি পান করল আমান্ডা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তেজনা। ভাবছে। ব্যাপারটা কীরকম হবে।

প্রথমবার বলে কি খুব ব্যথা পাবে? লোকটা কি ওর ওপর হামলে পড়বে নাকি আদর করবে? লোকটার হয়তো ওকে দেখে পছন্দ হলো না। চলেও যেতে পারে। কিন্তু এ ভাবনা মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিল আমান্ডা। এটা কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন এসকর্টের পক্ষে, কারণ এ কাজটির জন্যই তাকে ভাড়া করা হয়েছে, সে ক্লায়েন্টদের প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। তবে আমাকে তার অপছন্দ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ও মোটা, কুৎসিত কিংবা বুড়ি কোনোটাই নয়, শুধু বয়সটা আটত্রিশ, তাও কোমর সমান চুল ছেড়ে দিলে ওকে আরও তরুণী লাগে...

এখন সময় হলো যাওয়ার। ওয়েটারকে বিল মিটিয়ে দিল। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে আমান্ডার। লবি দিয়ে হাঁটছে, ঘড়িতে দেখল সাড়ে নটা বাজে।

মি. হ্যাকফোর্থ আধঘণ্টা আগেই নিশ্চয় ওর মেসেজ এবং চাবি পেয়েছে। ও পোর্টারের কাছে ২১২২ নম্বর রুমের চাবি চাইলে লোকটা ওকে স্বস্তি দিয়ে জানাল চাবিটি ইতিমধ্যে একজন নিয়ে গেছে। আমান্ডা ক্ষমাপ্রার্থনা করে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল।

লম্বা করিডর পার হয়ে ওর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। লক্ষ করল তালায় ঝুলছে চাবি। বেশ। আস্তে করে দরজা খুলল আমান্ডা। আশা করল দেখতে পাবে লোকটি বসে আছে, তাকে স্বাগত জানাবে, সেই মানুষটা যে কেড়ে নেবে ওর সতীত্ব। কিন্তু হতাশ হলো আমান্ডা।

ঘর খালি। একমাত্র বাতিটি এখনো জ্বলছে। তবে আমান্ডা সন্তুষ্ট হয়ে দেখল হুইস্কির বোতল অনেকখানি ফাঁকা হয়ে আছে। লোকটা কি বাথরুমে গেছে?

বেডরুমে ঢুকল আমান্ডা। বিস্ময় নিয়ে দেখল এক লোক শুয়ে আছে ওর বিছানায়। ওর খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। এ যেন সেই তিন ভল্লুকের গল্পের মতো। লোকটা তো দেখছি বেয়াদব! হয়তো এরকমই হয়ে থাকে যখন ওদেরকে সরাসরি বেডরুমে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। হয়তো আমার ছোট্ট চালবাজিটি কাজে লাগেনি, পুরানো হয়ে গেছে। লোকটা তার চিঠি পড়ে গুঙিয়ে উঠে মনে মনে বলেছে, ওহ্, আবার সেই একই চালাকি! লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর নিদ্রামগ্ন।

ওকে ঘুম থেকে তুলবে কী তুলবে না দোটানায় পড়ল আমান্ডা। শেষে ভাবল কাপড়চোপড় ছেড়ে সরাসরি বিছানায় উঠে গেলেই হলো। তাহলে আর পরে তি হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

ও নিশব্দে বাথরুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। দ্রুত জামা খুলে সঙ্গে আনা কালো রঙের স্বচ্ছ নাইটিটি পরে নিল। ঘণ্টাখানেক আগেই ও গোসল সেরে অকৃপণ হস্তে সুগন্ধী ছড়িয়েছে গায়ে।

দীর্ঘ কেশের খোঁপাটি খুলে দিল আমান্ডা। চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে লম্বা আয়নায় দেখল নিজেকে। রোগা তবে মোটামুটি আকর্ষণীয় চেহারা, কোমর ছাপানো সিল্কি কালো চুল, নাইটগাউনের আড়ালেও ফর্সা, ধবধবে শরীরটি দৃষ্টিগোচর হয়, বড় বড় বাদামী চোখ, একটু ভীত সন্ত্রস্ত চাউনি তবে একই সঙ্গে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। বাথরুমের বাতি নিভিয়ে ও ফিরে এল বেডরুমে।

.

ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল চার্লি পার্কার। ঘুমের ঘোরেই ভাবল বিছানাটা হেব্বি, নরম এবং স্প্রিংয়ের মতো লাফায়। একটি মেয়েকে স্বপ্ন দেখছিল ও, স্বপ্নটা কী নিয়ে তা অবশ্য মনে নেই, তবে জায়গাটা ছিল সুন্দর কোনো হোটেল।

তবে তার অবিশ্বাস্য লাগল যখন টের পেল বেডক্লথ তুলে একটি শরীর আলগোছে ঢুকে পড়েছে বিছানায়, নারী দেহের মাদকতাময় গন্ধ, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে পারফিউমের সুঘ্রাণ। চার্লি বসার ঘরের ছোট বাতিটি জ্বালিয়ে রেখেছে। পাশ ফিরে শুতে মৃদু আলোয় দেখতে পেল ম্যাডোনার মতো একখানা মুখ ডাগর চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয় কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, ভাবছে চার্লি, এ মেয়েটি যে কোনো মুহূর্তে চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু একজোড়া নরম হাত জড়িয়ে ধরল ওর গলা।

আমি দুঃখিত, তোমাকে আমি অপেক্ষায় রেখেছি, চার্লস। এই যে আমি এসেছি। আমি রেডি, প্রিয় চার্লস...

.

রুম নং ২১২২ এবং ২২১২ মধ্যেকার পার্থক্য বিরাট কিছু না হলেও এটি অনেকের জীবন বদলে দিতে পারে। একই ফ্লোরে, করিডরের শেষ মাথায় জনৈক মি. হ্যাকফোর্থ অধৈর্য হয়ে বসে আছেন একটি আর্মচেয়ারে। তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন বিছানার ওপর কেন পুরুষদের পাজামা পরে আছে। অবশ্য নারী স্বাধীনতার এ যুগে, চিন্তা করলেন তিনি, আজকাল শুদ্ধতা বা পবিত্রতা বলে কিছু নেই।

.

পরদিন সকালে মুখে তীব্র রোদের ঝলকে ঘুম ভেঙে গেল চার্লির। এক চোখ মেলল সে। এক মুহূর্তের জন্য মনে করল গতরাতের অবিশ্বাস্য স্বপ্ন এবং তার পরবর্তী ঘটনাটি। ঝট করে উঠে বসল সে। ওটা কোনো স্বপ্ন ছিল না কারণ এখনো সে পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছে। বেডক্লথের বেশিরভাগ লুটিয়ে আছে মেঝেয়।

ঘড়ি দেখল চার্লি। নটা বাজে। টেন ট্রাক্টরস এর ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে দেরিই হয়ে যায় কিনা এ আতঙ্কে সে লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে এবং কাপড় পরতে লাগল। নিচতলায় নাপিতের দোকানে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে সে এক কাপ কফি খেয়ে নেবে।

মেয়েটির কোনো চিহ্ন নেই। সেই দারুণ মেয়েটি নিজেকে যে ভার্জিন বলে দাবি করছিল।

মেয়েটি খেলেছে বেশ, চার্লিও দারুণ খেলা দেখিয়েছে। বলা উচিত এমন চমৎকার খেলা আগে সে কখনো খেলেনি। মেয়েটি বারবারই ওকে চাইছিল এবং চার্লিও একান্ত অনুগতের মতো তার দাবি পূরণ করে চলছিল। বসার ঘরে যেতে যেতে চার্লি মনে মনে বলল, যীশাস, মেয়েটা ছিল দারুণ সংবেদনশীল। আমিও তাই। বিনয়ের অবতার যেন চার্লি।

ম্যান্টলপিসের ওপরে, হুইস্কির বোতলের পাশে একটি চিঠি নজরে এল চার্লির। চিঠির সঙ্গে একটি একশো ডলারের নোট।

প্রিয়তম চার্লস,

তোমার ঘুম ভাঙার আগেই আমাকে চলে যেতে হলো বলে দুঃখিত। আমি চাকরি করি কাজেই নটার মধ্যে আমাকে অফিসে পৌঁছতে হয়। তুমি আমাকে একটি নতুন জীবন দিয়েছ এবং জীবনের নতুন একটি মানে উপহার দিয়েছ। তোমার জন্য সামান্য কিছু টাকা রেখে গেলাম। বলে কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি। তুমি ছিলে দারুণ এবং চমৎকার।

তোমার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে।

এ. ডব্লু

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে এলিভেটরে পা বাড়াল চার্লি। ভাবছিল হোটেলে ওর বিল কত আসবে। যতই আসুক সব উসুল হয়ে গেছে। কী দারুণ ওদের সার্ভিস, এমনকী মহিলা আমার নাম পর্যন্ত জানে! আর টাকাটা পেয়ে চার্লি বেশ ফুর্তি বোধ করছে।

হেব্বি! জোরে জোরে বলল চার্লি। এই আধুনিক হোটেলগুলো সত্যি হেব্বি!

ওয়েট প্রবলেম – ডুয়ানে ডেকার

নিজের শরীরে আঙুল বোলাচ্ছে ফ্যাটস্টাফ। পরনের কাপড় মোটা, খসখসে এবং সস্তা ঠেকল। তার মানে এটা ওর পোশাক নয়।

কেউ ভুল করেছে, বিরক্ত গলায় বলল সে। এটা আমার পোশাক নয়।

ঠিক বলেছেন, বলল নার্স। আপনার জামাকাপড় অ্যাক্সিডেন্টের সময় ছিঁড়ে গিয়েছিল। তবে এই পোশাক দিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ চালাতে পারবেন। এগুলো স্যালভেশন আর্মির কাপড় দিয়ে তৈরি।

আচ্ছা! একটু নরম হলো ফ্যাটস্টাফ। তা আমার চোখ থেকে ব্যান্ডেজ কখন সরানো হবে শুনি?

ডাক্তার আসা মাত্র, জানাল মেয়েটা। উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।

ভাল, বলল সে। ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব।

হাসপাতালের বালিশে আবার মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ফ্যাটস্টাফ। অ্যাক্সিডেন্টের কথা সব মনে পড়ছে। ওইদিন সকালে সে বার্থার বাড়ির পেছনের মাঠটা পেরিয়ে হন হন করে

এগোচ্ছিল। মনে সাহস আনতে সকালবেলাতেই তিন পেগ মদ গিলেছিল ফ্যাটস্টাফ। তারপর চাদি ফাটানো রোদে বেরিয়ে পড়ে অমন দুর্বল শরীর নিয়েও।

মাঠের শেষ প্রান্তে, জঙ্গলের ধারে শুকনো কুয়োটার কাছে কোন ঝামেলা ছাড়াই পৌঁছে যায় সে। এখানেই সে কয়েক হপ্তা আগে টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিল ঝালাই করা একটা বালতির মধ্যে। বালতিটা এখন শুকনো কুয়োর নিচে চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছে।

ফ্যাটস্টাফের হাতে একটা রশি বাঁধা হুক। রশিটাকে সে কুয়োর পাশের শশাগাছের মাথায় কষে বাঁধল। তারপর ঢিল দিতে শুরু করল। হুকসহ রশিটা আস্তে আস্তে নেমে গেল কুয়োর মধ্যে। ঠং করে একটা শব্দ হতেই ফ্যাটস্টাফ বুঝল হুকটা বালতির হ্যাঁন্ডেলের মধ্যে আটকে গেছে। এখন বালতিটাকে টেনে তুললেই সে ত্রিশ হাজার ডলারের মালিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কুয়োর দিকে ঝুঁকতেই মাথাটা বোঁ করে উঠল ফ্যাটস্টাফের। দুর্বল শরীর, তীব্র সূর্যতাপ আর মদের প্রভাব একযোগে আক্রমণ চালাল ওর ওপর। দুনিয়া আঁধার হয়ে এল, অজ্ঞান হবার পূর্ব মুহূর্তে মাথায় তীব্র বেদনা অনুভব করল ফ্যাটস্টাফ। কুয়োর মুখে প্রচন্ড বাড়ি খেয়েছে সে।

.

কটা বাজে এখন? নার্স মেয়েটাকে সময় জিজ্ঞেস করল ফ্যাটস্টাফ।

বিকেল পাঁচটা, বলল মেয়েটা। আঁতকে উঠল সে। তার মানে এখানে আসার পর ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই বার্থা পোমরয় বাস স্টেশনের ওদিকে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হয়তো সন্দেহও করছে ফ্যাটস্টাফ টাকাটা নিয়ে কেটেই পড়ল কি না। আর বার্থা রেগে গিয়ে পুলিশে ফোন করলেই কম্ম সাবাড়। সোজা শ্রীঘরে ঢুকতে হবে ফ্যাটস্টাফকে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে। তাকে চলে যেতে হবে, বার্থা ধৈর্য হারাবার আগেই তাকে পোমরয় বাস স্টেশনে পৌঁছুতে হবে।

আমি এখানে এলাম কী করে? জানতে চাইল ফ্যাটস্টাফ।

এক শিকারী ভদ্রলোক আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, বলল নার্স। আপনাকে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করেন। তারপর অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে তার গাড়িতে উঠিয়ে এই হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। গাড়িতে ওঠানোর সময় আপনার জামা কাপড় সব ছিঁড়ে যায়।

মনে মনে শিকারী ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিল ফ্যাটস্টাফ। গোটা ব্যাপারটা এখন তার আরও পরিষ্কার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে শুরুতেই কী করে সবকিছু ভজকট হয়ে

গিয়েছিল তবু এখনও সময় আছে। টাকাটা এখনও ওখানেই রয়েছে-অপেক্ষা করছে তার জন্য শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।

প্রথম দিকে অবশ্য সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছিল। ফ্যাটস্টাফ নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চুরি চামারি করত। মাস কয়েক আগে, মফস্বল শহর অ্যাপলটনে সে ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে।

শহরের বাইরে, পোস্ট রোড থেকে শ গজ দূরের এক পরিত্যক্ত ফার্মহাউস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফ্যাটস্টাফের। কারণ রাতের বেলায় ভূতুড়ে বাড়িটাতে আলো জ্বলছিল। নক করতেই দরজা খুলে দিয়েছিল বার্থা। বিধবা মহিলা ওকে ভেতরে ডেকে বসায়, ডিনার খাওয়ায় এবং রাতটা ওখানেই কাটিয়ে যেতে বলে। ফ্যাটস্টাফের না করার কোন কারণ ছিল না।

জগৎসংসারে এই ঘুণে-ধরা, পোকায় খাওয়া ফার্মহাউস ছাড়া বার্থার আর কিছু নেই, কেউ নেই। রসিক ফ্যাটস্টাফকে তার ভালো লেগে গেল। ফ্যাটস্টাফও হপ্তাখানেক তার সান্নিধ্য গ্রহণ করল সানন্দে। তাকে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলল মহিলা। তারপর তার গোপন কথাটি একদিন খুলে বলল।

ফ্যাটস্টাফ জানল বার্থা এতদিন একজন যোগ্য পার্টনারের অপেক্ষায় ছিল। বিশ্বাসী, চটপটে এবং চতুর। ফ্যাটস্টাফকে তার খুব মনে ধরেছে। তার বিশ্বাস, এতদিন সে যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সেটার সদ্ব্যবহার করার সময় অবশেষে এসেছে।

কী সুযোগ? জানতে চাইল ফ্যাটস্টাফ। বলল বার্থা। পোেস্ট রোড থেকে সিকি মাইল দূরে, একটা গলি বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। গলির মাথায় একটাই মাত্র বাড়ি-ম্যাকলিন টুল কোম্পানি।

প্রতি শুক্রবার, বিকেল তিনটার সময় বুড়ো ম্যাকলিন বার্থার বাড়ি পার হয়ে তার অফিসে যায় কোম্পানির সাপ্তাহিক বেতন নিয়ে। গাড়ি ড্রাইভ করে সে একাই। এদিকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই জেনেই হয়তো নিরস্ত্র চলাফেরা করে বুড়ো।

এখন ফ্যাটস্টাফের যা করণীয়, ব্যাখ্যা করল বার্থা। তিনটে বাজার আগেই তাকে ওই গলিমুখে পৌঁছাতে হবে এবং ম্যাকলিন বুড়োর গাড়ির শব্দ শোনামাত্র সে শুয়ে পড়বে রাস্তায়, ভান করবে যেন ভয়ানক আহত হয়েছে। ম্যাকলিন শুধু কোম্পানির নির্বাহীই নয়, চার্চের একজন ধর্মযাজকও বটে। সুতরাং স্বভাবতই সে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে নেমে আসবে আহত লোকটাকে সাহায্য করতে। আর ফ্যাটস্টাফ তখন সহজেই বার্থার লুগার পিস্তল উঁচিয়ে, ম্যাকলিনের কাছ থেকে সাপ্তাহিক বেতনের টাকাটা কেড়ে নিতে পারবে।

ওই সময় বার্থা পোস্ট রোড থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, রাস্তার ধারে লুকিয়ে থাকবে। বুড়ো ম্যাকলিনকে কুপোকাত করে ছিনতাই করা টাকাটা নিয়ে ফ্যাটস্টাফ সোজা চলে যাবে পোমরয় স্টেশনে, টিকেট কেটে ভেগে পড়বে নিউ ইয়র্কে। বার্থাও আলাদা বাসে চড়ে নিউ ইয়র্কে, নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফ্যাটস্টাফের সঙ্গে মিলিত হবে।

সব খাপে খাপ মিলে যাবে। কোন ঝামেলাই হবে না, বলেছিল বার্থা।

ফ্যাটস্টাফও প্ল্যানটা নানাভাবে উল্টেপাল্টে দেখে অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নাহ, কোথাও কোন খুঁত নেই। ঝামেলা না হবারই কথা।

কিন্তু ঝামেলা হলো। বুড়ো ম্যাকলিন যে সঙ্গে বন্দুক রাখে তা কে জানত? ফলে পরিকল্পনা মাফিক কাজ এগোল না। গোলাগুলি হলো। তবে ফ্যাটস্টাফের ভাগ্য ভাল প্রথম গুলিটা করার সুযোগ সে-ই পায়।

নিথর ম্যাকলিনকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালাল ফ্যাটস্টাফ। আর এখানেই ভুলটা করল। যাবার আগে ওর পরীক্ষা করা উচিত ছিল বুড়ো সত্যি মরেছে কি না। কিন্তু টেনশনের চোটে অত পরীক্ষা করার সময় ছিল

ফ্যাটস্টাফের। এতদিন চুরি চামারি করেছে, খুন করার কথা কস্মিনকালেও ভাবেনি। এখন মার্ডার কেস পেছনে রেখে পোমরয়ে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে যাবে মনে করে আপাতত লুকিয়ে থাকার জন্য সে বার্থার ফার্মহাউসেই ফিরে এল।

টাকাটা গাপ করে দেয়ার চিন্তাটা তখন মাথায় খেলল ফ্যাটস্টাফের। শুকনো, পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে টাকা লুকালে বার্থা জীবনেও টের পাবে না। আর যতদিন সে টাকার কোন সন্ধান না পাচ্ছে ততদিন নিজের গরজেই ফ্যাটস্টাফকে সে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখবে।

কিন্তু ওইদিন রাতে রেডিওতে খবরটা শুনে অজ্ঞান হতে শুধু বাকি রাখল ফ্যাটস্টাফ। ম্যাকলিন মারা গেছে ঠিকই কিন্তু পুলিশ তাকে রাস্তায় মারাত্মক আহত অবস্থায় আবিষ্কার করার পরে। মৃত্যুর আগে সে ফ্যাটস্টাফের কথা বলে গেছে। পুলিশ রেডিওতে তার টেপ করা নিখুঁত বর্ণনা প্রচার করল, এত মোটা মানুষ জীবনেও দেখিনি আমি, মৃত্যুপথযাত্রী ম্যাকলিনের শ্বাসটানা গলা ভেসে এল। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। আলুর মতো ফোলা গাল। উরু দুটো এত মোটা, প্যান্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিরাট হুঁড়ি। ওকে আপনারা দেখলেই চিনতে পারবেন। অমন মোটা লোক সচরাচর চোখে পড়ে না।

ফ্যাটস্টাফ এবং বার্থা দুজনেই বুঝতে পারল এই চেহারা আর শরীর নিয়ে ফ্যাটস্টাফের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। খুদে এই মফস্বলের যে কেউ তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবে।

এই সময় চট করে আইডিয়াটা মাথায় খেলল ফ্যাটস্টাফের। চিলেকোঠার ঘরে সে লুকিয়ে থাকবে, খুব কম খাবে যাতে শিগগিরই মেদ ঝরে রোগা হয়ে ওঠে। তারপর সময় বুঝে একদিন এখানে থেকে হাওয়া হয়ে যাবে।

চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করল ফ্যাটস্টাফ। দুই মাস ওখান থেকে এক পাও নড়ল না। বার্থা ওকে প্রতিদিন লেটুস, সর ছাড়া দুধ আর শরবতি লেবু ছাড়া অন্য কিছু খেতে দিল না।

দুই মাস পর কুমড়োপটাশ ফ্যাটস্টাফ হাড়গিলেতে রূপান্তরিত হলো। যেন জ্যান্ত একটা কঙ্কাল। এখন সময় হয়েছে পালাবার, বুঝল সে। আর তারপরই লুকানো টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে ঘটল অঘটন।

.

বিছানার একপাশে হেলান দিল ফ্যাটস্টাফ। আসলে কঠোর ডায়েটের পর প্রচণ্ড সূর্যতাপে দুর্বল শরীরে অমন তড়িঘড়ি বেরুনো ঠিক হয়নি তার, ভাবল সে। আর মদ তার সর্বনাশের মোলোকলা পূর্ণ করেছে। ইস, মাথা ঘুরে কীভাবে সে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বার্থা তো এসবের কিছুই জানে না। সে এতক্ষণে পোমরয়ের বাসের টিকেট কিনে ফ্যাটস্টাফের জন্য অপেক্ষা করে নিশ্চয় রেগে বোম হয়ে উঠেছে

নার্সকে জিজ্ঞেস করল ফ্যাটস্টাফ, এখান থেকে চলে যাবার সময় আমাকে কি কোন দস্তখত করতে হবে?

না, বলল সে। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর আপনার মানসিক অবস্থা–প্রবল উত্তেজনাটা অবশ্য সাময়িক ছিল! এই যে! ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন!

ফ্যাটস্টাফ বসা ছিল, ডাক্তারের কথা শুনে আবার টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁধে কার যেন হাতের স্পর্শ পেল, ডাক্তারই হবেন, আন্তরিক সুরে বললেন, হ্যালো!

ফ্যাটস্টাফ মোটা কাপড়ের ফুলপ্যান্টে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, ডাক্তার, আমাকে নতুন কাপড় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু পোশাকটা বড় টাইট লাগছে যে!

পোশাকটা আসলে ঠিকই আছে, বললেন ডাক্তার। আপনি খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন।

দূর, কি বাজে বকছেন! বিরক্ত হলো ফ্যাটস্টাফ। এই প্যান্ট তো একটা তাঁবুর মতই বড়।

তা বটে। কিন্তু আপনি যখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন তখন তো শুকনো, লিকলিকে ছিলেন।

কিন্তু–সে তো আজ সকালেও ছিলাম। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে–

ডাক্তার ফ্যাটস্টাফের চোখের ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে বললেন, এখন কে বাজে বকছে, বলুন তো? আজ সতেরোই সেপ্টেম্বর। আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আগস্টের প্রথম হপ্তায়। এতদিন স্রেফ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। আঘাতটা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে আপনাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাদের জান বেরিয়ে গেছে।

ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হয়েছে। ফ্যাটস্টাফ ধীরে ধীরে সিধে হলো। দরজার পাশে এক মানুষ সমান লম্বা আয়নাটার দিকে এগোল। দাঁড়াল ওটার সামনে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকল নিজের প্রতিকৃতির দিকে।

আবার সে পরিণত হয়েছে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কুমড়োপটাশে। সেই আলু ফোলা গাল, বেটপ কোমর, মোটা পেট। বরং এখন যেন আরও বেশি ফুলেছে সে। ফ্যাটস্টাফ জানে টাকা নিয়ে শহর ছেড়ে পালানো দূরে থাক, হাসপাতালের বাইরে পা দেয়ামাত্র পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে।

পেছন থেকে জানতে চাইলেন ডাক্তার, আপনি যাবার জন্য প্রস্তুত? এখন স্বচ্ছন্দে আপনি চলে যেতে পারেন!

মুখ হাঁ হয়ে গেল ফ্যাটস্টাফের, গলা চিরে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, না! না! না!....

কিল্ড বাই কাইন্ডনেস — নেভরা টায়ার

জন জনসন ঠিক করেছে সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করবে। এছাড়া তার কোন উপায় নেই। আর একমাত্র এই কাজটাই সে খুব ভালভাবে করতে পারবে। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন।

ডির্ভোস দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ডির্ভোসের জন্য সে উপযুক্ত কারণও দাঁড় করাতে পারবে না। মেরী এত ভালো আর ভদ্র যে জীবনে কোনদিন কোনো পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। এতদিনে একটিবারও সে জনের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। মেরী যেমন সুন্দরী, রান্নার হাতটিও তেমনি চমৎকার। আর ওর মত দক্ষ ব্রিজ খেলোয়াড় এ শহরে আর কেউ আছে? মেরী সবার কাছেই খুব প্রিয়।

ভাবতেও কষ্টে বুক ফেটে যেতে চায় যে এমন সুশীলা, সুভদ্রা একটি নারীকে তার হত্যা করতে হবে। কিন্তু ওকে ডির্ভোস দেয়াও যাবে না। বিশেষ করে এই সময়, যখন মাত্র দুয়েক আগে তারা তাদের বিংশত বিবাহবার্ষিকী মহাসমারোহে পালন করেছে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই বলেছিল, মেরী আর জন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং সুখী এক দম্পতি। শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে খুলতে মেরী এবং জন সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রগাঢ় ভালবাসায় উচ্চারণ করেছিল,

আপনারা আশীর্বাদ করবেন আমরা যেন একসঙ্গে মরতে পারি। আর এরপর জন কি করে পারে মেরীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে? এটা স্রেফ ছেলেমানুষী হবে।

তাকে ছাড়া মেরী একদন্ড বাঁচতে পারবে না, জানে জন। ডির্ভোস দিলেও দোকানঘরটা মেরীর নিজেরই থাকবে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। কারণ মেরী অর্থলিপ্সু নয়। জন বাইরে গেলে সে ফার্নিচারের দোকানটাতে বসে সময় কাটায়। ব্যবসা বুদ্ধি যদিও ভালোই মেরীর, কিন্তু এসবের প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। তার সকল আগ্রহ জনকে ঘিরে।

জন যদি মেরীকে ডির্ভোস দেয় তাহলে কে তাকে কনসার্টে নিয়ে যাবে, কে যাবে তার সঙ্গে নাটক দেখতে। তার সবচে প্রিয় জিনিস ডিনার পার্টি জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। স্বামী পরিত্যক্তা মেরীকে কুশল জিজ্ঞেস করতেও কেউ আসবে না। একা, ডির্ভোসি মেরী বদ্ধ হয়ে পড়বে চার দেয়ালের মাঝখানে, কাটাতে হবে দুর্বিষহ জীবন। না, না, মেরীর এমন ভয়ানক অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারে না জন। যদিও জানে মেরীকে যদি সে বলে, আমি তোমাকে ডির্ভোস দেব, তাহলেও মেরী কোন প্রতিবাদ করবে না। এমনই বাধ্য মেয়ে সে।

নাহ্, ডির্ভোসের কথা বলে মেরীকে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার কোন মানে নেই। এত কষ্ট পাবার জন্য জন্ম হয়নি ভাল মেয়েটির।

ইস, যদি গতবারের বিজনেস ট্রিপে লেটিসের সঙ্গে তার পরিচয় না হত! কিন্তু জন এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে অস্বীকার করবে কীভাবে? লেটিসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর, গত ছয়মাস থেকে মনে হচ্ছে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে সে। লেটিসের তুলনায় মেরী কিছুই না। লেটিসকে দেখার পর তার মনে হয়েছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। সারাজীবন সে কালা ছিল, এখন শুনতে পাচ্ছে। আর অলৌকিক ব্যাপারটা হচ্ছে লেটিসও তাকে ভালবেসেছে এবং বিয়ে করতে চাইছে, তার কোন পিছুটান নেই।

লেটিস অপেক্ষা করছে।

আর জেদ ধরছে।

ভালবাসার এই দৃশ্যপট থেকে মেরীকে বাদ দিতেই হবে। ছোটখাট একটা দুর্ঘটনা ঘটলে ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে উঠবে। আর দুর্ঘটনা ঘটা বা ঘটাবার জায়গা হিসেবে দোকানটা সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মেরীর মাথার ওপরের তাকে মার্বেল পাথরের যেসব ভারি আবক্ষ মূর্তি এবং ঝাড়বাতি রয়েছে তার দুএকটা যদি পিছলে মাথার ওপর পড়ে যায় তাহলেই কেল্লা ফতে।

.

ডার্লিং, তোমার বউকে কথাটা বলতেই হবে, লেক্সিংটনের হোটেল ঘরে লেটিস জনের গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলছিল। ওকে তোমার ডির্ভোস দিতেই হবে। আমাদের সম্পর্কের কথা তুমি এখনও মেরীকে জানাচ্ছ না কেন? লেটিসের কণ্ঠ এত নরম আর মিষ্টি যে জনের মনে হচ্ছিল সে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু লেটিসের কথা সে কি করে মেরীকে জানাবে?

লেটিসের আবেদন জনের কাছে মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না।

মেরীর চেহারা বা আচরণে স্বাভাবিক মাধুর্য লক্ষ্যণীয়, কিন্তু লেটিস বেশভূষায় আড়ম্বরপূর্ণ। লেটিস মেরীর মত সুন্দরী না হলেও বিছানায় ওর তুলনা মেলা ভার। লেটিসের উপস্থিতিতে অসাধারণ খেলুড়ে হয়ে ওঠে জন; কিন্তু মেরীর সঙ্গে তার আচরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বামীর মত, রক্ষণশীলতা এখানে অনেকটাই ভূমিকা রাখে। লেটিস কামকলার যে ছলাকলা জানে মেরী হয়তো সেগুলোর নামও জীবনে শোনেনি। লেটিস মানে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রকৃতির চারটি উপাদান; মেরী মানে-থাক, সে এগুলোর সঙ্গে ওর তুলনা করতে চায় না। পরস্পরের সঙ্গে এত তুলনা করেই বা কী লাভ?

বিছানায় ঝড় তুলে পরিতৃপ্ত জন লেটিসকে নিয়ে নিচে এসেছে, বার-এ লেটিস যাবে কিনা জানার জন্যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে, এমন সময় চেট ফ্লেমিংকে হোটেলে ঢুকতে দেখল ও। লবি পার হয়ে সোজা ডেস্কের দিকে আসছে।

চেট ফ্লেমিং লেক্সিংটনে কি করছে? দরকারী কাজে যে কেউ এখানে আসতেই পারে। নাহ্, প্রকাশ্যে লেটিসকে নিয়ে ঘোরাঘুরি বড্ড ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় ওরা ধরা খেতে পারে। কোন জায়গাই ওদের জন্য নিরাপদ নয়। আর চেট ফ্লেমিং ওদের দেখে ফেললে কম্ম সাবাড়। বাঁচালটা দুনিয়ার সব লোককে জানিয়ে দেবে জনের সঙ্গে এক সুন্দরীকে সে হোটেলে দেখেছে। আর মেরীর কানে তো সব কথা যাবেই। ওর অন্তরটা তখন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু অত বেদনা অবশ্যই মেরীর প্রাপ্য নয়।

জন চট করে লেটিসের পেছনে লুকাল। চেট খামোকা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্টের সঙ্গে বকবক করতে লাগল। চোখ তুলে তাকালেই চেট তাদের দেখতে পাবে ভেবে জন পাশের নিউজস্ট্যান্ডের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। চট করে একটা পত্রিকা নিয়ে মুখ নিয়ে মুখ আড়াল করে পড়ার ভান করল। চেট রেজিষ্টারে সই করে লিফটে না ওঠা পর্যন্ত সে ওভাবেই থাকল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক বাবা, বড় একটা ফাড়াকাটল।

জন আর ঝুঁকি নিতে চায় না। লেটিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে চিরস্থায়ী বন্ধনে না বাঁধা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কিন্তু একই সাথে মেরীকেও যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছে করছে না।

আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ ঘুমের মধ্যে মারা যায়। মেরী কেন তাদের একজন হয় না? কেন তাকে খুন হতে হবে?

জন তার আতঙ্কের কথা খুলে বলল লেটিসকে, আবার যখন লেক্সিংটনে গেল সে।

শুনে মাথা নাড়ল লেটিস। বলল : ডার্লিং, এই কাজ করলে আমিও ফেঁসে যাব। কারণ সবাই তখন আমাকেও সন্দেহ করবে। আমি বলি কী, তোমার বউকে আমার কথা এখুনি বলে ফেলো। আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না। কিছু একটা করো।

হ্যাঁ, সোনা। ঠিক বলেছ তুমি। কিছু একটা করব আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

.

আশ্চর্য হলেও সত্যি মেরী জনসনও তার স্বামীর মতো অবস্থায় পড়েছে। প্রেমে পড়ার কথা কল্পনাও করেনি সে। তার বিশ্বাস ছিল সে শুধু জনকেই ভালবাসে। কিন্তু কেনেথকে দেখার পরেই মাথায় কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সেদিন সকালে কেনেথ দোকানে এসে জিজ্ঞেস করছিল মেরীর কাছে মোসার্টের আবক্ষ মূর্তি আছে কিনা। হ্যাঁ, তা অবশ্য মেরীর কাছে ছিল; শুধু মোৎসার্ট কেন, বাখ, বিটোফোন, ভিক্টর হুগো, বালজাক, শেক্সপীয়র, জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যেটে কার মূর্তি নেই তার কাছে?

নিজের পরিচয় দিল কেনেথ। যদিও খদ্দেররা সাধারণত নিজের পরিচয় দেয় না। আসে, দামদর করে জিনিসপত্র কিনে চলে যায়। মেরীও কেনেথকে তার নাম বলল। জানল কেনেথ এ শহরের একজন খ্যাতনামা ইনটেরিয়র ডিজাইনার।

সত্যি বলতে কী, বলল কেনেথ, মোসার্টের এই মূর্তিটি আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি, বরং এটা ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তবুও এটাকেই আমার নিতে হবে। কারণ আমার ক্লায়েন্টের মোসার্টের মূর্তি চাই-ই। আচ্ছা, এছাড়া আপনার কাছে অন্য কি মূর্তি আছে দেখাবেন দয়া করে?

গোটা দোকান ঘুরিয়ে দেখাল মেরী কেনেথকে। তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েক দিন। পরে মেরী চেষ্টা করেছে মনে করতে সে কবে কেনেথের প্রেমে পড়ল; কিন্তু মনে পড়েনি। ওইদিন সারাটা সকাল কেনেথ দোকানেই ছিল; দুপুরের দিকে পেছনের চেস্ট অভ ড্রয়ার রাখা ছোট ঘরটায় সে কি এক অজুহাতে ঢুকে পড়ে। একটা ড্রয়ার টান দিতেই ওটা তার হাতে খুলে আসে, তারপর তার আচরণ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। মেরীকে জড়িয়ে ধরে কেনেথ।

আরে, একি করছেন আপনি? কৃত্রিম রাগে হিসহিস করে ওঠে মেরী। ঈশ্বর! যে কোনসময় কাস্টমার চলে আসবে।

গুল্লি মারো কাস্টমার, বলেছে কেনেথ।

মেরীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না এসব ঘটছে। কেনেথের পুরুষালী বন্ধনের মাঝে নিজেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল সে। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সেবার নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এরপর থেকে যখনই জন ব্যবসার কাছে শহরের বাইরে গেছে, প্রতিবারই কেনেথকে চুমু খেয়ে ঝিকমিকে চোখে জানিয়েছে আজকের রাতটা সে বাড়িতে একা।

চেস্ট অভ ড্রয়ারে গাদা করা পেছনের ঘরটা মেরী আর কেনেথের মিলনের গোপন স্থান হিসেবে চমৎকার ছিল। একদিন, জনের অনুপস্থিতিতে ওরা ওখানে বসে প্রেম করছে এই সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেল। ভালবাসায় এত মগ্ন ছিল দুজনে যে খেয়ালই করেনি কেউ এসেছে।

মিসেস জনসন, কোথায় গেলেন? আমার জিনিসটা নিতে এসেছি, বলল নারীকণ্ঠ।

হুড়মুড়িয়ে অন্ধকার ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল মেরী, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি। এলোমেলো চুল দ্রুত হাতে ঠিক করল সে। জানে ওর লিপস্টিক ছেঁড়া থেবড়া হয়ে গেছে। খদ্দেরটি মিসেস ব্রায়ান, শহরের সবচে গল্পবাজ মহিলা। ভয় পেল মেরী। কোন সন্দেহ নেই মিসেস ব্রায়ান সবাইকে জানিয়ে দেবেন মেরীকে আজ তিনি আলুথালু অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন। আর জনের কানে এই কথা যাবেই।

কিন্তু ভাগ্য ভাল মেরীর মিসেস ব্রায়ান আজ অন্য মুডে ছিলেন। মেরীর দিকে ভাল করে তাকালেন না পর্যন্ত। অর্ডার দেয়া ছিল আগেই, মেরীও প্যাক করে রেখেছিল ঝাড়বাতিটা, টাকা দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে হনহন করে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটা মেরী হাসিমুখে বললেও তার প্রেমিক অন্ধকার করে ফেলল মুখ।

তোমাকে আমি কত ভালবাসি তুমি জানো, সোনা, বলল কেনেথ। আর তুমিও আমাকে আমার মতোই ভালবাস। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে প্রেম। করতে আমার জঘন্য লাগছে। এসব লুকোচুরি আমার পছন্দ নয়। বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি? আমরা বিয়ে করব। তোমার স্বামীকে বলল, তুমি ডির্ভোস চাও।

কেনেথ কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল, যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু যে মানুষটি গত বিশ বছর ধরে তার প্রতি এত সদয় এবং বিশ্বস্ত থেকেছে তাকে কী করে ডির্ভোসের কথা বলবে মেরী? কি করে সে তার সকল সুখ কেড়ে নেবে?

হ্যাঁ, ব্যাপারটার একটা সমাধান হতে পারে যদি জন হুট করে মরে যায়। কেন, ওর কি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে না? প্রতিদিন কত মানুষ হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছে। জন কেন এভাবে মারা যায় না? তাহলেই আর কোন সমস্যা থাকে না।

সেদিন বিকেলে মেরী কেনেথকে ফোন করেছিল, বলল যে আজ রাতে জন বাড়ি ফিরবে না, কাজে শহরের বাইরে গেছে।

শুনে কেনেথ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বলল, ড্যাম ইট, মেরী! এভাবে লুকিয়ে বারবার দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমার জন্য রীতিমত অপমানকর। তোমার সঙ্গে আমি অন্ধকার ঘরে প্রেম করব আর ওদিকে কাস্টমার এসে অমুক তমুক জিনিসের জন্য চিল্লাচিল্লি করতে থাকবে–ওহ, এ অসহ্য! আমাকে অবশ্যই তোমার বিয়ে করতে হবে।

করব তো, ডার্লিং, কিন্তু আরেকটু ধৈর্য ধরো প্লীজ!

অনেক ধৈর্য্য ধরেছি। আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ঘটাং করে ওপাশে ফোন রেখে দিল কেনেথ।

মেরী জানে কেনেথ যা বলেছে তা করবে। কিন্তু কেনেথকে ছাড়া সে। বাঁচবে কেমন করে? জনের প্রতি তো তার এত ব্যাকুলতা ছিল না!

প্রিয় জন। কেমন করে তাকে ছেড়ে আসবে? জীবনের অন্যতম সেরা দিনগুলো সে জনের সঙ্গে কাটিয়েছে, জনের সমস্ত উপস্থিতি ছিল তাকে ঘিরে। তার আনন্দ, সুখ আহ্লাদের প্রতি জনের সবসময় নজর ছিল। ওদের যেসব বন্ধু-বান্ধব আছে সবাই

বিবাহিত। জনকে ডির্ভোস দিলে তার একাই দিন কাটাতে হবে। মেরীকে ছাড়া তার জীবন শূন্য হয়ে পড়বে; বন্ধুরা তাকে তখন করুণা করে তাদের বাসায় ডাকবে। সবাই তাকে বেচারী, দুঃখী জন বলে সম্বোধন করবে। এরচে মৃত্যুও অনেক ভাল ছিল, বলবে তারা। জীবন সম্পর্কে হতাশ জন তখন নিজেকে অবহেলা শুরু করবে; ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করবে না; সমস্ত সময় তাকে এই বাড়িতে একা থাকতে হবে। না, জনকে জেনেশুনে সে এমন নির্বাসন দিতে পারে না।

কিন্তু কেনেথের জন্য সে এমন পাগল হলো কেন? কেনেথের ক্লায়েন্টই বা কেন তখন মোৎসার্টের মূর্তির জন্য বায়না ধরেছিল? ব্রড স্ট্রীটের সেকেন্ডহ্যান্ড দোকানগুলোতে মোৎসার্টের মূর্তি কত সস্তায় পেত কেনেথ। কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে মেরীর দোকানেই বা কেন সেদিন এসেছিল?

এখন আর এসব ভেবে কী লাভ? কেনেথের সঙ্গে সে এখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে, এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। দুজনের মিলনই এর অনিবার্য পরিণতি।

কিন্তু পরিণতিকে অনিবার্য করতে হলে তাকে এখন ভাবতে হবে কত দ্রুত, সুন্দর, সহজ এবং দক্ষভাবে জনের কাছে থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আর খুব তাড়াতাড়ি।

.

ব্যবসার কাজে দিন তিনেকের জন্য বাইরে গিয়েছিল জন জনসন। লেটিসের সঙ্গে সুখসাগরে গা ভাসিয়েছে সে এই কটা দিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে মেরীকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ করে গেল সে। মেরীকে এত সুন্দরী মনে হয়নি তার জীবনেও। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো মেরী ছাড়া তার জীবন বৃথা। কিন্তু পরক্ষণে লেটিসের মুখ মনের আয়নায় ভেসে উঠল। সিদ্ধান্ত নিল কাজটা সে আজই করবে। আজকেই সে মেরীকে খুন করবে। তবে কাজটা করবে রাতে। মেরীর সঙ্গে খুশি মনে ডিনার খাবে। মেরী নিশ্চয়ই আজকেও ওর জন্য চমৎকার সব জিনিস রান্না করে রেখেছে। প্রতিবারই করে, বাইরে থেকে ফেরার পরেই। খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে সে মেরীকে চিরতরে বিদায় দেবে এই দুনিয়া থেকে।

কিন্তু মেরীকে কীভাবে হত্যা করবে সেটা এখনও ঠিক করতে পারেনি জন। সুযোগ মিললে দুএকটা মূর্তি ফেলে দেবে ওর মাথায়। নয়তো অন্য কোন উপায় পরে ভেবে বের করা যাবে।

মেরী ঠোঁটে মধুর হাসির রেখা টেনে জনের হাতে কফির কাপটা দিল।

নাও, কফি খাও, বলল সে। লম্বা ভ্রমণের ক্লান্তি কেটে যাবে।

ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞচিত্তে বলল জন। এই মুহূর্তে সত্যি তার এককাপ গরম কফির খুব দরকার ছিল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে টেবিলের পাশে বসা মেরীর দিকে তাকাল জন। ওর চেহারায় অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি। অবাক হলো জন। গত বিশটা বছর ধরে ওরা পরস্পরের এত কাছে যে সহজেই একে অপরের মনের কথা পড়তে পারে। তাহলে কি মেরী বুঝে ফেলেছে জন তাকে নিয়ে কি ভাবছে? হাসল মেরী; হানিমুনের সেই প্রথম দিনগুলোর মন পাগলকরা নিষ্পাপ হাসি। নাহ্, মেরী কিছু টের পায়নি। অযথাই সে সন্দেহ করছিল ওকে।

ডার্লিং, এক মিনিট, বলল মেরী। দোকানে একটা জিনিস ফেলে এসেছি। ওটা এখুনি নিয়ে আসছি।

উঠে দাঁড়াল মেরী, দ্রুত বেরিয়ে ডাইনিং রুম থেকে, হলওয়ে দিয়ে ঢুকল দোকানে।

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে ফিরল না মেরী। কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখে জন দ্রুত চুমুক দিল কাপে। তারপর সিধে হলো, মেরী দেরি করছে কেন দেখবে।

নিঃশব্দে দোকানে ঢুকল জন। মিডলরুমে, ঝাড়বাতি রাখার ঘরে, একটা সোফায় জনের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মেরী, হাত দুটো একটা মূর্তির ওপর।

ঈশ্বর, জন যা ভেবেছে তাই। মেরী ওর মনের কথা জেনে গেছে। ওর কাঁধ দুটো কাঁপছে। কাঁদছে মেরী। কাঁদছে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জেনে। নাকি ও হাসছে? কাঁধ দুটো যেভাবে নড়ছে তাতে মেরী হাসতেও পারে। কিন্তু কাঁদুক আর হাসুক, যাই করুক, ওর অভিব্যক্তি দেখার সময় এখন জনের নেই। এরকম সুযোগ লাখে একটা মেলে। নিচু হয়ে আছে। মেরী। ওর ঠিক মাথার ওপরের তাকে ভিক্টর হুগো, ফ্রাঙ্কলিন এদের বড় বড় সব মূর্তি। যে কোন একটা মূর্তিকে সামান্য ধাক্কা দিলেই ওটা সরাসরি মেরীর মাথায় পড়বে, চৌচির করে দেবে খুলি। শুধু সামান্য একটু ধাক্কা।

ধাক্কা দিল জন।

কত সহজ কাজ!

মেরী! বেচারী মেরী!

যাক্, এটাই সবচে ভালো হলো। ডির্ভোসের জ্বালা আর সইতে হলো তার স্ত্রীকে। কাজটা এত সহজে হবে ভাবেনি জন। সময়ই তো লাগল না। এত অনায়াসে কাজটা যাবে জানলে সে আরও আগে সুযোগটা নিত।

জন খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শেষবারের মতো মেরীর দিকে তাকিয়ে ডাইনিংরূমে চলে এল। কফিটা শেষ করে ডাক্তারের কাছে ফোন করবে। সন্দেহ নেই ডাক্তার পুলিশকে জানাবে মৃত্যুটা স্রেফ দুর্ঘটনা ছিল। জনকে একটু মিথ্যে বললেই হবে। বলবে মেরী মূর্তি নামাতে গিয়ে হাত পিছলে মাথা ফেটে মরেছে। বলবে মেরীকে সে এর আগেও সাবধান করে দিয়েছিল তাক থেকে ভারি মূর্তি নামানোর সময় যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু আমার কিছু হবে না বলে মেরী তার কথার গুরুত্ব দেয়নি।

কফিটা এখনও গরম। তারিয়ে তারিয়ে ওটা পান করল জন। লেটিসের কথা ভাবছে সে। ওকে টেলিফোন করবে, জানাবে আর কোন সমস্যা নেই, এখন নিশ্চিন্তে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। লেটিসকে পরে জানালেও চলবে।

আনন্দিত হলেও উল্লসিত হলো না জন। শান্ত থাকল। নিজেকে খুব রিল্যাক্স লাগছে। কাজটা নির্বিঘ্নে করতে পারার আয়েশ আর কি। ঘুম পাচ্ছে ওর। ভীষণ ঘুম। লিভিংরুমের কাউচে গিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ডাক্তারের কাছে পরে ফোন করলেও চলবে। কিন্তু কাউচে গিয়ে শোয়া হলো না জনের। ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল। হাত দুটো ঝুলতে থাকল টেবিলের পাশে।

.

করুণ ঘটনাটা কিভাবে ঘটল জন কিংবা মেরীর কোন বন্ধুই ঠাহর করতে পারল না। ওদের মনে সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত জাগল না। সবাই ধরে নিল মেরী কোন কারণে ওই ভারী মূর্তিগুলো নামাতে গিয়েছিল। হাত ফস্কে মূর্তি পড়ে যায় তার মাথায়, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে মেরীর। আর বাইরে থেকে জন এসে মৃতা মেরীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। হয়তো জন ওইসময় সুস্থভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সে তৎক্ষণাৎ কফিতে ঘুমের ট্যাবলেট গুলে ওই কফি পান করে আত্মহত্যা করে।

জন আর মেরীর সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা স্মরণ করে সবাই আহা উঁহু করতে লাগল। ওদের মনে পড়ল বিংশত বিবাহবার্ষিকীতে এই সুখী দম্পতি তাদের মৃত্যু যেন একসঙ্গে হয় বলে সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল। সত্যি, এযুগে এমন স্বামী-স্ত্রীর দেখা মেলা ভার। কি অসাধারণ ভালবাসা আর টান ছিল পরস্পরের প্রতি। আর এই তীব্র প্রেমই দুজনকে টেনে নিয়েছে অমোঘ নিয়তির দিকে, দুজনেই শেষযাত্রা করেছে অনন্তের উদ্দেশে একই রাতে, যেমনটি তারা চেয়েছিল।

ট্র্যাপ – উইলিয়াম এফ নোলান

ভিন্স থম্পসন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই দেখল দোরগোড়ায় এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে।

বেশ তো! ভাবল সে, আবার তাহলে ডাক পড়ল। মাসখানেক আগে আর শেষবার ডাক পড়েছিল।

দরজা বন্ধ করে টুকরোটার ভাঁজ খুলল ভিন্স। সেই একই চেহারার চিরকুট, শুধু একটা ফোন নাম্বার আর নিচে ইংরেজী আদ্যাক্ষর R। আর কিছু লেখা নেই। লাইট জ্বালাল ভিন্স, শিখার ওপর মেলে ধরল চৌকোণা কাগজটাকে। দ্রুত কালো হয়ে এল অক্ষর আর সংখ্যাগুলো, কুঁকড়ে গেল কাগজ। অবশেষে ছাই-এ পরিণত হলো। ফুঁ দিয়ে আঙুল পরিষ্কার করল ভিন্স, হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

ভিন্স? R এর কণ্ঠ বরাবরের মতোই ধাতব আর খনখনে শোনা গেল ওপাশ থেকে।

হ্যাঁ। এইমাত্র খবর পেলাম।

যেতে পারবে তো?

বললে এখুনি বেরিয়ে পড়ি।

এখনই দরকার নেই। আরেকটু পরে বেরুতে হবে। সানসেট-এর পরে বেল এয়ার রোডের মাথায়। পাহাড়টার চুডোর বাঁ দিকে খোলা একটা উঠোন। পঞ্চাশ গজের মতো এগোলে পাহাড়ের মাঝখানে সাদা প্লাস্টার করা একটা বাড়ি দেখতে পাবে। সামনে একটা গ্যারেজ আছে। গ্যারেজের ভেতরে লুকিয়ে থাকবে তুমি। দরজা খোলাই পাবে। কাজেই ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধে হবে না। এগারোটা নাগাদ তোমার শিকার চলে আসবে। সুতরাং তোমাকে পৌনে এগারোটার মধ্যে ওখানে হাজির থাকতে হবে।

১৬৬

হ্যাঁ, ঠিক আছে। লোকটার চেহারা-সুরত কিরকম?

লম্বা। একহারা গড়ন। চল্লিশের কোঠায় বয়স।

আগের মতোই কাজ সারব?

হ্যাঁ, পরিষ্কার কাজ চাই আমার।

আর কিছু?

না, আর কিছু জানাবার নেই, ভিন্স। কেটে গেল লাইন।

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে কাউচে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ভিন্স থম্পসন। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। কাজ হাসিল মানেই একতাড়া কড়কড়ে নোট। উইলমাকে এবার ফারের কোটটা কিনে দেবে ভিন্স। বেচারীর খুব শখ ফারের কোট পরার। আগামী রাতটা ওরা সেলিব্রেট করবে, একসাথে নাচবে, খাবে দামী খাবার.....।

একটা সিগারেট ধরাল ভিন্স, ফুসফুসে টেনে নিল ধোঁয়া। ভাবছে। রহস্যময় R-কে নিয়ে। এই লোককে কখনো কেউ দেখেনি, জানে না তার পরিচয় কি। অদৃশ্য একটা লোকের কাছ থেকে ফোনে নির্দেশ পায় ভিন্স। চিরকুটে ফোন নম্বর লেখা থাকে। তারপর হুকুম আসে অমুককে খতম করো। কাজ শেষ। সাথে সাথে কড়কড়ে নোট। কোন ঝামেলা নেই। অন্তত এ পর্যন্ত কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি ভিন্সকে।

তবুও অস্বস্তিতে ভোগে ভিন্স। নাম পরিচয়হীন এই R কে অশরীরী মনে হয় তার। লোকটার পরিচয় জানার চেষ্টা করেছে অনেক। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তার মতো আরো অনেকেই R-এর ধাতব, খনখনে কণ্ঠের সাথেই শুধু পরিচিত। কেউ দেখেনি তাকে। তবে ভিন্স একটা কথা স্বীকার করে R এর সেটআপে কোন ভুল থাকে না। অত্যন্ত নিখুঁত তার পরিকল্পনা। সব রকম ঝুঁকি এড়িয়ে চলে বলেই ভিন্স আজও পুলিশের কাছে ধরা পড়েনি।

ভিন্স ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে নটা। আধঘণ্টার মতো লাগবে বেল এয়ার-এ পৌঁছুতে। আরো দশমিনিট যাবে পাহাড় চুড়োয় উঠতে। তার মানে গলা ভিজিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় এখনো পাবে সে।

.

বার-টা খদ্দেরে ভরা। শুক্রবার তাই। বেশ কসরৎ করে ভেতরে ঢুকতে হলো ভিন্সের। স্কচ আর পানি আনতে বলে ভিড়ের ওপর চোখ বোলাতে লাগল সে।

আজ রাতে আমি একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছি, মনে মনে ভাবল ভিন্স। আর সেই হতভাগ্য লোকটা হয়তো এ ঘরেই কোথাও আছে। ড্রিঙ্ক এসে গেছে। অল্প চুমুকে গ্লাসটা খালি করছে ভিন্স।

R-এর জন্য এ পর্যন্ত কতজনকে খুন করছে ভিন্স? দশজন? বারোজন? সংখ্যাটা যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না ভিন্সের। ভিন্স থম্পসনের কাছে খুন হচ্ছে পেশা, হিসেব রাখার দায়িত্ব অজানা মি. R এর। বছরখানেক আগে ফ্রিসকো থেকে লস এঞ্জেলস এসেছে ভিন্স। ওর পুরানো বন্ধু মিচ R-কে বলে তার এ কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে। R তার কাজে খুশী, মিচ বলেছে ভিন্সকে। তবে মজার ব্যাপার মিচ নিজেও নাকি R সাহেবের চেহারা এখনো চাক্ষুস করেনি।

পেশাদার খুনী হিসেবে বেশ ঠাঁটেবাটে আছে ভিন্স। মার্সিডিজ গাড়ি কিনেছে একটা। বান্ধবীকে দামী গিফট দিতে পারছে। সুদৃশ্য ফ্লাটে থাকছে। ব্যস, আর কি চাই? বারের ওয়েটারগুলোকে বকশিস পেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসতে দেখে মনে মনে করুণা হলো ভিন্সের। ওরা তিন মাসে যা আয় করে ভিন্স একরাতেই তা রোজগার করে।

স্কচটা শেষ করে আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল ভিন্স।

বার ছেড়ে যখন বের হলো, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগল। একটুও পা টলছে না তার। জানে হাতের কাজটা শেষ করে মাঝরাতের মধ্যে ঘরে ফিরতে পারবে সে। চাই কি উইলমাকে ফোন করে খবরটাও জানাতে পারে।

বেল এয়ার রোডের ঠিক মুখে সানসেট-এর জং ধরা, উঁচু গেটটার নিচে গাড়ি থামাল ভিন্স। কাছে পিঠে গাড়ি-ঘোড়া-মানুষজন কিছু নেই। দ্রুত ড্যাশ বোর্ড খুলে হালকা চেহারার ইটালিয়ান বেরেটা পিস্তলটা বের করল। অস্ত্রটা সবসময় এখানেই রাখে সে। ম্যাগাজিন খুলে চেক করল, তারপর আলগোছে পকেটে রেখে দিল। বুকভরে বাতাস টানল একবার।

R-এর হয়ে ভিন্স কাজ শুরু করার সময় পিস্তলটা নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল। R-এর লোকজন কাজ শুরুর আগে কখনও পিস্তল নিয়ে ঘোরে না। R এর মতে তাতে ঝুঁকি

থাকে বেশি। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু R এর যুক্তি মানতে চায়নি ভিন্স। বেরেটা ছাড়া নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ মনে হয় ওর। ষোলো বছর বয়স থেকে অস্ত্রটাকে নিজের কাছে রাখছে, এক মুহূর্তও কাছ ছাড়া করেনি। কারণ বেরেটা ছাড়া খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সে।

পাহাড়ের পাশে, ধনী লোকজনের বাড়িঘরের কাছ ঘেঁষে পাক খেয়ে চলে গেছে বেল এয়ার রোড। পাহাড়ের চুড়ায় ওঠার সময় ভিন্সের একবার মনে হলো সে বুঝি পিছলে নেমে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটা অন্ধকার এবং সরু। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়তে চায় না ভিন্স।

খাড়া রাস্তা বেয়ে চুড়োয় উঠে এল ভিন্স, মার্সিডিজ থামাল কয়েকটা গাছের নিচে, নিকষ অন্ধকারে। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। এখানে ওর গাড়িটাকে কেউ দেখতে পাবে না। নিচে, মাইলের পর মাইল জোড়া বাতির ঝিলিক। বেভারলী হিলস আর হলিউডের ঘর বাড়ি।

গাড়ি থেকে নামল ভিন্স। হাঁটতে শুরু করল। খুব ঠান্ডা। ছুরির ফলার মতো ধারাল বাতাস গেঁথে যায় মুখে। এদিক-ওদিক নজর বোলাল ভিন্স।

কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না তার। মনে মনে R এর নিখুঁত সেটআপের আরেকবার প্রশংসা করল সে। ধারেকাছে আর কোন বাড়িঘর নেই, সাদা প্লাস্টার করা বাড়িটির সামনে গ্যারেজ। গ্যারেজ এবং রাস্তার মাঝখানে ফাঁকা উঠোন মতো। বেশ লম্বা

জায়গাটা। গুলির আওয়াজ কারো কানে গেলে ভাববে ঢালে গাড়ি ওঠার সময় ইঞ্জিন কোন গোলমাল হয়েছে। খাড়া, পাহাড়ী পথে গাড়ি তুলতে গিয়ে অনেক সময় ইঞ্জিন মিসফায়ার করে, গুলি ফোঁটার শব্দ হয়।

ভিন্স আবার ঘড়ি দেখল। রাত দশটা চুয়াল্লিশ। এখন আগে বাড়া যাক। গ্যারেজের সামনে এসে স্লাইডিং ডোরে হাত রাখল ভিন্স। R ঠিকই বলেছে, খোলাই আছে দরজা, ধাক্কা দিতে খুলে গেল।

ভেতরে, গ্যারেজের এক কোণায় সিগারেটের অনেকগুলো কার্টন চোখে পড়ল ভিন্সের। দরজা বন্ধ করে বাক্সগুলোর দিকে এগোল সে।

ঠান্ডা, শক্ত মেঝেতে আরাম করে বসল ভিন্স দেয়ালে হাত দিয়ে। শিকার দরজা খুললেই গাড়ির আলোয় স্পষ্ট দেখা যাবে তাকে। এরচেয়ে সহজ টার্গেট আর হয় না। সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। সিগারেটের জন্য খাঁ খাঁ করে উঠল বুক। ঝুঁকি হয়ে যাবে ভেবে ধূমপানের ইচ্ছেটাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করল ভিন্স। ডান হাতে বেরেটা তুলে নিল সে, ট্রিগারে আলতোভাবে আঙুল বোলাচ্ছে। একটা গুলিই যথেষ্ট। যখন আর্মিতে ছিল ভিন্স, মার্কসম্যান হিসেবে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। আর ইদানিং তো প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছে। কাজেই টার্গেট মিস হবার কোন কারণ নেই।

নিচের রাস্তায় গাড়ির শব্দ! সতর্ক হয়ে গেল ভিন্স। ইঞ্জিনটা গোঙাচ্ছে। পেশী ঢিল করল সে, সিধে হলো, হাতে উদ্যত বেরেটা। প্রস্তুত।

ভিন্স শুনল গাড়িটা রাস্তার মাথায় চলে এসেছে। এবার ফাঁকা উঠোনের দিকে এগোচ্ছে। সন্দেহ নেই, এসে পড়েছে শিকার।

সারবাঁধা কার্টনগুলোর মাঝে ডুবে গেল ভিন্স। অপেক্ষা করছে। বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল, মেঝেতে জুতোর মচমচ আওয়াজ।

এখন যে কোন সময়...

গ্যারেজের দরজা উপর দিকে উঠতে শুরু করল, ভিন্স দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে রাখল, সময় বুঝে টিপে দেবে ট্রিগার।

চেপে রাখা শ্বাস সশব্দে ফেলল ভিন্স।

গালি দিল একটা।

কেউ নেই ওখানে।

খোলা দোরগোড়ায় তীব্র আলো ছড়াচ্ছে শক্তিশালী দুটো হেডলাইট।

ভিন্স টের পেল ওর গলা শুকিয়ে এসেছে, ঢিপ ঢিপ করছে বুক। আলোর বন্যার দিকে চোখে পিটপিট করে তাকাল সে। কিছুই দেখা গেল না।

শুধু আলো, গাড়ির ইঞ্জিনের অবিরাম শব্দ আর বাতাসের শোঁ শো। হঠাৎ মি. R এর ধাতব, খনখনে কণ্ঠের কথা মনে পড়ে গেল ভিন্সের:

লম্বা, একহারা গড়ন। চল্লিশের কোঠায় বয়স। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ভিন্স। এ যে তার দেহের অবিকল বর্ণনা!

অকস্মাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল ভিন্সের কাছে। মনে পড়ল মিচের। কথা। সে যে অদৃশ্য R সাহেবের ব্যাপারে অন্যের কাছে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল এটা তার পছন্দ হয়নি। ভিন্স R এর কাছে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ল R ঝুঁকি নেয়া পছন্দ করেন না।

এখন, মনে মনে বলল ভিন্স, তোমার করণীয় কাজ একটাই–যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়ো এখান থেকে! নিজের গাড়িতে যদি ভাগ্যক্রমে উঠতে পার তো বেঁচে গেলে এযাত্রা। তবে তার আগে, ওই হেডলাইট জোড়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পরপর দুবার গুলি করল ভিন্স। আলোর নরম দুটো ঝর্ণাধারা ঝিকিয়ে উঠে নিভে গেল। ঘন অন্ধকারে ছুটল ভিন্স।

সামনের রাস্তা নিরাপদ মনে হলো ওর কাছে। গ্যারেজের সামনে দাঁড় করানো গাড়িটাকে সবেগে পাশ কাটাল সে, কুঁজো হয়ে ছুটছে, হাতে উঁচিয়ে ধরা বেরেটা।

এই সময় পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেল ভিন্স। যেন আঁধার ফুঁড়ে বেরোল ওগুলো, একসাথে ডজনখানেক অত্যুজ্জল ফ্লাশ লাইটের চোখ ধাঁধানো আলো চোখে এসে পড়ল। ধাঁধিয়ে দিল চোখ। ঈশ্বর! ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে!

গুলির শব্দটা যদি কেউ শুনেও ফেলে নিশ্চয়ই ভাববে গাড়ির ইঞ্জিনে কোন গোলমাল। খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় ওঠার সময় গুলি ফোঁটার মত শব্দ তো এখানে করেই থাকে ইঞ্জিন।

ডেথ বেট – হাল এলসন

বেলা আড়াইটা বাজে। খুব গরম পড়েছে। ব্যুরোর দিকে তাকাল রজার্স। ব্র্যান্ডির বোতলে খানিকক্ষণ চোখ রেখে ডানে-বামে মাথা নাড়ল। মদ খেয়ে কোনও লাভ হবে না। ঘড়ি দেখল সে। মাদক ব্যবসায়ী মোরেনোর ফোন করার কথা ছিল। করেনি এখনও।

এদেশে কোনও কিছুই সময় মেনে চলে না, ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবছিল রজার্স এমন সময় বেজে উঠল ফোন। নাইট-টেবিলে রাখা ফোনটি খপ করে তুলে নিল সে।

রজার্স? জানতে চাইল অপরপ্রান্তের কণ্ঠ।

হু, বাটলার।

খবর কী?

কোনও খবর নাই।

ফোন করেনি?

এখনও করেনি। এখন আমাদের করণীয় কী?

অপেক্ষা করো। এ মুহূর্তে এটাই করণীয়।

গত দুইদিন ধরে এই হতচ্ছাড়া ঘরে আমি অপেক্ষা করেই আছি, বাটলার।

হেসে উঠল বাটলার। বার-এ গিয়েও ফোন ধরা যায়, তুমি জানো।

তা যায় বটে।

তবে বেশি মদ গিলো না যেন। তা হলে সামাল দিতে পারবে না।

বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ।

আরেকটা কথা, রজার্স।

বলো?

মোরেননা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, ওর সঙ্গে তোমার দেখা। করার জন্য উতলা হবার দরকার নেই।

তা হলে মাল বিনিময় হবে কী করে?

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কেউ ওর হয়ে কাজটা করবে। এমনকী যদি কোনও অন্ধ ভিক্ষুকও আসে মাল নিয়ে, অবাক হয়ো না।

তুমি মশকরা করছ।

না। মোরেনোর কাজের ধরনই ওরকম। খুব অভাবগ্রস্ত কাউকে সামান্য কিছু পেসো ধরিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়ে নেয় সে। সস্তা, তবে চতুর পদ্ধতি।

হয়তো বা, বলল রজার্স। কিন্তু মোরেনো ফোন করছে না কেন? আমরা কোথায় আছি জানে না সে?

জানে, তবে সে খুব সাবধানে নড়াচড়া করে। হতে পারে তোমার ওখানে উল্টোপাল্টা লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পরিস্থিতিও হয়তো খুব বেশি উত্তপ্ত। কাজেই শক্ত হয়ে বসে থাকো।

হুম।

ওকে, টেক ইট ইজি। বলে লাইন ছেড়ে দিল বাটলার।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রজার্স। হুঁ, টেক ইট ইজি বললেই হলো, মনে মনে ভাবছে সে। সব ভোগান্তি তো আমাকেই পোহাতে হবে। বাটলার চার ব্লক দূরে একটা হোটেলে আরামে এবং নিরাপদে আছে। তাকে কোনও ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। যদিও কাজটা তার, অর্থও তার।

বোতল মনোযোগ ফেরাল রজার্স। ছিপি খুলে লম্বা এক ঢোক মদ গিলল। আরেক চুমুক দিয়ে তাকাল বোতলের দিকে। প্রায় সিকিভাগ খালি

করে ফেলেছে।

টেক ইট ইজি, মনে মনে শব্দটা আওড়াল সে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসল। খিচড়ানো মেজাজ একটু শান্ত হয়েছে।

রিসিভার তুলে হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জানিয়ে দিল তার কোনও ফোন এলে যেন বার-এ কলটা রিলে করে দেয়া হয়। রিসিভার রেখে দিয়ে দরজায় পা বাড়াল রজার্স।

হলওয়ে ছায়াময়। টাইলসে ওর জুতোর হিলের খটমট আওয়াজ উঠল। ব্র্যান্ডিটা কাজ শুরু করে দিয়েছে, শরীরটা আর আগের মতো ভারী লাগছে না।

ভিভা, মেক্সিকো! এলিভেটরের সুইচে হাত রেখে বলল রজার্স।

এলিভেটরের দরজা খুলে যখন বেরিয়ে এল সে, শরীর আশ্চর্য হালকা লাগছিল উঁচু ছাতের প্রকাণ্ড লবি, ওপরে ছায়াঘেরা বাতির ভেসে আসা ম্লান আলো, হঠাৎই যেন কাঁপতে শুরু করল। তরল এবং দুর্বোধ্য স্প্যানিশ কণ্ঠের শব্দরাজি তাকে ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। শুনতে ভালই লাগছে, অপরিচিত ঠেকছে না মোটেই। সাদা জ্যাকেট পরা এক বেলবয়ের গায়ে ধাক্কা খেল রজার্স। সে বাউ করে ক্ষমা চাইল।

দোষ আমার, দ্রুত বলল রজার্স। বারটা কোনদিকে?

ঘষা কাঁচের একটি দরজা দেখিয়ে দিল বেলবয়, রজার্স কদম বাড়াল ওদিকে। হালকা শরীর এবং অপেক্ষার যন্ত্রণা সইবার পরে এ মুহূর্তে অনুত্তেজিত।

তবে এটা একটা বিপদ-সংকেত। বার-এ চলে এল সে। টেক ইট। ইজি, মনে মনে বলল রজার্স। আর ব্র্যান্ডি পান করা চলবে না।

মাথা ঝাঁকাল বারম্যান। সিনর?

একটা বিয়ার।

এক-দুই-তিন বোতল। আস্তে ধীরে ধীরে ড্রিংক করবে ভেবেছিল রাজর্স, কিন্তু একটা বিয়ার পান করার পরে শরীর ভালো লাগছিল বলে

পরপর চারটে বোতল সাবাড় করল।

আজ আর মোরেনো ফোন করবে না, মনে মনে বলল ও। বেরিয়ে এল বার থেকে।

পেভমেন্টে ছুরির ফলার মত সাদা রোদ ঝকমক করছে, ধাধিয়ে দেয় চোখ। রাস্তার ওপাশে ছোট্ট প্লাজার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল রজার্স। জনশূন্য প্লাজা। প্রচন্ড উত্তাপে ঝিমোচ্ছে। ভারী আওয়াজ তুলে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা।

শরীরটা কেমন দুলছে রজার্সের। চোখ বুজল। চোখ মেলে চাইতেই দেখল তামাটে একটি মুখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল লোকটা।

গাড়ি চড়ে কোথাও যাবেন, সিনর?

গাড়ি চড়ে কোথায় যাব? জিজ্ঞেস করল রজার্স।

ঝট করে একটি তালিকা মেলে ধরল লোকটা, যাতে একজন ট্যুরিস্ট আকর্ষণ করার মত নানান ট্যুরের কথা লেখা আছে। মাথা নাড়ল রজার্স।

কোনও ট্যুরে যাবেন না, সিনর?

না।

তা হলে অন্য কিছু?

ইতস্তত করছে রজার্স, এক লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে।

সিনর, আমি একজন অফিশিয়াল গাইড, দ্রুত বলল সে।

আমি সস্তায় আপনাকে সেবা দিতে পারব, কাজেই এ লোকটাকে ভাড়া করার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি।

হা, এ লোকের কোটের ল্যাপেলে একটা বাটন আছে আর তাতেই সে অফিশিয়াল হয়ে গেল! বলল প্রথম লোকটা। ও আর ওর বন্ধুরা একাই সব কিছু ভোগ করতে চায়।

ওর কথায় কান দেবেন না, সিনর। ওকে ভাড়া করলে পস্তাবেন। ও রেজিস্টার্ড নয়।

কেন নই? ক্রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করল প্রথম লোকটা। কারণ তুমি আর তোমার বন্ধুরা আগেই সব দখল করে রেখেছ।

অফিশিয়াল গাইডের দিকে তাকাল রজার্স। ধোপদুরস্ত সাজে সজ্জিত সে, বোঝাই যায় ভালোই কামায় এবং যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসীও। আমি এ লোককে আগেই ভাড়া করেছি, বলল সে প্রথমজনের দিকে ইঙ্গিত করে।

বাউ করল অফিশিয়াল গাইড তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে চলে গেল।

এখন বলো, বলল রজার্স, ট্যুর ছাড়া আর কী জিনিস তুমি আমাকে দেখাতে পার।

অনেক কিছুই সিনর।

জুয়া খেলার আসরে নিয়ে যেতে পারবে?

আপনি যেতে চাইলে নিশ্চয় নিয়ে যেতে পারব। আমার চেনা এরকম একটি মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা আছে।

মর্যাদাসম্পন্ন? হেসে উঠল রজার্স, গাইডকে ভুরু কোচকাতে দেখে তার পিঠে চাপড় মারল।

ঠিক আছে, চলো তোমার মর্যাদাসম্পন্ন জায়গাটি একটু দেখে আসি।

বাদামী মুখে আবার ঝিলিক দিল ধপধপে সাদা দাঁত। বাউ করল গাইড, ত্রিশ ফুট দূরে রাখা একটি গাড়ি দেখাল হাত তুলে।

ওদিকে হাঁটা দিয়েছে রজার্স, রাস্তাটা যেন দুলে উঠল, সাদা আলোর বিচ্ছুরণ চোখে কেমন ঝাপসা ঠেকল। একপাশে কাত হয়ে গেল দেহ, হুমড়ি খেল। শক্তিশালী একটি হাত ওকে খপ করে ধরে ফেলল, সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

আপনি ঠিক আছেন তো, সিনর?

হুঁ।

হাসল গাইড, এক ছুটে গাড়ির সামনে গিয়ে দরজা খুলে ধরল। রজার্স ভেতরে বসলে বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর ঘুরে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।

গরম, জনশূন্য রাস্তা দিয়ে দশ মিনিট গাড়ি চলার পরে গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। রোদে পোােড়ানো ইট দিয়ে তৈরি পুরানো একটি বাড়ির সামনে এসে থামল গাড়ি। বাড়িটির দেয়াল নীলচে, গরাদঅলা জানালাগুলো বন্ধ।

শূন্য রাস্তায় চমকাচ্ছে রোদ। রজার্স চোখ কুঁচকে জানতে চাইল, এই সেই জায়গা?

জি, সিনর।

দেখে তো মনে হয় না ওখানে কোনও জনপ্রাণী আছে।

ওখানে কেউ না কেউ সবসময়ই থাকে। আপনি ভেতরে গিয়ে ওদের শুধু এই জিনিসটা দেবেন। একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল গাইড।

ওটা নিল রজার্স। তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

জি, সিনর।

আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।

তাতে কোনও সমস্যা নেই।

গাড়ি থেকে নামল রজার্স। বাড়িটির দরজা খুলতেই শীতল হাওয়া মোলায়েম পরশ বুলাল মুখে। চোখ মিটমিট করল সে। ঘরটি দেখে ঠিক জুয়াড়িদের আস্তানা বলে মনে

হয় না। মৃদু স্বরে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত। একটি লম্বা টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জনাআষ্টেক ডাইস-প্লেয়ার। ছোট একটি বার-এর পেছনে বসা লালমুখো এক মোটকু রজার্সের দিকে তাকিয়ে মাথা। দোলাল। গাইডের কার্ডখানা তার হাতে দিল রজার্স। মোটু ওকে নিয়ে লম্বা টেবিলটার দিকে এগোল যেখানে গড়াতে শুরু করেছে ডাইস।

.

ঘণ্টা তিনেক পরে বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এল রজার্স। গাইড তখনও তার জন্য অপেক্ষা করছে। রজার্সকে দেখামাত্র সে গাড়ি থেকে নেমে খুলে ধরল দরজা। রজার্স ভেতরে ঢুকল।

আপনি ঠিক আছেন তো? হুইলের পেছনে বসে জিজ্ঞেস করল গাইড।

হু, জবাব দিল রজার্স। তবে সে মোটেই ঠিক নেই। মাতাল হয়ে আছে সে। তারচেয়েও খারাপ খবর হলো জুয়োয় পাই-পয়সাটি পর্যন্ত হারিয়েছে। কেমন খেললেন? জানতে চাইল গাইড।

খুব খারাপ।

ওহ্, তা হলে তো দুঃসংবাদ।

মস্ত দুঃসংবাদ, ভাবছে রজার্স। জুয়া খেলতে গিয়ে নিজের যে সর্বনাশ করেছে ভাবতেই অসুস্থ বোধ করল।

আর কোথাও যাবেন? বলল গাইড। নাকি হোটেলে ফিরবেন?

এখনই না।

আপনি যা বলেন। সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে রইল গাইড, অপেক্ষা করছে। তারপর বলল, কোনও ভালো রেস্টুরেন্টে যাব?

কোনও রেস্টুরেন্টে যাব না।

শ্রাগ করল গাইড। তা হলে আপনিই বলুন কোথায় যেতে চান?

হোটেলেই চলো।

গাইড কোনও মন্তব্য না করে ছেড়ে দিল গাড়ি। বাহন চলতে শুরু করেছে, চোখ বুজল রজার্স।

এ আমি কী করলাম? ভাবছে সে। জুয়ার আস্তানার কথা মনে পড়তেই আবারও অসুস্থ বোধ করল। সে হেরেছে। শুধু নিজের অর্থই নয়, মোরেনোর কাছ থেকে মাল কেনার জন্য বাটলার যে টাকাটা দিয়েছিল সে টাকাটাও জুয়ায় খুইয়েছে রজার্স।

মাই গড, মনে মনে বলল সে। তবে সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। মোরেনো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। হয়তো সে আর ফোন করবে না। হয়তো...

নিজের সঙ্গেই সে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে, জানে রজার্স। মোরেননা তার সঙ্গে যদি যোগাযোগ না-ও করে, বাটলারের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ টাকাটা বাটলারের।

কাজেই মোরোনোর সঙ্গে কথা বলাই ভাল। ওর সঙ্গে যেভাবেই হোক যোগাযোগ করতে হবে তারপর যদি কথা বলে বুঝিয়ে সুজিয়ে...

এ অসম্ভব। মাদক ব্যবসায়ীদের কথার জাদুতে ভোলানো যায় না। তারা মাল দেবে, টাকা নেবে। বাকির কারবারে তারা নেই। তাদের ক্ষেত্রে শুধু টাকা কথা বলে। নতুবা অস্ত্র।

অস্ত্র! শব্দটা যেন রজার্সের মস্তিষ্কে, বিস্ফোরণ ঘটাল। থেমে গেল গাড়ি।

সিনর?

চোখ মেলল রজার্স। হোটেলের সামনে চলে এসেছে ওরা। রাস্তার চোখ ধাঁধানো অত্যুজ্জ্বল আলোটা নেই তবে রাস্তাটা এখনও কাঁপছে ওর চোখের সামনে।

আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন? জিজ্ঞেস করল গাইড।

না, আমি ঠিক আছি। তবে এখানে বড্ড গরম। চলো ভেতরে গিয়ে একটু গলা ভেজাই।

কপালে ভাঁজ পড়ল গাইডের।

কী হলো?

আমাকে গাড়িটা চালাতে হবে, সিনর।

গাড়ি নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আসলে গাড়ির কথা তুমি ভাবছও না। তুমি ভাবছ আমি মাতাল হয়ে গেছি, না?

না। তবে আপনাকে খুব অস্থির ও চিন্তিত লাগছে।

মন্তব্যটা ধাই করে আঘাত করল রজার্সকে তবু চেষ্টাকৃত হাসি ফোঁটাল মুখে।

পৃথিবীর কোনও কিছু নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা নেই। চলো, গলা ভেজাই। আমার গলা শুকিয়ে মরুভূমি।

আপনি যা বলেন।

গাইডের গলার স্বরে কোনও উত্তাপ নেই। তার আচরণ হঠাৎই কেমন অস্বস্তিকর ঠেকল রজার্সের কাছে। তবে সে জানে আসলে টাকা খোয়ানোর শোকটাই তাকে বিব্রত করছে।

গাইড দরজা খুলে দেয়ার আগেই নিজে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রজার্স। নিজেই কাজটা করতে পেরেছে বলে খুশি লাগল। একটু হাসার ইচ্ছে জাগলেও হাসল না।

হোটেলের কাঁচের দরজা খুলে গেল। ঢোলা ইউনিফর্ম পরা ধূসর চুলো এক লোক গোমড়া মুখে বাউ করল রজার্সকে। লবিটি বেশ ঠাণ্ডা। বার-এ পা বাড়াল রজার্স। বিয়ার দিতে বলল বারম্যানকে। ফিরল গাইডের দিকে। সে-ও বিয়ার নেবে জানাল।

ওরা দুজন একটা টেবিলে বসে বিয়ার পান করছে, কিছুক্ষণ পরে বারম্যান হাঁক ছাড়ল, সিনর রজার্স?

এই যে এখানে।

আপনার ফোন। কোনও একটা বুদে ঢুকে কথা বলুন, প্লীজ।

ঘরের শেষ প্রান্তের একটি খালি বুদে ফোনের প্লাগ লাগিয়ে দিল সাদা জ্যাকেট পরা এক ছোকরা। এটুকু সময় অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করল রজার্স। মোরেনো ফোন করলে সর্বনাশ।

হ্যালো।

বাটলার বলছি। খবর কী?

কোনও খবর নাই।

ভেরী ব্যাড।

হুঁ।

আমাদের বোধহয় অন্য চিন্তা করা উচিত।

মানে?

আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি একজনকে চিনি। তার কাছ থেকে মাল কিনব।

স্তম্ভিত রজার্স চেপে ধরল রিসিভার। আবার পুরোটা নতুন করে শুরু করতে চাইছ?

অপেক্ষা করার চাইতে সেটাই করা ভাল নয় কি?

অপেক্ষাটা কে করছে, তুমি নাকি আমি? গত দুদিন ধরে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে আমি অপেক্ষার প্রহর গুণে চলেছি। মোরোনোকে একটা সুযোগ তো দিতেই হবে।

আচ্ছা। কাল সকাল পর্যন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করব। ঠিক আছে?

আচ্ছা। জবাব দিল রজার্স। জানে এর বেশি সময় সে চাইতে পারবে না।

ওকে। টেক ইট ইজি।

কেটে গেল লাইন। রজার্স ফোন রেখে ফিরে এল বার-এ। ফোনটা ওর মনে সাময়িক স্বস্তির বৃষ্টি ঝরালেও দুশ্চিন্তার মেঘ পুরোপুরি কাটেনি। কারণ বাটলার মানুষ হিসেবে খুবই নির্দয় এবং নিষ্ঠুর।

গাইড লক্ষ করছিল ওকে। ওর চেহারায় উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের ছাপ দেখে ওকে খুশি করার চেষ্টা করল।

কিন্তু তুমি আমাকে খুশি করতে পারবে না, মনে মনে বলল রজার্স। আমার টেনশন কেউই দূর করতে পারবে না। সে বিয়ার শেষ করল।

আরেকটা নেবে?

আপনি যা বলেন, সিনর।

বারম্যান আরও দুটো বোতল এনে ভরে দিল গ্লাস। তাকে লক্ষ করতে করতে রজার্সের মনে পড়ল মদের দাম তো সে দিতে পারবে না। সে তো ফতুর।

গুঙিয়ে উঠল রজার্স। তার গোঙানি শুনতে পেল গাইড। পকেটে হাত। ঢোকাল রজার্স। একটি মাত্র পেসো আছে। আমার কাছে আর পয়সা নেই, বলল সে। তুমি কি একটু...

নিশ্চয়, হাসল গাইড। মদের দাম চুকিয়ে দিয়ে বকশিসও দিল।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কিছু নেই।

মদ্যপান শেষে ওরা বার থেকে বেরিয়ে এল। এখন, ভাবছে রজার্স। আর ফেরার উপায় নেই। ওকে আবার চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলি, বলল সে গাইডকে। আমার কাছে তোমার কত পাওনা হয়েছে?

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল গাইড। একশো পেসো।

ও, আচ্ছা। টাকাটা পরে নিলে চলবে তো? তোমার সঙ্গে আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

নিশ্চয়, সিনর। আমার কোনও তাড়া নেই।

হাসল রজার্স। একশো পেসো তার জন্য কোনও টাকাই নয়। কিন্তু গাইডের কাছে-এক হাজার পেসো পেলে সে কী না করতে পারবে? যদি...

নিজের চিন্তার গাড়ির ব্রেকটা থামিয়ে দিল রজার্স। সে আর কিছু ভাবতে চাইছে না। কিছু ভাবতে পারছেও না।

আবার ডাকব তোমাকে। তখন টাকা পয়সার হিসেবটা বুঝিয়ে দেব।

আপনি যা বলেন।

তোমাকে কোথায় পাব?

হোটেলের সামনে। কিংবা রাস্তার ওপাশের বার-এ।

ঠিক আছে।

এলিভেটরে পা বাড়াল রজার্স। লবিটি আগের চেয়েও অন্ধকার লাগছে। খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ভেতরে ঢুকল রজার্স। লিফটম্যানকে বলল, চালতলা, প্লীজ।

কখন এলিভেটর থেকে নেমেছে আর কখন লম্বা হলওয়ে ধরে হাঁটা দিয়েছে কিছুই মনে নেই রজার্সের। সে নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তালায় ঢোকাল চাবি, খুলতে এত বেশি সময় লাগল যে দরজার ওপরের রুম নম্বরে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে লিন সঠিক ঘরটিতেই সে এসেছে কিনা।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল রজার্স। জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা সাদা আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। জানালা বন্ধ করে দিতে চাইল রজার্স কিন্তু বিছানার ওপরে একটা কাঠের গুঁড়ির মতো দড়াম করে পড়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ঘুম ভাঙল ফোনের ঝনঝনানিতে। ততক্ষণে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়েছে ঘরে। ফোনেস হাত বাড়াল রজার্স।

হ্যালো?

আবার বটলার। জানতে চাইল মোরেনো ফোন করেছিল কিনা।

এখনও করেনি, জবাব দিল রজার্স।

লাইন ছেড়ে দিল বাটলার। বিছানা ছাড়ল রজার্স। সুইচ টিপে বাদি জ্বালল। তাকাল আয়নায় নিজের ভীত, বিবর্ণ প্রতিবিম্ব অচেনা লাগল।

দ্রুত বাথরুমে ঢুকল রজার্স। মুখে ঠান্ডা পানি ছিটাতে লাগল। এমন সময় আবার বেজে উঠল ফোন। ফোনের শব্দ ওকে চমকে দিল ভীষণ। যেতে পা সরছে না। আবার নিশ্চয় বাটলার। বাতিল করে দিতে চাইছে চুক্তি।

আরও একবার বাজল ফোন। শেষে ফোন ধরল রজার্স।

সিনর রজাস?

বলছি।

মোরোনো।

ঈশ্বর, অবশেষে ফোন করলেন আপনি।

দুঃখিত, তবে এ ব্যবসায়ে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে নেই।

জানি আমি। আপনি রেডি তো? কোথায়...?

গুয়াডেলুপ গ্রামে। আমার লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

গুয়াডেলুপ কোথায়?

১১৮

আপনার হোটেল থেকে গাড়িতে আধঘণ্টার রাস্তা। যে কোনও গাইড আপনাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।

ওখানে পৌঁছাবার পরে কী করব?

চার্চ থেকে সোজা প্লাজা অভিমুখে একটা রাস্তা দেখতে পাবেন। ওই রাস্তার শেষ মাথার বাড়িটা। ওখানে কেউ থাকে না। বলে লাইন কেটে দিল মোরেননা।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রজার্স। ঘুম মদ্যপানের ঝিমানি কাটিয়ে দিয়েছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে মাথা, সবকিছু ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারছে ও। জানে কী করতে হবে। অবশ্য জুয়ার আস্তানায় টাকা খোয়ানোর পরেই সে তার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল।

আগ্নেয়াস্ত্রটি একবার পরীক্ষা করে দেখল রজার্স, তারপর ওটা সরিয়ে রেখে দরজা অভিমুখে হাঁটা দিল। একটা অস্বস্তিবোধ ওকে থামিয়ে দিল মাঝপথে।

আবার ও রওনা হলো দরজায়, তারপর ফিরে এল, ফোন তুলে কথা বলল বাটলারের সঙ্গে।

সব ঠিক হয়ে গেছে, জানাল সে বাটলারকে। যোগাযোগ হয়েছে।

গুড। আমি তোমার তরফ থেকে খবর শোনার অপেক্ষায় থাকব। টেক ইট ইজি।

আচ্ছা, গুয়াডেলুপ সম্পর্কে কী জানো?

ওটা কুড়ি মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে একটি গ্রাম। ওখানে যেতে বলেছে?

হ্যাঁ।

তো?

জায়গাটা নিরাপদ তো?

নিশ্চয়। কেন, কী হয়েছে?

কিছু না। ডেলিভারিটা তো এখানেও হতে পারত। হচ্ছে না বলে একটু অদ্ভুত লাগছে।

শহরের পরিবেশ গরম তোমাকে তো বলেইছি। মোরেনো খুব সতর্ক মানুষ। সে কোনও ঝুঁকি নেয় না। তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে?

হুঁ।

গুড। তোমার খবরের অপেক্ষায় রইলাম। কথা শেষ করল বাটলার। হোটেলের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে গাইড। রজার্স তাকে দেখে হাত নাড়ল।

শুভ সন্ধ্যা, সিনর। কোথাও যাবেন?

হ্যাঁ। গুয়াডেলুপ নামের কোনও জায়গা চেন?

অবশ্যই চিনি।

আমাকে ওখানে নিয়ে চলো।

নিশ্চয়। হেসে গাড়ির দিতে ইঙ্গিত করল গাইড। ওটা আপনার সেবায় নিয়োজিত।

মিনিট পনেরো বাদে ওরা শহরতলী ছেড়ে অন্ধকার গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করল। দুজনেই নিশ্চুপ। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করল রজার্স।

আমার কাছে তোমার পাওনা একশো পেসো, না?

জি, সিনর।

আর মদের দাম দিয়েছ কত?

বারো পেসো।

খুবই কম।

আমার জন্য এ টাকাটাই বিরাট কিছু।

কত বিরাট?

অনেক। এ ব্যবসায় হপ্তায় প্রতিদিন কেউ ট্যুরিস্ট ধরতে পারে না। বিশ্বাস করুন, এখানে জীবন ধারণ খুব কঠিন।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল রজার্স। আরও এক হাজার পেসো আয়ের সুযোগ পেলে কেমন হয়?

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গাইড। হাসল। সে অনেক টাকা, সিনর। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?

আমাকে গুয়াডেলুপে নিয়ে যাবে এবং মুখখানা বন্ধ রাখবে।

আরও কমে এল গাড়ির গতি। এখন আর হাসছে না গাইড। শুধু এ জন্য হাজার পেসো?

রজার্স জানে এসে গেছে মাহেন্দ্রক্ষণ। সে আগ্নেয়াস্ত্রটি বের করে বলল, সম্ভবত এটা ব্যবহার করতে হবে আমাকে। তবে প্রশ্ন কোরো না কেন। কী, কাজটা করবে?

পিস্তলের দিকে আড়চোখে তাকাল গাইড তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। এক হাজার পেসো পেলে আমি ভুলে যাব যে আমার জিভ, কান এবং চোখ বলে কোনও অঙ্গ আছে।

গুড, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পিস্তলটি পকেটে পুরল রজার্স। গাড়িটি অন্ধকারে ঢাকা, এবড়োখেবড়ো একটি রাস্তায় মোড় নিল। গুয়াডেলুপের প্রাজায় না পৌঁছা পর্যন্ত

আরোহীদের দুজনের কেউই কোনও কথা বলল না। একটি বেঞ্চিতে বসে আছে এক বুড়ো। আর কাউকে চোখে পড়ল না।

মরা গ্রাম, মন্তব্য করল রজার্স।

হ্যাঁ। এখানকার বাসিন্দারা একটু তাড়াতাড়িই ঘুমাতে যায়। বলল গাইড। প্লাজার বিপরীত দিকের রাস্তায় হাত তুলে দেখাল রজার্স।

ওদিকে চলল। রাস্তার মাথার শেষ বাড়িটিতে যাব। তুমি গাড়িতে বসে থাকবে।

জি, সিনর।

প্লাজা ঘুরে রজার্সের নির্দেশিত রাস্তায় ঢুকল গাড়ি। এ রাস্তাটিও বড্ড অমসৃণ এবং কাঁচা। বাড়িগুলো অন্ধকার এবং নীরব। গাইড ধীরস্থিরভাবে গাড়ি চালিয়ে রাস্তার মাথার শেষ বাড়িটির সামনে চলে এল।

এখানে? সন্দেহের স্বরে প্রশ্ন করল গাইড। তার অবশ্য কারণ ছিল। কারণ বাড়িটি ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত দেয়াল, ছাদ অদৃশ্য, দরজারও বালাই নেই। বাড়িটির দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল রজার্স। ওখানে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না মোটেই কিন্তু উপায়ও

তো নেই। সে পকেট থেকে বের করল পিস্তল। গাড়ি থেকে নামল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

নির্জন রাত তবে পরিত্যক্ত বাড়িটি বড় বেশি নীরব লাগছে। গা কেমন ছমছম করে উঠল রজার্সের। সামনে কদম বাড়াল সে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল রজার্স। মুখ হাঁ করে শ্বাস টানল। তারপর গৃহ প্রবেশ করল।

যেমনটা আশংকা করেছিল অতটা অন্ধকার নয় ঘর। আকাশ থেকে ভেসে আসা আলোয় দেখা গেল এটি প্রকান্ড একটি কক্ষ। খালি। ঘরের পেছনদিকে আরেকটি কপাট বিহীন দরজা।

ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রজার্স। অপেক্ষা করছে। অকস্মাৎ শিরশির করে উঠল শরীর। ভাবছিল ও এখানে এসে কোনও ভুল করে ফেলল কিনা। মনে হচ্ছে মোরেনোর সঙ্গে বহুদিন আগে সে ফোনে কথা বলেছে। তাদের কথোপকথন এখন একটা স্বপ্নের মতই ঠেকছে। সবকিছু কেমন অবাস্তব লাগছে।

আমি একটা স্বপ্ন দেখছি এবং আমি ঘুম থেকে জেগে উঠব, মনে মনে। বলল রজার্স। হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাইড, হাতে পিস্তল।

তুমি এখানে কী করছ? গর্জন ছাড়ল রজার্স। হাসল গাইড।

আপনার পকেট থেকে অস্ত্রটি বের করে মেঝের ওপর ফেলে দিন, সিনর, এবং পিছু হঠুন। বলল সে। হুকুম পালিত হলে সে আগে বাড়ল।

মেঝে থেকে রজার্সের পিস্তল তুলে নিয়ে কোমরের বেল্টের ফাঁকে জল।

এসবের মানে কী? জানতে চাইল রজার্স।

মানে আপনি বুঝতে পারছেন না, সিনর?

মাই গড, তুমি মোরেনো!

মাথা নাড়ল গাইড। না, তবে আমি মোরেনোর লোক। আমার সঙ্গেই আপনার এখানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেল রজার্স, ইচ্ছা করল জোরে চিৎকার করে কাঁদে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরুল না। আবার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যেই সে যেন সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গলা টিপে ধরতে।

আর সে মুহূর্তে মোরেনোর চ্যালা টিপে দিল পিস্তলের ট্রিগার।

ড্রাগন – বেনজামিন উইলিয়াম বোভা

ড্রাগনটিকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে ভিন্স। সে ভয় পাচ্ছে এটা তার আত্মা কেড়ে নেবে ভেবে। ভিন্স একেবারেই সাধারণ ধরনের এক তরুণ ফ্যামিলি ম্যান। সে ফ্যামিলির সঙ্গে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করবে বলে সাউথ ফিলাডেলফিয়া হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করেনি। সে গাড়ি পছন্দ করে, স্থানীয় দোকান থেকে চুরি করে সুট, এমনকী বড় ট্রেলার রিগ চালানো শিখতে বিপজ্জনক সময় কাটায় যাতে হাইজ্যাকিংয়ে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু ওরা বড়সড় কাজে ওকে সম্পৃক্ত করতে চায় না।

তুমি আমার জন্য নাম্বারের হিসাব রাখো, খোকা, বলে লুই ব্যানানাস, সাউথ ফিলির এক হাত কাটা পলিসি কিং।

আমি বড় কিছু করতে চাই, অধৈর্য নিয়ে বলে ভিন্স। আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চাই।

লুই তার বলেটের মতো ন্যাড়া মাথাটি নাড়ে। তোমাকে দেখে মনে হয় না অতটা সাহস তোমার আছে, কিড।

সুযোগ দিয়েই দেখো না! লোন শার্কগুলোর ভার আমাকে দাও।

কাজেই লুই ভিন্সকে একদিনের জন্য দায়িত্ব দিল লোন শার্কদের এনফোর্সার বিগ বলস ফ্যালকোনিকে অনুসরণ করার জন্য। এক লোক তার পেমেন্ট দিতে দশ দিন দেরি করেছে বলে বিগ বস যখন লোকটির আঙুল এক এক করে ভেঙে দিচ্ছিল, সেই দৃশ্য দেখে ভিন্স বলল ললন শার্কিং তার কাজ নয়।

সশস্ত্র ডাকাতি? ভিন্স কোনোদিন বন্দুকই হাতে নেয়নি, গুলি করা দূরে থাক। তাছাড়া সশস্ত্র ডাকাতি করে দলের পুরোভাগে থাকে মস্তান, বুদ্ধু, নির্বোধ এবং বেপরোয়া লোকগুলো। সশস্ত্র ডাকাতির সঙ্গে অর্গানাইজড ক্রাইম ঠিক খাপ খায় না। প্রয়োজনও নেই। আর এতে হতাহত হবার সম্ভাবনাও থাকে।

কয়েক মাস লুই ব্যানানাস এর প্রিয় রেস্টুরেন্টে গিয়ে তাকে মিষ্টি কথায় পটিয়ে এবং কাকুতি মিনতি করার পরে ভিন্স যা চাইছিল সেরকম একটি কাজ পেয়ে গেল।

ওকে, কিড, ওকে, এক সন্ধ্যায় লুই সাদা সস দিয়ে লিঙ্গুইন খাচ্ছিল, ভিন্সকে রেস্টুরেন্টের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, তোমার জন্য একটি কাজ ঠিক করেছি আমি। এদিকে এসো।

নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না ভিন্সের।

কী কাজ? কী? আমি যেকোনো কাজ করতে রাজি!

ন্যাপকিনের আড়ালে মৃদু ঢেকুর তুলে চেয়ারে হেলান দিল লুই। ভিন্সের কোঁকড়ানো চুলের মাথাটি খামচে ধরে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল।

রসুনে অ্যালার্জি আছে ভিন্সের, প্রাণপণে হাঁচি ঠেকিয়ে লুইয়ের ফিসফিসানি শুনল। ফ্রন্ট অ্যান্ড ওয়াশিংটনের ধারে পুরানো Band O ওয়্যারহাউসটা চেনো তো?

জি, চিনি। কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল ভিন্স, কারণ লুই তখনও বজ্রমুষ্টিতে তার চুল চেপে ধরে আছে।

ওটা জ্বালিয়ে দাও।

পুড়িয়ে ফেলব? কিচকিচ করে উঠল ভিন্স।

আহ, আস্তে।

পুড়িয়ে ফেলব? গলা নামাল ভিন্স।

হ্যাঁ।

কিন্তু ওটা তো আরসন। অগ্নিসংযোগের দুষ্কর্ম।

হেসে উঠল লুই। আজ কাল এটা কেঁপে ওঠা ইন্ড্রাস্ট্রি। যে ছেলেরা আগুন নিয়ে খেলতে ভয় পায় না তাদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ।

হ্যাঁচ্চো করে হাঁচি দিল ভিন্স।

.

ভিন্স জানে ভাঙাচোরা, পুরানো গুদামঘরটা পুড়িয়ে ফেরতে খুব বেশি কৌশলের প্রয়োজন নেই। আগুন ধরিয়ে দিলেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু ধরা না পড়ে কীভাবে আগুন ধরানো যায় সেটাই হলো প্রশ্ন।

ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ এবং সবচেয়ে খারাপ ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোরও বিশেষ আরসন স্কোয়াড কোম্পানিগুলোরও বিশেষ আরসন স্কোয়াড রয়েছে যারা পোড়া ওয়্যারহাউসের ধোয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গন্ধ শুঁকতে শুরু করবে।

কীভাবে আগুন লাগাতে হয় কিছুই জানে না ভিন্স। তবে এমন একটা সুযোগ যখন মিলেছে, শিখে নেবে সে সবকিছু।

সে জনি দ্য টর্চের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল, এ হলো স্থানীয় মস্তান সর্দার। কিন্তু জনি এত ব্যস্ত যে তার সঙ্গে দেখা করা খুব মুশকিল। তাছাড়া জনি প্রতিপক্ষ একটি ফ্যামিলির জন্য কাজ করে। ভিন্স আরও যে দুজন লোককে চেনে, যাদের ফিল্ডে নামডাক আছে, তারা গত দুই রাতে রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ।

ভিন্স মনে করে না যে লাইব্রেরিতে এ বিষয়ে কোনো বই আছে যা ওকে সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া পড়ার অভ্যাসও তার তেমন নেই।

কাজেই গোটা কাজ নিয়ে ভীত ভিন্স ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পরদিন রাতে চুরি করা একটি স্টেশন ওয়াগন নিয়ে, তাতে গ্যাসোলিনের জেরিক্যান এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পেইন্ট থিনারের বড় বড় ড্রাম ভরে ফ্রন্ট স্ট্রিটে হাজির হলো।

পুরানো ওয়্যারহাউজের প্রবেশপথে আলগা ঝুলতে থাকা বোর্ড পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ভিন্স। অন্ধকারে গা ছমছম করছে। ওয়্যারহাউজ খালি এবং ধুলো ময়লায় ভর্তি, তবে ইনসিওরেন্স কোম্পানি জানে লুই-র ফুট অ্যান্ড

ভেজিটেবল ফার্ম মাত্র হপ্তাখানেক আগে গুদামঘরে ঠেসে রেখেছে মাল।

ভিন্স টের পেল তার হাত কাঁপছে। আমি ঠিকমত কাজ দেখাতে না পারলে লুই আমার পেছনে বিগ বলস ফ্যালকোনিকে লেলিয়ে দেবে।

এমন সময় সে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল।

জমে গেল ভিন্স। অন্ধকারে নিজেকে অদৃশ্য করে দিতে ইচ্ছে করল।

কেউ শ্বাস নিচ্ছে। এবং সেটা ভিন্স নয়।

খাইছে আমারে। ওরা তো আমাকে বলেনি এখানে নাইট গার্ড আছে।

আমি নাইট গার্ড নই।

ভিন্স ভয়ানক চমকে উঠল।

আমি পুলিশও নই। কাজেই ভয় পেয়ো না।

কে... ভিন্সের গলা খ্যাড়খেড়ে শোনাল। ঢোক গিলে এবারে একটু গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, কে তুমি?

আমি ঘুমাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এ জায়গাটা স্টোনহেঞ্জে পরিণত হয়েছে। সারাক্ষণ লোকজন আসছে আর যাচ্ছে।

ভিখারি, ভাবছে ভিন্স। কোনো ভিখারি গুদামঘরটিকে তার আশ্রয়স্থল বানিয়েছে।

এবং আমি কোনো ভিখারি নই, শক্ত গলায় বলল কণ্ঠটি।

আমি তোমাকে তা বলিওনি, জবাব দিল ভিন্স। তারপর সে কেঁপে উঠল, কারণ ও তো এসব কথা মুখ ফুটে বলেইনি। মনে মনে চিন্তা করেছে। কেবল।

খালি ওয়্যারহাউজের বিপুল অন্ধকারের মাঝে একটা আলো জ্বলজ্বল করে উঠল। ভিন্স একঠায় তাকিয়ে রইল ওদিকে, তারপর বুঝতে পারল ওটা একটা চক্ষু। জ্বলজ্বলে একটা চোখ, কুটিল নয়ন, খাড়া মণি, বেড়ালের মতো। তবে চক্ষুটা বিরাট একটা বলের সমান!

ক্ক-ক্কী...

ওটার পাশে খুলে গেল আরেকটা চোখ। ধিকিধিকি জ্বলা দুটি চোখের আলোয় ভিন্স আবছা ঠাহর করল আঁশযুক্ত একটা মাথাও আছে ওগুলোর সঙ্গে, আর প্রকাণ্ড মুখ জুড়ে দাঁত আর দাঁত।

সে তা-ই করল যা অন্য যে কেউই করত। অজ্ঞান হয়ে গেল ভিন্স।

চোখ খোলার পরে আবারও জ্ঞান হারাতে চাইল সে। পুরানো গুদামঘরের ভাঙা কাঁচের জানালা গলে ঢোকা ভুতুড়ে চাঁদের আলোয় ভিন্স দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ড্রাগন।

লম্বা, সর্পিল একটা শরীর, চকচকে সবুজ এবং নীলচে আঁশ দিয়ে মোড়া, চারটে প্রকাণ্ড পায়ে করাতিদের করাতের মতো বিরাট বিরাট থাবা। লেজটি কুণ্ডলী পাকানো, এতই বড় যে ডগা গিয়ে ঠেকেছে ওয়্যারহাউসের আরেক মাথায়।

ভিন্সের ঠিক মাথার ওপর মুখ ভর্তি দাঁত আর বিড়ালের মতো জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে ঝুঁকে আছে প্রাণীটা। হাসছে।

তুমি খুব কিউট, বলল ড্রাগন।

কী?

গত কয়েক রাতে লুই এখানে অন্য যেসব লোকজন পাঠিয়েছে তুমি মোটেই তাদের মতো দেখতে নও। ওরা ছিল বুড়ো, মোটা আর হোঁতকা।

অন্য লোকজন?

সাদা দাঁতের সারির ভেতর দিয়ে ড্রাগনের চেরা জিভ লকলক করে উঠল। তোমার কি ধারণা আরসনিস্ট হিসেবে লুই তোমাকেই এখানে প্রথম পাঠিয়েছে? ওরা গত বেশ কয়েক রাত ধরে এখানে ঝাড় বেঁধে আসছিল।

এখনও চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ভিন্স, জিজ্ঞেস করল, ও... ওদের কী হয়েছে?

ড্রাগন পেটের ওপর ভর করে উবু হয়ে বসল। তারপর ভিন্সের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওদেরকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। ওরা আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। চেরা জিভটা আবার বেরিয়ে এসে ঘষা খেল ভিন্সের মুখে। হ্যাঁ, তুমি খুব কিউট।

ধীরে ধীরে ফিরে আসছে ভিন্সের হারানো সাহস। সে ড্রাগনের সঙ্গে কথা বলছে বটে, তবে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এটা সত্যি ঘটছে। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

আমি তোমার মনের কথা পড়তে পারি, বলল ড্রাগন। কাজেই পালাবার চিন্তার কথা ভুলে যাও।

আ.. ইয়ে, এ জায়গাটাতে আমার আগুন লাগাবার কথা ছিল, স্বীকার গেল ভিন্স।

জানি আমি, বলল ড্রাগন। কথা শুনে শুনে হচ্ছে এটি মেয়ে ড্রাগন।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ, বলল সে। আমি মেয়ে ড্রাগন। সত্যি বলতে কী এ পর্যন্ত তোমরা মানুষরা যত ড্রাগনের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়েছ সবগুলোই ছিল মেয়ে ড্রাগন।

সেন্ট জর্জের মতো? অস্ফুটে বলল ভিন্স।

ওটা একটা মরদ নাকি! ওই লোকটা এবং তার বর্ম দুটোই মেয়েলি। শিশা খালা ইচ্ছে করলেই ও যে প্রেশার কুকার গায়ে দিয়েছিল তার মধ্যে ওকে ঝলসে ফেলতে পারত। কিন্তু লোকটাকে দেখে তার এমন হাসি পেয়ে যায় যে, হাসতে হাসতে তার আগুনই যায় নিভে!

কিন্তু সেন্ট জর্জ তো ওকে হত্যা করেছিলেন।

হত্যা করতে পারেনি! রেগে গেল ড্রাগন, বাম নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী বেরুল। শিশা খালা নিজেকে অদৃশ্য করে পালিয়ে যায়। হাসতে হাসতে তার হেঁচকি উঠে গিয়েছিল।

কিন্তু কিংবদন্তি বলে,

রাখো তোমার কিংবদন্তি। ড্রাগন হত্যা করা এতই সোজা! ড্রাগন মারতে পারে এমন মানুষের এখনও জন্ম হয়নি।

আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি কিছু করিনি।

না, তুমি কিছু করনি, ড্রাগনের কণ্ঠ নরম শোনাল। তুমি খুব কিউট, ভিন্স।

ভিন্সের মগজে তখন উথাল পাথাল। হয় সে পাগল হয়ে গেছে নতুবা সত্যিই সত্যিকারের একটি আগুন ছোঁড়া ড্রাগনের সঙ্গে কথা বলছে।

আহ্... তোমার নাম কী?

শশ্রয্যহ, বলল সে। আমি ড্রাগন পরিবারের পোলিশ শাখার মেয়ে।

শশ্র...যয... উচ্চারণ করার চেষ্টা করল ভিন্স।

তুমি আমাকে সিজল বলে ডাকতে পারো, অহঙ্কারী গলায় বলল ড্রাগন।

সিজল। বাহ, খুব সুন্দর নাম তো।

জানতাম তুমি নামটি পছন্দ করবে।

আমি যদি ঘোরের মধ্যে থাকি ওরা এসে আমাকে এখন হোক বা পরে হোক জাগিয়ে তুলবে, ভাবল ভিন্স। ঠিক করল যতক্ষণ পারে ড্রাগনের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবে।

তুমি বলছ আমাদের লোকেরা এ পর্যন্ত যত ড্রাগনের সঙ্গে মারামারি করেছে তারা সবাই মাগী.. মানে মহিলা ছিল?

ঠিক তাই, ভিন্স। কাজেই দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কিশোরী কুমারীদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলার যে গল্প ফেঁদেছে মানুষেরা তা কেমন মিথ্যা।

আ-হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

আরও বড় মিথ্যা হলো ড্রাগন বধ করার বিষয়টি। ডাহা মিথ্যা।

সত্যি?

তুমি কি জাদুঘরে স্টাফ করা কোনো ড্রাগন দেখেছ? কিংবা ড্রাগনের হাড়? অথবা দেয়ালে ঝোলানো ড্রাগনের মাথা?

আ.. জাদুঘরে আমার তেমন যাওয়া হয় না।

সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে কিছু বিশেষ গুহার চমকপ্রদ কিছু প্রদর্শনী দেখাতে পারি। যদি তুমি দেখতে চাও হাড়গোড়, মাথা এবং...

না, না, ধন্যবাদ। আমি এসব দেখতে চাই না, দ্রুত বলল ভিন্স।

না দেখাই ভালো।

পুরুষ ড্রাগনরা সব কোথায়? ওরা নিশ্চয়ই আকারে অনেক বড়।

সিজল নাক দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, ধোঁয়ার দুটো রিং ভিন্সের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল।

আমাদের প্রজাতির পুরুষরা ক্ষুদ্রাকৃতির। তোমার চেয়ে আকারে বড় হবে কিনা সন্দেহ। ওরা সবাই ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে বাস করে। ওখানে প্রতি একশো বছর পরে আমাদের উড়ে যেতে হয় মিলনের জন্য নইলে আমাদের প্রজাতিটি তো থাকবে না।

প্রতি একশো বছর অন্তর! এক শতকে মাত্র একবার তোমরা বিছানায় যাও?

সেক্স আমাদের জন্য কৌতুকের বিষয় নয়। তোমাদের জন্যও নয়। তাছাড়া তোমরা এসেছ বানরের বংশ থেকে। বিরক্তিকর মানব প্রজাতি। সারাক্ষণ বকবক আর বকবক এবং একটা না একটা ঝামেলা পাকাচ্ছেই।

আ, ইয়ে...সিজল। বলছিলাম কী তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ লাগল। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। আমাকে এখন উঠতে হবে। তা ছাড়া...

তুমি এখানে কেন এসেছ সে কথা ভুলে গেলে?

সত্যি বলতে কী ভুলেই গিয়েছিল ভিন্স। এখন মনে পড়ল। এই ওয়্যারহাউসে আমার আগুন লাগাবার কথা।

ঠিক। এবং তোমার ছোট্ট, সুন্দর মাথাটির ভেতরে যে চিন্তাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তা হলো, তুমি যদি আজ রাতে এখানে আগুন লাগাতে না পার তাহলে লুই তোমার ওপরে ভয়ানক খেপে যাবে।

হুঁ। ওটাই আমার সমস্যা। মানে বলছিলাম তুমি তো এখানে থাকতে চাও এবং ঘুমাতে চাও, তাই না? অন্যদের মতো আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। ধরো, তুমি যখন ভারত মহাসাগরে গেলে কিংবা অন্য কোনো কাজে বেরিয়ে পড়লে তখন আমি আসতে পারি...।

বোকার মতো কথা বোলো না, ভিন্স, বলল সিজল, গদাই লস্করি চালে চার থাবায় ভর দিয়ে উঁচু করল শরীর।

আমি যেকোনো জায়গাতেই ঘুমাতে পরি। আর ঈশ্বরের কৃপায় আগামী বেশ কয়েক দশকের মধ্যে আমার মিলনের কোনো অবকাশ নেই। আর ওই লোকগুলোর কথা বলছ... ওরা আমাকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু তুমি খুব কিউট। খুব ভালো।

ধীরে ধীরে খাড়া হলো ভিন্স, দেখে অবাকই হলো তার কম্পমান হাঁটুজোড়া তাকে সিধে করে রেখেছে। সিজল লম্বা, চকচকে শরীর দিয়ে ভিন্সকে কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে ধরে হাসল। তার দাঁতগুলো যেন কসাইয়ের ধারাল ছুরি।

সিজল বলল, এই পুরানো জায়গাটায় থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত। এটাকে দুজনে মিলে পুড়িয়ে ফেললে কেমন হয়?

কী?

তোমার চেয়ে আমি অনেক ভালভাবে এ জায়গাটা পুড়িয়ে দিতে পারব, ভিন্স কিউটি, বলল সিজল। এবং আমি পেছনে গ্যাসোলিনের কোনো চিহ্ন রেখেও যাব না।

কিন্তু...

তুমি একদম ক্লিয়ার থাকবে। আর কোনো পুলিশকে আমার ধারে কাছে আসতে দেখলেই আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারব।

অদৃশ্য?

নিশ্চয়ই। দেখবে? এবং অদৃশ্য হয়ে গেল সিজল।

অ্যাই, কোথায় গেলে?

এই তো আমি, ভিন্স। প্রকাণ্ড চকচকে শরীর নিয়ে পুনরাবির্ভাব ঘটল সিজলের।

ভিন্স হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, তার কালো কোঁকড়ানো চুলের মাথার নিচে চিন্তাভাবনাগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল সিজল। তুমি কী বলো, কিউটি? একসঙ্গে দুজনে মিলে দুষ্কর্ম করি? তুমি আর আমি মিলে দারুণ কিছু করতে পারব, ভিন্স। আমি তোমাকে শীঘ্রি ফ্যামিলির শীর্ষে তুলে দিতে পারব।

ভিঙ্গের ধীরগতিতে উত্তেজিত হতে থাকা মনে ভয়ঙ্কর একটা চিন্তা খেলে গেল। এক মিনিট। আমি এরকম ঘটনা টিভিতে দেখেছি। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, বদলে আমার আত্মা তোমাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তাই না?

তোমার আত্মা? তোমার আত্মা দিয়ে আমি কী করব?

তুমি শয়তানের পক্ষে কাজ করছ এবং তুমি আমার তিনটে ইচ্ছে পূরণ করবে, তবে বিনিময়ে মৃত্যুর পরে আমার আত্মা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে।

গুরুভার মাথাটি নাড়ল সিজল, তাকে খানিকটা অপমানিত মনে হলো। ভিন্স– স্বীকার করছি হাজার বছর ধরে ড্রাগন এবং মানুষদের মধ্যে তেমন সুসম্পর্ক নেই, তবে আমরা শয়তানের পক্ষে কাজ করি না। এমনকী আমি নিশ্চিতও নই শয়তান বলে কিছু আছে কি-না। আমি কোনোদিন শয়তান দেখিনি। তুমি দেখেছ?

না, তবে—

আর তোমার আত্মারও আমার দরকার নেই, বোকা ছেলে।

আমাকে কোনো কিছুতে তা হলে সই টই করতে হবে না?

অবশ্যই না।

এবং তুমি এই আবর্জনা পোড়ানোর কাজটা এমনি এমনি করে দেবে?

তার চেয়েও বেশি কিছু করব, ভিন্স। ফ্যামিলির শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছতে আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমরা ক্রাইম পার্টনার হব! হিসপিস খালার শিকাগো ফায়ারের ঘটনার পরে এটিই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা।

অ্যাই, আমি শুধু এই গুদামঘরটিতেই আগুন লাগাতে চাই।

তা তো বটেই।

কোনো শিকাগো ফায়ার বা এরকম অন্য আর কিছু নয়।

কথা দিচ্ছি।

মনস্থির করতে বেশ সময় লাগল ভিন্সের। তারপর বলল, ঠিক আছে। চলো কাজটা করি।

সিজল মাথাটা এক দিকে কাত করল। তার আগে গুদামঘর থেকে তোমার বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি, ভিন্স?

হাহ্? ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তুমি বরং গাড়ি নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও, কিংবা আরও ভালো হয় সেই রেস্টুরেন্টে চলে যাও যেখানে তোমার বন্ধুরা আছে।

মানে? আগে তো এ জায়গাটায় আগুন লাগাতে হবে।

ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, ভিন্স সোনা। গুদামঘরে যখন আগুন লাগবে তখন লোকজন যদি পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেয় ওইসময় তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে, তাহলে ব্যাপারটা ভালো হয় না, বলো?

হ্যাঁ, ভালো হয়... একটু সন্দেহ নিয়েই বলল ভিন্স।

ঠিক আছে, বলল সিজল। তুমি তোমার ছোট্ট কিউট শরীরটা নিয়ে রেস্টুরেন্টে চলে যাও, যখন বুঝব তুমি ওখানে নিরাপদে পৌঁছেছ তখন আমি এ জায়গাটা চিতার মতো পুড়িয়ে দেব।

তুমি কীভাবে বুঝবে...?

যে তুমি রেস্টুরেন্টে পৌঁছেছ কিনা? আমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা আছে, ভিন্স।

কিন্তু আমি কীভাবে জানব...

যে এই ফালতু জিনিসটায় আগুন লাগল কিনা? চিন্তা কোরো না, তুমি আকাশের বুকে অগ্নিশিখা দেখতে পাবে। উত্তেজিত শোনাল সিজলের কণ্ঠ।

আপত্তি করার মতো আর কিছু না পেয়ে ধীরে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওয়্যারহাউজের দরজায় পা বাড়াল ভিন্স। পথে সিজলের লম্বা লেজটা টপকাতে হলো।

দোরগোড়ায় পৌঁছে ঘুরল ভিন্স। বিলাপের গলায় বলল, তুমি সত্যি বলছ আমার আত্মার পেছনে তুমি লাগবে না?

হাসল সিজল ওর দিকে তাকিয়ে। তোমার আত্মার পেছনে আমি লাগব না, ভিন্স। এ বিষয়ে আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।

.

ওয়্যারহাউসে আগুন লাগার মতো দৃশ্য লোকে বহুদিন দেখেনি। এ কেসটি পুলিশকে একদম বোকা বানিয়ে দিল। ভিন্সকে তারা যথেষ্টই জেরা করল, কারণ সে চুরি করা স্টেশন ওয়াগনের পেছনে রাখা গ্যাসোলিনের ক্যান এবং পেইন্ট থিনার সরিয়ে ফেলতে পারেনি। কিন্তু ওর ওপর কোনো দোষ চাপাতে পারল না, এমনকী গাড়ি চুরির অভিযোগও নয়, লুই বিগ বলস ফ্যালকোনিকে বলে দিয়েছিল সে যেন ওয়াগনের বেজার মালিককে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে।

ফ্যামিলিতে ভিন্সের অবস্থান বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। বেশ চোখে পড়ার গতিতেই।

ভিন্সের বিশেষত্ব হয়ে উঠল অগ্নিসংযোগ। লুই তাকে কঠিন কঠিন সব অ্যাসাইনমেন্ট দিতে লাগল এবং কাজ দেয়ার পরের রাতেই দেখা যায় ভিন্স হাওয়া, তবে কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

সিজলের সঙ্গে তার নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, মাঝে মধ্যে পরিত্যক্ত দালানে, কখনও খালি কোনো লটে। ড্রাগন তখন অবশ্যই অদৃশ্য হয়ে থাকে। খালি লটের ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুএকজন পথচারী দেখতে পায় সাজগোজ করা এক তরুণ বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে। তারা তরুণকে পাগল ভেবে আর দ্বিতীয়বার ওদিকে ফিরে তাকায় না।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা শুনতে পায় তরুণটি বাতাসকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি সত্যি আমার আত্মার ব্যাপারে আগ্রহী নও?

তবে সিজলের জবাব শুধু ভিন্সই শোনে। না, ভিন্স। আমার আত্মা দিয়ে কোনো কাজ নেই। না তোমার, অন্যের।

মাস যায়। ফ্যামিলিতে ভিন্সের দ্রুত উত্থানে স্বাভাবিকভাবেই অন্য তরুণদের চোখ টাটায় যারা ওর বিরোধী এবং প্রতিষ্ঠানে সামনের দিকে থাকতে চায়। বিরোধিতা মাঝে মাঝে শত্রুতা, হুমকি, এমনকী ভায়োলেন্সও সৃষ্টি করে।

তবে অদ্ভুত ব্যাপার, ভিন্সের সঙ্গে যেই লাগতে গেছে পরে তার আর কোনো হদিস মেলেনি। কোনো চিহ্নই থাকে না তাদের, শুধু একবার ফ্যাটস লোমবার্ডির এক পাটি পোড়া কালো জুতো পাওয়া গেল টুয়েলফথ। এবং থার্টিনথের মাঝখানে টাসকার স্ট্রিটে।

ফ্যামিলির অন্যান্য সিনিয়র সদস্য এবং লুই সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়। ভন্স কেবল উচ্চাভিলাষী এবং প্রতিভাবান নয়, সে বেশ চৌকসও। নিজের দোরগোড়ায় কোনো লাশ পড়ে থাকতে দেয় না সে।

অগ্নিসংযোগ থেকে ভিন্স তার হাত বাড়িয়ে দিল লোন শার্কিঙের দিকে। এটি এখনও ফ্যামিলির অপারেশনের কলিজা। তবে কাস্টমারদের ঠিক সময়ে টাকা শোধ করার জন্য বিগ বলস ফ্যালকোনির মতো তাকে হুমকি দিতে হয় না। যেসব কাস্টমার টাকা দেয়

না, তাদের গাড়িগুলো দেখা যায় পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। ওদের চোখের সামনে একদিন ফুটপাতে দাঁড়ানো। একটি গাড়িতে আগুন ধরে গেল।

খুব দুঃখজনক ব্যাপার, মাথা নাড়তে নাড়তে বলে ভিন্স। পরের বারে না তোমার বাড়িটাই আগুনে পুড়ে যায়। সে রহস্যময় ইঙ্গিত দেয় এবং অদৃশ্য কাউকে লক্ষ্য করে চোখ টেপে। অন্তত উপস্থিত লোকজন কাউকে দেখতে পায় না।

বিগ বলস ফ্যালকোনি যেদিন দেখতে পেল তার ব্যবসা পড়ে যাচ্ছে, সে ভিন্সের পিছে লাগল। তার পরপরই বিগ বস আক্ষরিক অর্থেই ধোঁয়ার মেঘে পরিণত হলো।

বছর গড়ায়। ভিন্স ইতিমধ্যে দারুণ সমৃদ্ধি অর্জন করে ফেলেছে। সে আর এখন সেই আগের রোগা ভোগা ভীত কিশোরটি নেই যখন সিজলের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। সে এখন দামী পোশাক পরে, ব্যাংকার এবং ব্রোকারদের সঙ্গে স্টেক ও লবস্টার দিয়ে লাঞ্চ করে।

পুরানো বাসা ছেড়ে ভিন্স বর্তমানে জাসিট চেরি হিলের কাছে প্রাসাদোপম র‍্যাঞ্চ স্টাইলের একটি বাড়িতে উঠে এলেও এখনও প্রতি রোববারে সকালে ম্যাস এ যোগ দিতে এপিক্যানি চার্চে যায়। সে চার্চের লিটল লীগ বেসবল টিমের স্পন্সর এবং চার্চের বার্ষিক লটারিতে সে প্রতি বছর একটি টয়োটা গাড়ি দান করে।

এসব চ্যারিটির বিষয়ে সহকর্মীদের কাছে ভিন্স ব্যাখ্যা দেয় এগুলো হলো এক ধরনের ইনসিওরেন্স। সে এসময় ওপর দিকে মাথা তুলে তাকায়। তার সঙ্গীরা ভাবে সে স্বর্গের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু ভিন্স তখন সিজলকে খুঁজছে যে কিনা খুব একটা দূরে থাকে না।

সত্যি, ভিন্স। মুখ টিপে হাসে ড্রাগন। আমাকে তুমি এখনও বিশ্বাস করতে পারলে না। এতগুলো বছর বাদে তোমার আত্মার আমার প্রয়োজন। নেই। সত্যি বলছি চাই না।

ভিন্স তারপরেও চার্চে যায় এবং চ্যারিটিতে টাকা ঢালে।

অবশেষে লুই, বুড়ো এবং ভঙ্গুর, ভিন্সকে ফ্যামিলির উত্তরাধিকার বানিয়ে একদিন ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মারা গেল। মৃত্যুকালে তার পাশে তার কোনো আত্মীয় স্বজন কিংবা ফ্যামিলির কেউ ছিল না। ফ্যামিলির ইতিহাসে এ সত্যি বিরল ঘটনা।

ভিন্স এখন ফ্যামিলির কাপু বা কর্তা। তার বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি। সুঠাম দেহ, চুলে পাক ধরেনি, একটু মুটিয়ে গেছে। তার এখন ব্যক্তিগত দর্জি রয়েছে, আছে নিজস্ব নাপিত এবং অপূর্ব সুন্দরী নারীদের সান্নিধ্য সে উপভোগ করছে যা তার কল্পনাতেও ছিল না।

কাপ্ত হিসেবে তার এ আরোহণে লুইর অন্যান্য সাগরেদরা চ্যালেঞ্জ করে বসল। কিন্তু তাদের কয়েকজন কোনো চিহ্ন না রেখে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ায় অন্যরা দ্রুতই ভিন্সের সঙ্গে স্থাপন করল শান্তি।

ভিন্স বিয়ে করেনি। তবে সে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছে জীবন।

তুমি বড্ড বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছ, ভিন্স, এক রাতে ওকে সতর্ক করে দিল সিজল। দুজনে মিলে অন্ধকার এবং জনশূন্য ওয়াটারফ্রন্টের সামনে হাঁটতে বেরিয়েছে। এখানেই ওদের প্রথম দেখা হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক ফ্যাটাকের ভয় নেই তোমার?

নাহ, বলল ভিন্স। আমার হার্ট অ্যাটাক হবে না। বরং আমিই ওদের হার্ট অ্যাটাক করে ফেলি। নিজের ঠাট্টায় নিজেই আনন্দ পেয়ে হো হো করে হাসল সে।

তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, ভিন্স। আগের মতো আর কিউট নেই।

আমার কিউট থাকার দরকার নেই, সিজল। আমার হাতে এখন ক্ষমতা আছে। আমি যেমন খুশি যা খুশি এখন করতে পারি। কে আমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

সিজল বিরক্ত হলো। তবে ভিন্স তার দিকে নজর দিল না। আমি যা চাই তাই করতে পারি! আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে চিৎকার করল ভিন্স। আমার আছে ক্ষমতা আর ওই লুথাগুলো আমার ভয়ে মূর্ছা যায়! সে হো হো করে হাসতেই লাগল।

কিন্তু, ভিন্স, বলল সিজল। এই ক্ষমতা পেতে আমিই তোমাকে সাহায্য করেছি।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবে পাওয়ার যখন পেয়ে গেছি তোমার সাহায্যের আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আমি যা চাই ফ্যামিলির যে কাউকে দিয়ে তা করাতে পারি।

ড্রাগনরা কাঁদে না তবে সিজলের চেহারা এমন হয়ে উঠল যে কেউ দেখলেই তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেত।

শোনো, অহঙ্কারী গলায় বলে চলল ভিন্স, আমি জানি তুমি আমাকে অনেক অনেক সাহায্য করেছ এবং সে কথা আমি কোনদিন ভুলব না। তুমি এখন আমার প্রতিষ্ঠানের পার্টনার থাকবে, সিজল, ওল্ড গার্ল। তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।

মাস গড়িয়ে বছর যেতে লাগল, ভিন্স এখন খুব কমই সিজলের সঙ্গে দেখা করে। তার দরকারই হয় না। আর ভেতরে ভেতরে সে খুশি সিজলের সঙ্গে তার আগের মতো ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করতে হচ্ছে না বলে।

ওকে আর আমার দরকার নেই। আর আমি তো ওকে আমার আত্মা কিংবা অন্য কিছু বিক্রি করে দিইনি। আমি স্বাধীন এবং গ্লানিমুক্ত।

ড্রাগনরা টেলিপ্যাথিক, পাঠক জানেন।

ভিন্স জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করল যখন নাক গলাল অপূর্ব সুন্দরী, লালচুলের এক তরুণীর প্রতি যাকে সে পছন্দ করে। সেই মেয়েটি এক হ্যাংলাপাতলা তরুণ পাংকের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছিল। সমস্যাটি ভিন্সের কাছে বিশাল মনে হলো। সে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চিন্তা করল।

সে তরুণ পাংককে সেই রেস্টুরেন্টে ডেকে নিল যেখানে লুই ভিন্সকে জীবনের প্রথম বড় কাজের সুযোগ দিয়েছিল।

পাংক দারুণ ভয় পেয়েছে। সে শুনেছে লালচুলো মেয়েটিকে ভিন্স, বিশেষ নজরে দেখে।

শোনো, খোকা, কর্কশ গলায় বলল ভিন্স। ছোকরার সরু কাঁধের ওপর মোটা একটা হাত রাখল। তুমি টুয়েন্টি এইটথ এবং আর্কের মাঝখানের পুরানো বস্ত্র কারখানাটা চেনো?

জি-জি, স্যার,ফিসফিসিয়ে বলল পাংক। ভিন্স প্রায় শুনতেই পেল না।

ওটাতে আগুন লাগলে খুব সহজে পুড়ে যাবে, তাই না?

চোখ পিটপিট করল পাংক, ঢোক গিলল, তারপর মাথা ঝাঁকাল। জি। পুড়ে যাবে তবে...

তবে কী?

কাঁপতে কাঁপতে ছোকরা বলল, শুনেছি দুই তিনজন নাকি ওখানে আগুন লাগাতে দিয়েছিল। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি।

কারখানাটা তো আছে এখনও? হুঙ্কার ছাড়ল ভিন্স।

জি-জি।

কাল সকালের মধ্যে হয় ওই কারখানার কোনো চিহ্ন থাকবে না অথবা তোমার কোনো চিহ্ন থাকবে না।

ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে। মুচকি হাসল ভিন্স। যেভাবেই হোক সে একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে।

.

পুরানো কারখানাটি পুরো দেড়দিন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলল। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকেরা দেড়দিন বাদে আগুন নেভাতে পারল। ভিন্স হাসতে হাসতে ফোন করল তার ইনসিওরেন্স ব্রোকারকে।

তবে সেই রাতে সে তার চেরি হিলের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে নিজের লিমুজিন থেকে নেমেছে, দেখল চকচকে আঁশের বিরাট একটা কুণ্ডলী তার বাড়ির অর্ধেকটা জড়িয়ে রেখেছে।

মুখ তুলে চাইতেই ভিন্স দেখল সিজল হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

হাই, ভিন্স। লং টাইম নো সি।

ওহ্, হাই, সিজল, ওল্ড গার্ল। কী খবর? বাম হাতের অধৈর্য ইঙ্গিতে সে তার ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল। লোকটা লিমুজিন ঘুরিয়ে চলল শহরের গ্যারেজ অভিমুখে। বসকে বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত।

তুমি দিন দুই আগে চমৎকার একটি কিউট ছেলেকে পাঠিয়েছিলে কারখানা জ্বালিয়ে দিতে, আদুরে গলায় বলল সিজল।

ও কিউট? ও তো একটা পাংক।

কিন্তু আমার তো ওকে দারুণ কিউট লাগল।

তাহলে তুমি ওখানে ছিলে, অ্যাঁ? আন্দাজ করেছিলাম তুমি ওখানে আস্তানা গেড়েছ। কারণ আমার কয়েকজন লোক গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

ওহ, ভিন্স, তুমি এখন আর কিউট নেই। তুমি এখন মোটা এবং কুৎসিত হয়ে গেছ।

তুমি কিন্তু কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জিততে পারবে না, সিজল।

সে সদর দরজায় পা বাড়াল কিন্তু সিজল তার সামনে নখরযুক্ত প্রকাণ্ড একটি থাবা রাখল। ভিন্স ওপরে তাকাল এবং ড্রাগনের চেহারার ভাব দেখে চিৎকার দিল।

ধোঁয়া কেটে গেলে সিজল তার চেরা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল।

সুস্বাদু, বলল সে। ওর গায়ে মেদ মাংস একদম ঠিকঠাক মতোই ছিল। অথচ বেচারা এতদিন ভেবেছে আমি ওর আত্মা দখল করে নেব!

দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি থিফ – এডোয়ার্ড ডেনটিংগার হক

বাড়ির সিঁড়িতে বসে, হাতে বিয়ারের ক্যান নিয়ে সামনের ব্লকে ইলেকট্রনিক্স প্ল্যান্টের শ্রমিকদের কাজ দেখছিল ও অলস চোখে। কামলার কাজ করে খেতে হয় না বলে সে মনে মনে খুশি। কিছুক্ষণ পরে, সাপার শেষ করে গ্লোরিয়া যোগ দেবে ওর সঙ্গে। দেখবে রাস্তার ওপাশে ছেলেদের সঙ্গে তাদের বাবারা বল খেলছেন। খেলা শেষে পিতৃদেবগণ মোড়ের দোকানে যাবেন বাড়ির জন্য রুটি মাখন কিনতে কিংবা সিগারেট ফুঁকতে। নিরিবিলি, শান্তিময় একটি মহল্লা– এ কারণেই জায়গাটা পছন্দ ওর। পড়শীরা কেউ অনর্থক কৌতূহল দেখায় না, ব্যক্তিজীবনে উঁকি মারে না।

নিকি?

উ, গ্লোরিয়ার দিকে মুখ তুলে চাইল সে। বারান্দায় রেইলিংয়ে এসে বসেছে মেয়েটি; লম্বা, সুঠাম পদযুগল দোলাচ্ছে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে। গ্লোরিয়া মেয়ে হিসেবে চমৎকার, তবে বড্ড বেশি কথা বলে।

নিকি, তুমি যখন বাইরে কোথাও যাও, তখন কী করো?

বললামই তো ট্রাভেল করি। কোম্পানিগুলো আমাকে ভাড়া করে নতুন নতুন প্ল্যান্ট সাইট খুঁজে বের করার জন্য। বেতনও দেয় ভাল। সে গর্ত হওয়া ক্যানে চুমুক দিল। আশা করছে গ্লোরিয়া বকবক না করে সাঁঝবেলার মৃদুমন্দ হাওয়াটা তাকে উপভোগ করতে দেবে।

তোমাকে ওরা আবার কবে বাইরে পাঠাবে, নিকি?

তা জানি না।

বিয়েশাদী করে সংসার করার সৌভাগ্য কি কখনও আমাদের হবে?

গ্লোরিয়াকে বিয়ে করার কথা প্রায়ই ভাবে সে। মাঝে মাঝে কল্পনা করে বাকি জীবনটা এ পাড়াতেই কাটিয়ে দেবে, সন্ধ্যাবেলায় মোড়ের দোকানে গিয়ে বিয়ার কিনে নিয়ে আসবে। তবে কল্পনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। একদিন হয়তো হবে, বলে সে। সকল প্রশ্নের জবাব আছে এতেই।

রাত দশটার দিকে ফোন বাজল। ঊরুর ওপর থেকে তার হাতটি সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে উঠে দাঁড়াল গ্লোরিয়া সাড়া দিতে। তোমার ফোন, হাঁক ছাড়ল ও।

এসে ফোন ধরল সে। অপরিচিত কণ্ঠ। নিক ভেলভেট বলছেন?

জি।

একটি কাজের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

আজ রাতেই?

আপনি যদি আসতে পারেন। ফস্টার হোটেল। রুম ২২৯।

হাসল নিক। আমি হোটেল রুমে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না। ওগুলো। শুধু রাত কাটানো আর প্রেম করার জন্য।

ঠিক আছে। তাহলে আপনিই বলুন কোথায়?

হোটেলের সামনের পার্কে। ঝর্ণার ধারে।

এই অন্ধকারে? অনিশ্চিত শোনাল লোকটার গলার স্বর।

আমি অন্ধকারেই আমার সেরা কাজগুলো সেরে ফেলি। এগারোটায়– এবং একা আসবেন।

আপনাকে চিনব কী করে?

আবার হাসল নিক। আমি আপনাকে চিনে নেব। ফোন রেখে দিল। ও এসব লোককে চেনে। এদের চেহারা সুরত, আচরণ সবসময় একইরকমের হয়।

বারান্দা থেকে চলে এসেছে গ্লোরিয়া। কার ফোন, নিকি?

একটা কাজের অফার পেলাম। আমার ফিরতে দেরি হবে। খোলা দরজা দিয়ে বেরোবার সময় সে গায়ে জ্যাকেট চড়াল। মাঝে মাঝে রাতগুলো হয় মধুর।

.

নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজের মানুষ নিক ভেলভেট। সে এমন একটা যুগে জন্মগ্রহণ করেছে যখন ইটালিয়ান আমেরিকান জনসংখ্যা বোহেমিয়ানদের সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব ফলাত। সে তার মূল নামটি হেঁটে ছোট করে নিয়েছে, অন্যান্য হাইস্কুল ড্রপআউটদের মতো পড়াশোনা শেষ না করেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যে তার কাজের ধরন একটি আকার পেতে থাকে এবং বর্তমানে তার বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি সে পরিচিতি পেয়ে গেছে একজন এক্সপার্ট হিসেবে।

লোকে তাকে এখন ফোন করে এবং তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে, কারণ এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো নিক ভেলভেট ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। এ ধরনের কাজে তার তুল্য পৃথিবীতে কেউ নেই।

নিক ভেলভেট পেশায় একজন তস্কর। তবে বিশেষ ধরনের চোর।

সে কখনও টাকা চুরি করে না, নিজের হাতে তো নয়ই। সে কাজ করে চুক্তি ভিত্তিতে। এমন সব কাজ যা অন্য তস্করদের জন্য শুধু বিপজ্জনকই নয়, অস্বাভাবিকও বটে। সে চুরি করেছে জাদুঘর থেকে, কর্পোরেশন থেকে, সরকারের কাছ থেকে। সে একটি ডাকঘরের সর্বোচ্চ তলা থেকে রোমান দেবতা মার্কারীর একখানা মূর্তি চুরি করেছে, মধ্যযুগীয় শিল্পকলার জাদুঘর থেকে চুরি করে এনেছে দাগে ভরা একটি কাঁচের জানালা। একবার সে গোটা একটি বেসবল টিম চুরি করেছিল দলের ম্যানেজার, কোচ এবং নানান ইকুইপমেন্টসহ।

এমন নয় যে এ কাজটি তার পছন্দের কিংবা এটিকে সে ক্যারিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছে। তবে ঘটনা যখন ঘটে যায় এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেনি নিক। তার চৌর্যবৃত্তির পারিশ্রমিক বেশ মোটা অঙ্কের এবং বছরে সে বড়জোর চার পাঁচবার এ কাজটি করে। আর কাজ সারতে সে এক হপ্তা বা এরচেয়ে বেশি সময় নেয় না। তাকে তার ক্লায়েন্টরা ঠিকঠাক পারিশ্রমিক দেয় এবং পেশার সুবাদে দারুণ ইন্টারেস্টিং লোকজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তস্কর চূড়ামণির।

তবে হ্যারি স্মিথ সেই ইন্টারেস্টিং মানুষজনের পর্যায়ভুক্ত নয়।

লোকটা ঝর্নার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল গ্যাংস্টারদের মতো ভাব ধরে। তার ভাব মোটেই পছন্দ হলো না নিক ভেলভেটের, বিশেষ করে যখন নিজের পরিচয় দিল শুধু স্মিথ বলে। তার নামটিও পছন্দ হলো না নিকের।

শিকাগোর এক লোক আপনার নামটি সুপারিশ করেছেন, ভেলভেট। বলল স্মিথ। তার বলার ভঙ্গিটিও চাঁছাছোলা।

হতে পারে। আপনি কী চান?

এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলব? আমার হোটেল রুম আছে।

হাসল নিক ভেলভেট। হোটেল রুমে সহজেই ছারপোকা পাতা যায়। আমার বিজনেস ডিল রেকর্ড হবে আমার তা পছন্দ নয়।

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যারি স্মিথ। বর্তমান জমানায় যে কেউই আপনার কথা আড়ি পেতে শুনতে পারে। হয়তো এ মুহূর্তে কেউ লং রেঞ্জের আড়িপাতা যন্ত্র দিয়ে আমাদের কথা শুনছে।

এজন্যই ঝর্নার ধারটা বেছে নিয়েছি। পানি পড়ার শব্দে আমাদের কথা শোনা যাবে না। এখন কাজের কথায় আসুন।

মাথার ওপরে গাছে ঢাকা বাড়ির আলো পড়েছে ঝর্নার চত্বরের এক পাশে। বৃত্তটির মাঝখানে এসে দাঁড়াল হ্যারি স্মিথ। বেশ গাট্টাগোট্টা ধরন, ছোটখাট গরিলাই বলা যায়, উভয় গালে বসন্তের দাগ।

আপনাকে একটা জিনিস চুরি করতে হবে।

সে আগেই বুঝতে পেরেছি। আমার দর কিন্তু অনেক উঁচু।

কত উঁচু?

পঁচিশ হাজার এবং তার ওপরে, নির্ভর করে কাজের ধরনের ওপর।

এক কদম পিছিয়ে গিয়ে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল হ্যারি স্মিথ।

আপনাকে চিড়িয়াখানা থেকে একটি বাঘ চুরি করে এনে দিতে হবে।

নিজের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ বহু আগেই শিখেছে নিক। সে স্রেফ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বলুন, শুনি।

চিড়িয়াখানাটি শহরেই–গ্লেন পার্ক জু। বাঘটির একটি গালভরা নাম আছে– ক্লাউডেড টাইগার। দুর্লভ প্রজাতির।

কতটা দুর্লভ?

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। আবার গরিলার কথা মনে পড়ে গেল নিকের। মধ্যপ্রাচ্যের এক প্রিন্স তাঁর ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় জানোয়ারটাকে রাখার জন্য ভাল টাকা দিতে রাজি। আমরা আপনাকে কুড়ি হাজার দিতে পারব।

জীবজন্তুর জন্য ত্রিশ হাজার, বলল নিক। এতে বিপদের আশঙ্কা বেশি।

সেক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বলুন। জানেনই তো আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

দাঁড়ান! দাঁড়ান! নিকের কাঁধ খামচে ধরল হ্যারি স্মিথ। কাজটি আমাদের তিন দিনের মধ্যে করতে হবে–সোমবার সকালে। সিদ্ধান্ত যা নেয়ার আজ রাতেই নিতে হবে।

তাহলে চিড়িয়াখানাটা আমার আগে একবার দেখা দরকার।

কাল এবং রোববার সময় পাবেন দেখার জন্য।

ত্রিশ হাজার?

একটু ইতস্তত করল লোকটা। ঠিক আছে। পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স।

ওরা হাত মেলাল। নিক ভেলভেট চলে এল গ্লোরিয়ার বাসায় ব্যাগ গোছাতে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ওর মাথার ওপরের তারাগুলো ক্রমে নিভে যেতে লাগল।

.

ওরা তিনজন– হ্যারি স্মিথ; হালকা পাতলা গড়নের একজন ইংরেজ, নাম করমিক এবং সোনালি চুলে তরুণী জেনি। কথা শুনে মনে হলো মেয়েটি করমিকের সঙ্গিনী এবং পরিস্কার বোঝা গেল ইংরেজ লোকটিই এ অপারেশনের মাথা। সে নিরাসক্ত গলায় যেভাবে হুকুমজারি চালাল হ্যারি স্মিথের ওপর, প্রভুরা তাঁদের ভৃত্যদের সঙ্গে এ ভাষায় কথা বলেন। আমার জায়গাটা দেখা দরকার, নিক আবার বলল ওদেরকে।

সরু কাঁধ ঝাঁকাল করমিক। আপনার ইচ্ছে হলে দেখবেন।

সোমবার সকালেই কেন কাজটা করতে হবে?

এ প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে টাকা দেয়া হয়নি, মি. ভেলভেট।

ওরা হোটেল রুম ছেড়ে বসেছে নতুন, কালো একটি কনভার্টিবলের পেছনে ছোট একটি হাউস ট্রেইলারে। গাড়ি এবং ট্রেইলার দুটোরই মালিক সম্ভবত করমিক।

বাঘটি সম্পর্কে বলুন। স্কচের গ্লাসে চুমুক দিল নিক।

করমিক বোধহয় প্রাণিবিদ্যার ক্লাসে লেকচার দেয়। সেই ঢঙে বলতে লাগল। চিড়িয়াখানায় বাঘ কোন মহার্ঘ প্রাণী না হলেও কিছু আছে দুর্লভ প্রজাতির যাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। সাইবেরিয়ান টাইগার এরকম একটি অত্যন্ত দুর্লভ জাতের বাঘ, আলবিনো টাইগারও তাই, আর আছে চীনের কিছু এলাকার নীলচে ধূসর রঙের বাঘ। তবে তথাকথিত ক্লাউডেড ব্যাঘ্রটি এদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্লভ বলে পরিচিত। কয়েক বছর আগে সাইনোইন্ডিয়ান বর্ডারে এ প্রজাতির একটি বাঘ ধরা পড়ে এবং সেটি গ্লেন পার্ক জু তে দান করা হয়। এ ধরনের বাঘ সম্ভবত একটিই রয়েছে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি এবং আমাদের প্রিন্স যে কোনো মূল্যে এ বাঘটির মালিক হতে চান।

আমার কিছু ইকুইপমেন্ট লাগবে।

মাথা দোলাল ইংরেজ। আমরা ছোট আকারের একটি পিকআপ ট্রাক জোগাড় করেছি। জেনি হবে তার ড্রাইভার। বাঘটিকে খাঁচা থেকে বের করে এনে ওই ক্লোজড পিকআপ ট্রাকে আপনি তুলবেন এবং ট্রাক নিয়ে চিড়িয়াখানা থেকে কেটে পড়বেন।

সিগারেট ধরাল নিক। চিড়িয়াখানায় পাহারার ব্যবস্থা আছে?

মাথা ঝাঁকাল করমিক। প্রাইভেট পাহারার ব্যবস্থা আছে। তবে বাচ্চাকাচ্চাদের লাইন ঠিক রাখার জন্য এদের সাধারণত ব্যবহার করা হয়। গত বছর নাকি পোলাপানগুলো জন্তুজানোয়ারদের বিরক্ত করেছে।

মানুষের কবল থেকে জন্তু জানোয়ার রক্ষার চেষ্টা, এই প্রথম হাসল নিক। পেশীতে ঢিল পড়ল। সফল হওয়ার সেই পুরানো অনুভূতি শিরায় শিরায় যেন প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। তবে খুব সহজে সাফল্য ধরা দেয় বলে বিশ্বাসী নয় সে। বরং কোনো কাজ সহজ মনে হলে ওর কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কথাটি যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে নিক যোগ করল, আমি জেনিকে নিয়ে সকালে বেরুব। একা একজন পুরুষ মানুষ চিড়িয়াখানায় ঘোরাঘুরি করলে সন্দেহজনক মনে হতে পারে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল করমিককে। তারপর মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, প্রয়োজন হলে নেবেন। তা ছাড়া সোমবার তো ও আপনার সঙ্গে থাকছেই।

আপনারা দুজন কোথায় থাকবেন? জানতে চাইল নিক।

এই ট্রেইলারেই, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। প্লেন রেডি থাকবে জানোয়ারটাকে কানাডা উড়িয়ে নিয়ে যেতে। তারপর ওখান থেকে মিডল ইস্ট।

করমিক হাসল কি হাসল না বোঝা গেল না। আমরা কি জানতে চেয়েছি আপনি কীভাবে বাঘ চুরি করবেন?

আরেকটি সিগারেট ধরাল নিক। জিজ্ঞেস করেননি বলে খুশি হলাম। এ মুহূর্তে আমি নিজেও জানি না কাজটা কীভাবে করব।

.

শনিবার সকাল। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। অনেক উঁচুতে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে জেনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকল নিক। ছুটির দিন বলেই চিড়িয়াখানায় বেজায় ভিড়। টিকিট সিকি ডলার।

আমাদের সময় চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পয়সা লাগত না। বলল নিক।

ছোট কিছু শহরে এখনও ফ্রিতে চিড়িয়াখানায় ঢোকা যায়। বলল জেনি। এখানে গার্ডদের বেতন দিতে হয়। মেরু ভালুকের খাঁচার কাছে দাঁড়ানো উর্দিধারী এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল। লোকটার কোমরে রিভলভার, বুকে স্থানীয় সিকিউরিটি সার্ভিসের রূপোলি ব্যাজ।

ওদের কি সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখতেই হয়?

ত্যাগ করল জেনি। বোধহয় গুলি ভরা নেই।

আশা করি। আচ্ছা, এই ক্লাউডেড টাইগারটি কোথায়?

এদিকে। চলুন, আগে বানরদের খাঁচার ধারে যাই। যদি গার্ড। আমাদের লক্ষ করে থাকে!

মেয়েটি বেশ চালাক চতুর। শুধু সুন্দরীই নয়, মাথায় বুদ্ধিও আছে। স্বর্ণকেশী, লম্বা পায়ের মেয়েটির সঙ্গ ভালই লাগছে নিকের।

কিছুক্ষণ বাঁদরদের বাঁদরামি দেখে ওরা বাঘের ঘরের দিকে এগুল। নিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে চিড়িয়াখানার কর্মকাণ্ড। বেড়াসংলগ্ন ফটক থেকে আবর্জনা বোঝাই একটি ট্রাক এল, একজন কীপার সীলদের ঘরের কাছের কংক্রিটের মেঝে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল, এক বুড়ো বেলুনঅলা ট্যাংকের গ্যাস দিয়ে বেলুনে গ্যাস ভরছে। ফ্রন্ট গেটে চোখ আটকে গেল নিকের। জিজ্ঞেস করল, আমারড কার কীসের জন্য?

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল জেনি। গতকালকের টিকিটের টাকা তুলতে এসেছে। ছুটির দিনে ওরা দুই তিন হাজার ডলার কামাই করে।

বাঘের খাঁচার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

ক্লাউডেড টাইগার টি আকারে মস্ত বড়। গায়ে বিভিন্ন রঙের ছাপঅলা পশম। এমন বিচিত্র পশমের বাঘ আগে কখনও দেখেনি নিক। দৃপ্ত পদক্ষেপে খাঁচায় হাঁটাহাঁটি করছেন ব্যাঘ্র মহাশয়, সমস্ত অবয়ব থেকে শ্রেষ্ঠত্বের বিচ্ছুরণ ঘটছে। তার গর্জন এবং চেহারার কাছে পাশের খাঁচার। সিংহ এবং অন্যান্য বাঘগুলোকেও ম্লান লাগছে। রাতের বেলা এরকম একটি জানোয়ারের সঙ্গে সাইনো ইন্ডিয়ান সীমান্তে মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবলেই বুক কাঁপে। শনিবারের এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুরেও বাঘটির সামনা সামনি হয়ে ভয় ভয় লাগছে ওদের।

ওটাকে আমার পছন্দ হয়নি, শিউরে উঠল জেনি।

মনে হচ্ছে যেন খাঁচার শিক ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পড়তেও পারে। তবে আমার কাজ হলো একে খাঁচার বাইরে নিয়ে আসা, সে যেভাবেই হোক।

করমিক একটা মাথা পাগলা। চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ চুরির কথা কে কবে শুনেছে?

হাসল নিক। আমি এরচেয়েও অদ্ভুত সব জিনিস চুরি করেছি– একবার দশ টন স্লট মেশিন চুরি করেছিলাম। কথা বললেও ওর চোখ জোড়া ভারি ব্যস্ত। সবগুলো খাঁচার গেট একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত, তবে ক্লাউডেড টাইগারের খাঁচার গেট শুধু শিকলসহ তালা মারা। পেছনের দেয়ালের একটি দরজা দেখা যাচ্ছে যা দিয়ে জানোয়ারটির ঘরে প্রবেশ করা যায়। অপর এক্সিট হলো খাঁচার সামনে ছোট একটি গেট। এ গেট দিয়ে বাঘটিকে খাবার দেয়া হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও চলে এখান। থেকেই। গেটের তালা লক্ষ করল নিক। এটা ওর জন্য কোনো সমস্যা নয়।

দেখা হলো, নিক? অবশেষে জিজ্ঞেস করল জেনি।

হুঁ।

ওরা উটের খাঁচার সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল। থমকে দাঁড়াল বুড়ো এক বাইসনের সামনে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। বাইসনটি যেন বুঝে গেছে। তার দিন শেষ। প্রাণীটিকে দেখে এত খারাপ লাগল নিকের, তাড়াতাড়ি ফিরে এল গাড়িতে।

ওরা ট্রেইলারে এসে দেখে মদ্য পানে ব্যস্ত করমিক। সে হেসে নিকের দিকে একটি গ্লাস উঁচু করে বলল, ভেবেছিলাম বাঘটাকে সঙ্গে নিয়েই আসবেন।

ওটা তো আপনাদের সোমবার পাবার কথা।

একটি চেয়ারে বসল হ্যারি স্মিথ। হুম, সোমবার সকাল পৌনে দশটায়।

ঠিক ওই সময়েই কেন?

করমিক মদের গ্লাসে চুমুক দিল। ওই সময়েই প্লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা। তখন কি বাঘটাকে নিয়ে আসতে পারবেন?

রাতের বেলা হলে সুবিধে হতো, বলল নিক।

তখন গার্ডদের পাহারা থাকে। আপনি ফ্রন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকতেই পারবেন না। অন্তত দিনের বেলায় কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করে খাঁচার কাছে যেতে পারবেন।

দেয়ালে হেলান দিল নিক, জেনি লম্বা পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসেছে সেদিকে চোখ রেখে বলল, মাঝে মধ্যে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্দ হয় না। এখন বলুন, বাঘটিকে হাতে পাবার পরে আপনাদের প্ল্যান কী।

জেনি পিকআপ ট্রাক চালাবে, বলল করমিক। আপনি চিড়িয়াখানা থেকে বেরুনো পর্যন্ত ও আপনার হুকুম মাফিক কাজ করবে। তারপর আপনাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে মিটিং প্লেসে। আমরা সেখানে আপনার বাকি পাওনা পরিশোধ করে দেব এবং ট্রাক নিয়ে চলে যাব। প্লেনে করে জানোয়ারটাকে কানাডা নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

ওই ট্রাকে বাঘটিকে রাখা যাবে?

ইস্পাতে মোড়া পাত আছে ভেতরে, এয়ার হোলসহ। বাঘ এঁটে যাবে দিব্যি।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নিক। আমার কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করা দরকার। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

ও জেনির গাড়ি নিয়ে শহরে গেল। টু মারল শনিবারেও ভোলা থাকে এমন একটি ল্যাবরেটরি সাপ্লাই হাউসে। তারপর কুৎসিত দর্শন একটি পেলেট গান কিনল যা দিয়ে

ট্রাংকুইলাইজিং তীর ছোঁড়া যায়। এ দিয়ে অজ্ঞান করা হয় জন্তু জানোয়ার। অপহরণের সময় ব্যাঘ্র মশাই যদি অস্থির হয়ে ওঠেন...

.

রোববার বিকেলে নিক আবার চিড়িয়াখানায় গেল কীপারদের ইউনিফর্ম পরখ করতে। সঙ্গে জেনিকেও নিল কারণ মেয়েটির বিষয়ে কিছু খোঁজ খবর দরকার।

করমিকের সঙ্গে কী করে পরিচয় হলো তোমার? সাপের ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল ও জেনিকে।

এসব পরিচয় কীভাবে হয়? আমি ব্রডওয়ের ছোটখাট একটি থিয়েটারে নাচতাম। স্বপ্ন ছিল একদিন নিজেই নিজের কোরিওগ্রাফি করব। ও বলল আমাকে সাহায্য করবে–কিছু টাকা পয়সা বিনিয়োগ করবে।

করেছিল বিনিয়োগ?

এ কাজটির পরে দেবে বলেছে। কিন্তু একটার পর একটা কাজ শেষ হয়–দেয় না। তবে তোক মন্দ নয় সে। হ্যারিকে সে তার উপযুক্ত জায়গাতেই রেখেছে।

কতদিন ধরে তোমরা তিনজনে একসঙ্গে কাজ করছ?

প্রায় বছর খানেক। হ্যারির একটি কাজের মেয়ে ছিল। কিন্তু সে চলে গেছে। হ্যারি প্রায়ই মেয়েটির গায়ে হাত তুলত। সইতে না পেরে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

করমিক আমার কথা জানল কী করে?

নিকের দিকে ফিরে হাসল জেনি। নির্দিষ্ট কিছু সার্কেলে তুমি খুবই বিখ্যাত মানুষ, নিক ভেলভেট। তবে কল্পনাও করিনি তুমি এত হ্যান্ডসাম।

নিক জানে সে কোনো ম্যাটিনি আইডল নয়। জেনির পায়ের দিকে নজর দেয়া বন্ধ করল ও। চলো, ফিরি।

ফেরার পথে বেলুনঅলার স্টলের সামনে দাঁড়াল ও। দুটো বেলুন কিনল। একটা নীল, আরেকটা লাল। নীল বেলুনটা জেনিকে দিল নিক, লাল বেলুনটা উড়িয়ে দিল বাতাসে। দেখল মৃদু মন্দ হাওয়া হেলে দুলে ওপরে উঠে যাচ্ছে বেলুন। অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকল নিক। ভেলভেট। তারপর দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ল চিড়িয়াখানা থেকে।

.

সোমবার শুরু হলো বৃষ্টি। নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল নিক। ভাবছিল আজ স্থগিত রাখবে কিনা কাজ। তবে সকাল আটটার দিকে হালকা হয়ে এল বর্ষণ। গুঁড়িগুঁড়ি ঝরছে।

চূড়ান্ত কনফারেন্সে মিলিত হলো ওরা। করমিক হ্যান্ডশেক করল নিকের সঙ্গে।

গুডলাক, নিক। বাকি টাকাটা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তোমরা কোথায় থাকবে বলা যাবে না?

জেনি তোমাকে জানাবে। আজ বিকেলেই দেখা হচ্ছে।

চিড়িয়াখানার কর্মীরা যে ধরনের পোশাক পরে সেরকম একটা উর্দি পরে নিল ঝটপট। তারপর জেনির পিছু নিল পিকআপ ট্রাকে চড়ে। জেনি। তার গাড়ি পার্ক করল শহরতলীর একটি শপিং সেন্টারের কাছে।

অলরাইট, বস, ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়ল জেনি। আমার জন্য কী হুকুম?

সার্ভিস গেট খোলা থাকবে। আমরা ওখানে ড্রাইভ করে যাব। তারপর তোমাকে ছেড়ে দেব। ওখান থেকে তুমি বাঘের খাঁচাটা দেখতে পাবে। আমি ওখানে পৌঁছা মাত্র তুমি

ট্রাক নিয়ে এগোবে ওদিকে। ধীর গতিতে ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে খাঁচার রেইলিংয়ের ধারে চলে আসবে। দুরূহ কাজের অংশটা ওখানেই।

গার্ডরা তখন কী করবে?

নিক বলল ওকে।

তুমি একটা লোকই বটে, নিক ভেলভেট। এতে কাজ হবে?

এতে কাজ না হলে আমাকে বাঘের থাবা খেতে হবে।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য কি আরেকটি বেলুন কিনব?

এক মুহূর্ত আকাশ পরখ করল নিক, ফুলো ফুলো তুলতুলে সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। না, বাতাসের গতি গতকালকের মতোই। সে তার ইউনিফর্মের অসংখ্য ফোলা পকেটগুলো একবার হাতড়ে নিল। ওরা এখন রেডি।

সার্ভিস গেট দিয়ে পিকআপ ট্রাক নিয়ে ধীরে সুস্থে ঢুকছে জেনি, এগিয়ে এল চিড়িয়াখানার উর্দিধারী এক পাহারাদার। নিক ট্রাক থেকে দ্রুত নেমে সামনে পা বাড়াল।

তুমি এখানে কাজ করো? হাঁক ছাড়ল পাহারাদার।

বাঘের খাঁচা পরিস্কার করি।

কী? হেঁটে আসছে লোকটা। চেহারায় বিস্ময়।

গতরাতে কে যেন ওখানে বোতল ছুঁড়ে মেরেছে। ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে খাঁচায়। নিক আশা করল চিড়িয়াখানার আসল কীপারদের চোখে পড়েনি বোতলটা এবং কাঁচটাচগুলো পরিষ্কারও করেনি। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে, বেড়ার ওপর দিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে মেরেছিল ও। নিকের তাক খুব ভাল। ক্লাউডেড টাইগারের ঘরের এক কোণে পড়ে শতধা বিভক্ত হয়েছে বোতল।

ঘুরল পাহারাদার। দেখতে পেল ভাঙা কাঁচের টুকরো এবং পায়চারীরত বাঘকে। কোন্ হারামজাদা এমন কাজ করল! আমার আবার খবরটা জানাতে হবে।

নৈশ পাহারাদার আগেই জানিয়েছে খবর।

তাই নাকি? তাহলে ঠিক আছে। ঘুরল সে। খাঁচার সামনের আউটার রেইলিং টপকে পার হলো নিক।

হঠাৎ কী মনে পড়তে পাহারাদার বলল, তোমার কাছে পরিচয়পত্র আছে তো? তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না আমি।

পরে দেখাচ্ছি, বলল নিক। আগে হাতের কাজটা শেষ করি। সে শরীর দিয়ে খাঁচার তালা ঢেকে রেখেছে। তালার সঙ্গে লাগানো শিকলটা শক্তিশালী ওয়্যার কাটারের এক চাপে কেটে ফেলল।

কী...?

খাঁচার দরজা খুলতে শুরু করেছে, নিক আশা করল জেনি তার ট্রাক নিয়ে পজিশন মতো দাঁড়াবে।

তুমি ওয়্যার কাটার দিয়ে খাঁচা পরিস্কার করবে? কে হে, বাপু, তুমি?

নিক ভারী যন্ত্রটা মাথার ওপর তুলল এবং পাহারাদারের চাদি বরাবর খটাশ করে নামিয়ে আনল। আর্তনাদ ছাড়ল পাহারাদার। পড়ে যাচ্ছে, নিক মুক্ত হাত দিয়ে তার পকেট থেকে কী যেন বের করে নিল।

জেনি উদয় হলো ট্রাক নিয়ে, পজিশন নিতে পিছিয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল কে যেন। নিক ঘুরে দেখে এক কীপার ছুটে আসছে ওদের দিকে। দূরে, গেটের কাছে আরেক গার্ড ফিরল এদিকে।

নিক এক মুহূর্ত সময় নিল বাতাসের গতি প্রকৃতি ঠাহর করে নিতে। তারপর এগিয়ে আসা লোক দুটোকে লক্ষ্য করে এক জোড়া স্মোক বম্ব ছুঁড়ে দিল।

নিক!

জলদি! আমাদের হাতে মাত্র এক মিনিট সময় আছে! সে ট্রাক থেকে একটি প্ল্যাঙ্ক বা কাঠের তক্তা বের করে রেইলিং থেকে খাঁচার দরজা বরাবর বিছিয়ে দিল। এরপর আরেকটা স্মোক বোমা খাঁচার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে পুরোপুরি খুলে ধরল দরজা।

ভীত, সন্ত্রস্ত বাঘ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তার আস্তানায় সেঁধুতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওখানে ধোঁয়া উড়তে দেখে সিদ্ধান্ত বদলে খাঁচা থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল। কাঠের তক্তা বেয়ে উঠে গেল অপেক্ষমাণ ট্রাকের ভেতরে। কাজ শেষ! চেঁচাল নিক। তক্তাটি টেনে নিয়ে পিকআপ ট্রাকের ইস্পাতের দরজা বন্ধ করে দিল দড়াম করে। এখন ভাগো!

এক গার্ড ধোয়ার পর্দা ভেদ করে চলে এসেছিল, হোলস্টারে হাত রেখেছে, এমন সময় গুলির শব্দ হলো। মেইন গেট থেকে শব্দটা এসেছে, বলল নিক, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল মেয়েটির পাশে। ঘটনা কী?

জবাব দিল না জেনি। সবেগে গাড়ি ছোটাল সার্ভিস গেট অভিমুখে। প্রবল একটা সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল নিক, তবে গেট এখনও ভোলা। ওদের পেছনে পাহারাদার বেহুদাই গুলি ছুঁড়ল। ওরা ততক্ষণে পগারপার।

এই ট্রাকে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, বলল জেনি।

ট্রাক চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথের পাশ কাটিয়ে সগর্জনে ছুটে যাচ্ছে, সাইড উইন্ডো দিয়ে তাকাল নিক। আর্মারড কারটিকে দেখতে পেল। দরজা খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে মূল গেটের পাশে। দুই উর্দিধারীকে দেখা গেল পেভমেন্টে চিৎপাত পড়ে আছে।

ট্রাকের কথা বাদ দাও, ঘোঁত ঘোত করল নিক। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কী?

মানে?

মানে তুমি ভালো করেই জানো। তোমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে দারুণ একটা চালাকি করেছে।

দক্ষ ড্রাইভারের মতো বনবন করে হুইল ঘোরাল জেনি, সাঁৎ করে ঢুকে গেল একটা সাইড রোডে। ধুলোময়, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। ঝুঁকি লাগছে খুব। বাঘটার গড়গড় ডাক শোনা গেল।

তোমাকে টাকা দেয়া হয়েছে, বলল জেনি ওকে। অনুযোগ বন্ধ করো।

করমিকের আসলে বাঘটার দরকারই ছিল না! আমি ওটাকে ধরে আনতে না পারলেও তোমাদের কিছু আসত যেত না। গোটা ব্যাপারটা ছিল একটা ডাইভারশন যার ফাঁকে আমারড কারে হামলা চালিয়েছে করমিক এবং স্মিথ।

আমি জানতাম না গোলাগুলি হবে, রাস্তায় চোখ রেখে বলল জেনি।

আমি গার্ডের হাতে ধরা পড়লে তোমরা আমাকে ওখানেই ফেলে রেখে চলে আসতে। অল্প কিছু টাকার জন্য তোমরা এসব করলে?

নাক সিঁটকাল জেনি। মাথাটা খাটাও, নিক। আর্মারড কারটা প্রতি সোমবার সকালে টাকা আনতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় যায়। ভাগ্য ভাল থাকলে আমরা মিলিয়ন ডলার পেয়ে যাব।

ওরা চিড়িয়াখানার ভেতর অপেক্ষা করছিল। আর্মারড কারের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে নিয়েছে। আমারড কারের দুজন লোকই কি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল?

ওরা সবসময় তাই করে, বলল জেনি। চিড়িয়াখানা ছিল ওদের কাছে সেফস্টপ, চার্চের মতো। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল চিড়িয়াখানার গার্ডদের অন্যত্র ব্যস্ত রাখা। আর সেজন্যই তোমাকে দৃশ্যপটে আনা হয়েছে।

এবং ভিলেন হিসেবে এখন পুলিশের তাড়া খাব আমি।

আমি দুঃখিত, নিক। ওদের পেছনে আবার হুঙ্কার ছাড়ল বাঘ।

সে তো এখন বলবেই! তুমি আমার সঙ্গে এসেছিলে দেখতে কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলাম কিনা।

ঠিক তাই। আমি ট্রাক আর ওই ছাতার বাঘসহ তোমাকে রেখে যাচ্ছি। আমার গাড়ি নিয়ে চলে যাব।

ওদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হচ্ছে কোথায়?

সরি, নিক। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

নিক হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় বন্ধ করে দিল ইগনিশন। কেঁপে উঠর ট্রাক, ঝাঁকি খেতে খেতে সরু, নোংরা রাস্তাটায় থেমে গেল। বলল, হুকুম করল ও।

জেনি ঝট করে নিজের দিকের দরজাটা খুলে লাফ মারল। মাটিতে পা পড়তে না পড়তেই দিল ছুট। নিকও লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। পাই করে ঘুরল জেনি। কাঁধের ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে হাত।

আমি নিজেই নিজের দেখভাল করতে পারি, নিক, বলল জেনি, ছোট একটি পিস্তল তাক করল ওর পেটে। তোমার সঙ্গে আসার কোনো দরকার নেই।

ইউ ক্রেজি ফুল! বিদ্যুৎ খেলে গেল নিকের দেহে- সাইড পকেট থেকে বের করে এনেছে পেলেট গান। হাঁটু মুড়ে বসে পড়েই টিপে দিল ট্রিগার। জেনি গুলি করার ঠিক এক সেকেন্ড আগে ওর কব্জিতে ঢুকিয়ে দিল ট্রাংকুইলাইজার ডার্ট।

.

একটি মাঠে অজ্ঞান জেনিকে রেখে ট্রাক নিয়ে শপিং সেন্টারে চলে এল নিক। এখানেই জেনি ওর গাড়িটি রেখে গেছে। রেডিওতে ইতিমধ্যে প্রচার শুরু হয়েছে ডাকাতির খবর। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খবর শুনল নিক।

আজ সকালে গ্লেন পার্ক জুতে এক ডাকাতির ঘটনায় দুই আর্মারড কার গার্ড খুন হয়েছেন। চিড়িয়াখানার পাহারাদাররা খাঁচা থেকে একটি বাঘ চুরির ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আর্মারড কারের লোকদের কোনরকম সাহায্য করতে পারেননি। দুই মুখোশধারী বন্দুকবাজ আনুমানিক সাত লাখ ডলার নিয়ে পালিয়েছে। ওদিকে একজন পুরুষ এবং একটি মেয়ে বাঘ চুরি করছিল। হারানো জন্তুটি দুর্লভ প্রজাতির একটি বাঘ– অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

নিক গাড়ির রেডিওর সুইচ অফ করে দিয়ে ঘুরল শপিং সেন্টারের দিকে। ওখানে এখন না যাওয়াই ভালো ভেবে জোরে মিউজিক ছেড়ে দিল। আবার গড়গড় করতে লাগল বাঘ। এরকম একটা প্রাণীর জন্য প্রিন্স সত্যি ৩০,০০০ ডলার খরচ করতে চাইবেন কিনা ভাবছিল নিক।

জেনির গাড়ির গ্লাভ কমপার্টমেন্টে একখানা রোড ম্যাপ পেল ও। সতর্ক নজর বুলাল ওতে। পেন্সিল দিয়ে চারটে বৃত্ত আঁকা হয়েছে। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল করমিক এবং স্মিথ চিড়িয়াখানার আশপাশে, এয়ারপোর্টে কিংবা ট্রেইলারের কোথাও ঘেঁষবে না।

তাহলে ওদের পাবার সম্ভাব্য জায়গা একটাই আছে। চতুর্থ বৃত্তের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

ট্রাকে ফিরে এলে এক লোক ওকে বলল, এই যে মিস্টার। আপনি গাড়িতে কোনো জন্তু জানোয়ার রেখেছেন নাকি?

হাসল নিক। হ্যাঁ, আমার কুকুর। বিশালদেহী।

আওয়াজ শুনে তেমনই মনে হলো।

হাসতে হাসতে ট্রাক নিয়ে হাইওয়েতে উঠে পড়ল নিক। আশা করল ট্রাংকুইলাইজার বন্দুকটি আবার ওকে ব্যবহার করতে হবে না।

ম্যাপের চতুর্থ বৃত্তটি নির্দেশ করছে একটি ট্রেইলার ক্যাম্প। তবে করমিক কিংবা হ্যারিকে সেখানে পাওয়া গেল না। নিক জঙ্গলের ধারে ট্রাক থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় দুই মূর্তির আবির্ভাব ঘটল ক্যাম্পের কাছে। হাসল নিক।

রাত হলে সে ট্রাকটি নিয়ে আস্তে চলে এল ট্রেইলারের পাশে। নেমে পড়ল বাহন থেকে। কীসের যেন গর্জন হচ্ছে? শুনল হ্যারি স্মিথ বলছে ক্যাম্পের ভেতর থেকে। নিক ট্রাকের পেছনের দরজার ছিটকিনি খুলে দিল।

হাতে পিস্তল, ট্রেইলারের দরজায় চেহারা দেখাল করমিক। কে। ওখানে? জেনি, তুমি?

বাঘটিকে নিয়ে এলাম, করমিক। যেভাবে অর্ডার করেছিলে।

ভেলভেট!

ক্ষুধার্ত এবং হিংস্র, তবে শরীর স্বাস্থ্য ঠিকই আছে, ট্রাকের পেছনের দরজা খুলে ফেলল নিক।

আলোকিত ট্রেইলার দেখে আকর্ষিত হয়েছে বাঘ। লাফ দিল এবং করমিকের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তার পেছনে দাঁড়ানো হ্যারি স্মিথ ত্রাহি চিৎকার দিতে লাগল। তবে বাঘের বিকট হুঙ্কারে তার আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

.

বাঘটিকে অচেতন করতে ট্রাংকুইলাইজার গান ব্যবহার করতে হলো নিক ভেলভেটকে। সে লুঠের মাল জড় করল একটা ব্যাগে। বাঘের গর্জন শুনে হাজির হয়েছে লোকজন। ভয়ার্ত চোখে অজ্ঞান বাঘ আর ছিন্নভিন্ন লোক দুটোকে দেখছিল তারা। তাদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল নিক। দূরে শোনা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ির সাইরেন। সে পিকআপ ট্রাকে উঠে চম্পট দিল।

.

মোড়ের দোকান থেকে ছটা ঠাণ্ডা বিয়ার কিনল নিক। ধীরেসুস্থে হাঁটছে। রাতের বাতাসটা উপভোগ করছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে গ্লোরিয়া দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। হাসল সে। দ্রুত হলো হাঁটার গতি।

হ্যালো, নিকি, বলল গ্লোরিয়া। বাড়িতে থাকছ তো এবার?

দেখি, জবাব দিল সে। খুলল একটি বিয়ারের ক্যান।

দ্য বাথ – ট্রাস্টিন ফরচুন

ফেনা মেশানো উষ্ণ পানিতে গোসল করার মজাই আলাদা। বাথটাবে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল মেলিটা। চটকা ভেঙে গেল ডোরবেলের শব্দে। নিশ্চয় জেমস, ওর স্বামী। চাবি নিতে ভুলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে ওদের তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকীতে ওকে সারপ্রাইজ দিতে। দ্রুত বাথটাব থেকে উঠে পড়ল মেলিটা। গলা উঁচিয়ে বলল, জেমস তুমি?

সরি, সোনা। আমার কাছে চাবি নেই। জবাব এল।

গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে, হানিমুনে তাইওয়ান থেকে কিনে আনা রোবটি দ্রুত গায়ে চড়িয়ে দরজার দিকে ছুটল মেলিটা।

জেমস, তোমার চেহারা এরকম দেখাচ্ছে কেন? কাজটা হয়নি? দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল মেলিটা।

প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়ল জেমস।

বসো, স্বামীর গালে চুমু খেল মেলিটা। আমি তোমার জন্য হুইস্কি নিয়ে আসি।

হুইস্কি থাক। ব্রান্ডি এনো।

ওয়াইনের বোতল থেকে ধুলো ঝাড়তে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল মেলিটা। তার স্বামীকে এ পর্যন্ত স্কচ ছাড়া আর কিছু খেতে দেখেনি ও। তাও সে ডিনারের সময় শুধু মদ পান করে আর রোববারের লাঞ্চে বিয়ার। খবর নিশ্চয় খুবই খারাপ।

সুদৃশ্য ক্রিস্টাল গ্লাসে ও নিজের জন্য জিন আর জেমসের জন্য গ্লাস ভরে ব্রান্ডি নিল মেলিটা। গ্লাসটি স্বামীর হাতে তুলে দিল। সঙ্গে ডাকে আসা চিঠিপত্র। বাড়ি ফিরেই চিঠিপত্রে চোখ বুলাননা জেমসের অভ্যাস।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে এখন? জানতে চাইল মেলিটা।

মাথা নাড়ল জেমস। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর চোখ ফেরাল খামগুলোতে। তবে একটি খামও খুলল না।

পরে, ফিসফিস করে বলল জেমস। তুমি গোসল করতে যাও।

না, ঠিক আছে। আমার এমনিতেও গোসল প্রায় শেষ।

যাও তো! খেঁকিয়ে উঠল জেমস।

জেমসের এরকম চেহারা আগে কখনো দেখেনি মেলিটা। বুঝল স্বামীর আদেশ পালন করাই ওর জন্য এখন মঙ্গলজনক হবে। ওর একটু একটু ভয় করছে। সকালে মানুষটা কত ফ্রেশ মুড নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর এখন তার একী চেহারা!

বাথরুমে ফিরে এল মেলিটা। গা থেকে খুলে ফেলল রোব। মেঝে থেকে দেয়াল পর্যন্ত উঁচু আয়নায় নিজের চমৎকার ফিগারটি প্রশংসার দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল নীল ফেনার রাজ্যে। কী এমন ঘটল যাতে জেমস এমন আপসেট হয়ে আছে, ভাবছে ও। ব্যবসায়িক চুক্তিটা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে কি নতুন কেনা গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? যাই ঘটকু না কেন, শীঘ্রি জানতে পারবে মেলিটা। ওরা পরস্পরের কাছে কোনো কথা বেশিক্ষণ গোপন রাখে না।

বিবাহবার্ষিকীর পার্টিতে ওদের জনা কুড়ি মেহমান আসবে। পার্টিতে কী পরবে, অতিথিদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবার এবং পানীয় আছে কিনা বাড়িতে, ওকে জেমস কী উপহার দিচ্ছে এসব নিয়েই ভাবছিল মেলিটা বাথটাবে শুয়ে শুয়ে। এখনো কোনো প্যাকেজ বাড়ি এসে পৌঁছায়নি। নতুন অ্যান্টিক মার্কেটের গহনার দোকানে খুব সুন্দর একটি পেনডেন্ট দেখে এসেছে ও, নীলা বসানো। জেমস যদি ওকে ওটা উপহার দেয় তো দারুণ হয়।

পাঁচ, কিংবা দশ মিনিট পরও হতে পারে, বাথরুমের দরজায় সজোর টোকা পড়ল।

এসো, জেমস, দরজা খোলাই আছে। এখন কি একটু ভালো লাগছে, ডার্লিং? মাথা ঘোরাল ও এবং জমে গেল আতঙ্কে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জেমস। পুরো ন্যাংটা, শুধু চামড়ার একটি ব্যাগ ঝুলছে বাম কাঁধে। ওর চাউনি একদম ফাঁকা এবং স্থির। ধীর পায়ে এগিয়ে এল মেলিটার বাথটাবের পাশে। বাষ্পচ্ছন্ন আয়নায় নিজেকে একবার দেখল।

মেলিটা বুঝতে পারছে কোথাও মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে। ও। হাত বাড়াল তোয়ালে নিতে। ছুটে পালাবে।

এত তাড়া কীসের মেলিটা মেল? ঘোঁতঘোঁত করে উঠল জেমস, দানবীয় শক্তিতে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল পানিতে। আমি তো এখনো শুরুই করিনি।

মেলিটা কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু শুকনো, কম্পিত গলা দিয়ে কোনো রা বেরুল না।

তুমি বুঝতে পারছ না, মাই লাভ? বলে চলল সে। পারছ কী? তবে চিন্তা কোরো না, তোমার ভয় আমার আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেবে। এ মুহূর্তটির জন্য আমি সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করেছি। অত্যন্ত ধৈর্য ধরে আমার সবচেয়ে গোপন ব্যাপারটি লুকিয়ে রেখেছি। না, তোমাকে আমি বলব না এখন যে কাজটি করতে যাচ্ছি তা কেন করছি।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে মেলিটা। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে মিশে যাচ্ছে নীল সমুদ্রে যা একটু আগেও ভারী আরামদায়ক বলে মনে হয়েছিল।

কেন জেমস? ফুঁপিয়ে উঠর মেলিটা, জানে ভয়ানক বিপদে আছে সে। কেন?

কেন নয়, হিসিয়ে উঠল সে নিষ্ঠুর গলায়। বলো কী।

চামড়ার ব্যাগ খুলে জেমস যে জিনিসটি বের করল তা ডাক্তাররা অপারেশনে ব্যবহার করেন। একটি স্কালপেল।

আমি এ জিনিসটি নিয়ে বহুবার রিহার্সাল দিয়েছি, ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল জেমস। ভাবলেশশূন্য চেহারায় এখন একটা হাসি যেন স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে।

কোনোরকম ধস্তাধস্তি করবে না। আমি যত কম কাটা ছেঁড়া করা যায় তাই করব। কাজটা নিখুঁত হওয়া চাই। তোমার মতো নিখুঁত। তুমি অল্প সময়ের জন্য একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করবে। তবে তোমার সুন্দর শরীরের কোনো ক্ষতি আমি করব না। তোমাকে শীঘ্রি অনেক বেশি সুন্দরী এবং নিখুঁত দেখাবে তোমার ক্রিম সিল্ক কফিনে। তোমার কফিন সাজানো হবে সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে। গোলাপ, লিলি, কার্নেশন এমনকী অর্কিডও থাকবে। হ্যাঁ, আমি তোমার পায়ের কাছে এক ডজন অর্কিড উৎসর্গ করব। সে

মেলিটার একটা পা খপ করে ধরে আদর করে চুমু খেল। পিছলে গেল মেলিটা, ডুবে গেল গভীর জলে। আহা, কী সুন্দর পদযুগল। আরেকটা পায়ে আদর করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল সে। তারপর ছেড়ে দিল ওকে।

ওরা চোখাচুখি করল। মেলিটার চোখে ভয়, জেমসের চোখ ফুর্তি। সে মেলিটার ঘাড় চেপে ধরে টেনে আনল নিজের কাছে। প্রথম চুম্বন। ব্যাকুল গলায় বলল সে। মেলিটাকে বাধ্য করল চুমু খেতে। এ জেমসকে বড় অচেনা লাগছে মেলিটার। তীব্র কামনায় জ্বলছে জেমসের চোখ। আড়ষ্ট হয়ে গেল মেলিটা। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অনিয়ন্ত্রিত আতঙ্ককে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। জানে এর কাছ থেকে রেহাই মিলবে না। জেমসের ওপর যে দানব ভর করেছে সে মেলিটার চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী।

মেলিনা জেমসের এহেন আচরণের কার্যকারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। জেমস হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন? এ যেন এক অপরিচিত কেউ ওকে গ্রাস করতে চাইছে। মৃত্যুভয় কি মৃত্যুর চেয়েও খারাপ? প্রথম চুম্বন বলতে কী বোঝাতে চাইল জেমস? এসব কী ঘটছে?

মাথাটা ঝাঁকিয়ে জেমসের বন্ধন থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিতে চাইল মেলিটা। কিন্তু ওকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছে জেমস। মেলিটার মুখ দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল, প্রতিধ্বনি তুলল বাথরুমে, ঘোঁতঘোত করছে জেমস। গাঁজলা তোলা গার্গলের শব্দে থেমে গেল ঘোঁতঘোঁতানি।

মেলিটার মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল জেমসের ছুরিটি তার মাথার পেছন দিকে বসে যেতে। ছুরিটি মন্থর গতিতে চামড়া কাটতে কাটতে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত পৌঁছাল। মেলিটার কপাল নিখুঁতভাবে কেটে ফেলা হলো। জেমস মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কাজটি করছে। মেলিটার পৃথিবী অবশেষে ডুবে গেল নিকষ আঁধারে...

.

সদর দরজার তালায় চাবি লাগানো হলো। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হলো দরজা। প্লাস্টিক ক্যারিয়ার ব্যাগে শ্যাম্পেনের বোতল পরস্পরের গায়ে লেগে মিষ্টি টুং টাং শব্দ তুলল।

মেল, মাই ডার্লিং, তুমি চিন্তাই করতে পারবে না আমাদের অ্যানিভার্সারীর জন্য কী জিনিস নিয়ে এসেছি। মেল?

জেমস ওর পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। দেখল বাথরুমে আলো জ্বলছে। ও পা বাড়াল ওদিকে। দরজা ভেজানো দেখে ধাক্কা মারতেই খুলে গেল। সামনে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের দৃশ্য ওকে বরফের মতো জমিয়ে দিল। ওহ, মাই গড! মেল!

ওর মনে প্রথমেই যে চিন্তাটা এল তা হলো জনের হাত থেকে স্কালপেলটা কেড়ে নিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। বীভৎস দৃশ্যটা ওর মতো শক্ত সমর্থ মানুষকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে। দুপুরের খাবার পেট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে।

বাথটাব বোঝাই লাল ফেনা, সারফেসে ভাসছে মেল, চোখ জোড়া স্থির নিবদ্ধ ছাতের দিকে, এ দৃশ্য আর সহ্য হলো না জেমস হিদারিংটনের। সে ছুটে গেল ওয়াশ বেসিনে। তার জমজ ভাই জন বাচ্চাদের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে রক্তমাখা কার্পেটের ওপর, ডানে বায়ে দুলছে, গা থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে মেলের শরীরের রক্ত।

জেমস ছুটে গেল ফোনের কাছে। ৯৯৯ নম্বরে ডায়াল করল, তারপর একটু ভেবে রেখে দিল রিসিভার। আবার ফোন করল ও। তবে এবার অন্য জায়গায়।

প্রফেসর সিনক্লেয়ার বলছেন? জি, আমি জেমস হিদারিংটন। জি। ওকে পেয়েছি। তবে এবারে ওর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ। আপনি দয়া করে তাড়াতড়ি চলে আসুন।

বাথরুমে ফিরে এল জেমস। জনের মুখ দিয়ে যে শব্দগুলো বেরুচ্ছে। তার কথা সে কোনদিন ভুলবে না। সুন্দরী মেল, এখন তুমি আমার। তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এমনকী আমার। ওই বিশ্রী বড় ভাইটা জেমসও নয়।

আমি জীবনে কোনদিন প্রথম হতে পারিনি। সবসময় দ্বিতীয় হয়েছি। তবে এবারে আর নয়। সুন্দরী মেল, সুন্দরী...

দ্য মেন হু উড বি কিং – রাডিয়ার্ড কীপলিং

যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি তার শুরু একটি ট্রেনে। ট্রেনটি মাহা থেকে আজমীর যাচ্ছিল। পকেটে মালপানি কম ছিল বলে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী হয়েছিলাম আমি। মধ্যম শ্রেণীতে আরাম-আয়েশের কোন ব্যবস্থা নেই। নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন ছাড়া এতে কেউ যাতায়াতও করে না। আর আমি সেই শ্রেণীরই মানুষ। ভ্যাগাবন্ড টাইপের, কোন পিছু টান নেই, পেটে টান পড়লে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজটাজ জুটিয়ে নিতে পারি।

মধ্যম শ্রেণীতে এবারের ভ্রমণটা অবশ্য আমার কাছে আরামদায়কই মনে হচ্ছিল। কারণ নাসিরাবাদ পর্যন্ত কেউ আমার কমপার্টমেন্টে ওঠেনি, হাত-পা ছড়িয়েই আসতে পারছিলাম।

নাসিরাবাদ পৌঁছানোর পরে এক লোক উঠল। চেহারাসুরতে আমার মতোই ভ্যাগাবন্ড টাইপের। আর ভয়ানক বাক্যবাগীশ। ভারতবর্ষের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়ল সে যাত্রার শুরুতেই। আর এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে সে কথা বলতে ছাড়ল না। এক পর্যায়ে সে আমাকে ধরে বসল আজমীর থেকে ফেরার পথে আমি যেন অবশ্যই মারোয়ার জংশনে, বোম্বে মেইলের একটি কক্ষে উঁকি মেরে দেখি। কারণ সে তার জন্যে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে।

আমার সেই মেসেঞ্জার, বলল আমার নতুন যাত্রী, লাল দাড়িঅলা দীর্ঘদেহী পুরুষ। একটা সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে হাত-পা ছড়িয়ে তাকে ঘুমাতে দেখবেন আপনি। আপনার কাজ হবে তার কমপার্টমেন্টের জানালা খুলে সে হপ্তাখানেকের জন্যে দক্ষিণে চলে গেছে, এই কথাটি শুধু বলা। আপনার মায়ের কসম, কাজটা আমার জন্যে আপনি করবেন। তা হলে আমার খুব উপকার হবে।

সমস্যা হলো আমি সহজে কাউকে না বলতে পারি না। আর লোকটা যেভাবে আমাকে মিনতি করছিল, খারাপই লাগছিল বলা যায়। শেষে তাকে কথা দিতে বাধ্য হলাম, কাজটা আমি করব। সে খুশি হয়ে রাস্তার ধারে একটি ছোট স্টেশনে নেমে পড়ল। আর আমাকে নিয়ে ট্রেন ছুটে চলল আজমীরের দিকে।

আজমীরে কিছু কাজ ছিল আমার, সেগুলো সেরে নাইট মেইলে চড়ে রওনা হয়ে গেলাম গ্রেট ইন্ডিয়ান ডেজার্ট অভিমুখে। প্রতিশ্রুতি মাফিক নেমে পড়লাম মারোয়ার জংশনে। এখানে নেটিভদের তৈরি একটি রেলওয়ে। আছে, ট্রেন যোধপুর পর্যন্ত যায়। বোম্বে মেইল মারোয়ার জংশনে খানিক বিরতির জন্যে থেমে দাঁড়ায়।

বোম্বে মেইল এই স্টেশনে এসে থামা মাত্র আমি ক্যারিজের দিকে এগিয়ে গেলাম। ট্রেনে সাকুল্যে একটাই সেকেন্ড ক্লাস। আমি কমপার্টমেন্টের জানালা নামিয়ে দেখি লাল দাড়িঅলা এক লোক ট্রেনের কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দেখেই বুঝলাম এ সেই লোক।

তার বুকের খাঁচায় খোঁচা দিলাম আলতো করে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল লাল দাড়ি, ঘোত-ঘোত করতে করতে বলল, আবার টিকেট?

না, জবাব দিলাম আমি। আমি আপনাকে বলতে এসেছি সে হপ্তাখানেকের জন্যে চলে গেছে দক্ষিণে। কথাটা পুনরাবৃত্তি করলাম আবার জোরে।

এদিকে ট্রেন নড়তে শুরু করছে। লাল দাড়ি দুহাতে চোখ ঘষছে। সে হপ্তাখানেকের জন্যে চলে গেছে দক্ষিণে? কথাটা রিপিট করল সে। সে তো যাবেই। ওটাই তার কম্ম। ভালো কথা, সে কি কিছু দিতে বলেছে। আপনাকে? কিন্তু আমি দেব না।

না, বলেনি, বলে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকা ট্রেনের পেছনের লাল বাতি দুটির দিকে। ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে, বাতাস বালু ওড়াচ্ছে। আমি এবার নিজের ট্রেনে চড়ে বসলাম, তবে মধ্যম শ্রেণীতে নয়। লোকগুলোর ব্যাপারে আর কৌতূহল দেখালাম না। কিন্তু জানতাম না এদের সাথে আবার আমার অদ্ভুতভাবে দেখা হয়ে যাবে। এক আশ্চর্য গল্প জন্ম নেবে এ থেকে। সে কথাতেই এবারে আসছি।

শুরুতেই বলেছি আমি ভ্যাগাবন্ড, যখন পেটের টান পড়ে একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নিই।

এবার একটা খবরের কাগজে ফোরম্যানের চাকরি হলো আমার। একদিন ফোরম্যানের ডিউটি পালন করতে গিয়ে সেই লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই দুজন, যাদের এক জনের সাথে আমার ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

সেই লোকটি বেঁটেখাটো। তার সঙ্গী সেই লালদাড়ি। তবে ওদের দেখে আমি খুশি হতে পারলাম না। কারণ সারা রাত ডিউটির পরে এখন আমার ঘুমের সময়। এখন এদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া এরা আমার এমন ঘনিষ্ট কেউ নয় যে, এদের জন্যে ঘুম নষ্ট করতে হবে। অবশ্য এদের দেখে আমার এড়িয়ে যাবার চেষ্টার পেছনে একটা কারণও আছে। বেঁটে লোকটা, অর্থাৎ আমার ট্রেনের সেই সহযাত্রী ডেগুস্বরের রাজাকে ব্ল্যাকমেইল করার পরিকল্পনা করেছিল। সে ব্যাকউডসম্যান নামের পত্রিকায় ভুয়া সাংবাদিক সেজে কাজটা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তার পরিকল্পনার বাদ সাধি। ফলে ব্ল্যাকমেইলিং-এর প্ল্যান ভুল হয়ে যায় তার। এ কারণে আমার ওপর রাগ ছিল তার।

তাই তাকে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। অবশ্য অতীত প্রসঙ্গের ধারে কাছ দিয়েও গেল না সে। হয়তো নতুন ফন্দি এঁটেছে, আমার সাহায্য দরকার। আমার ধারণাই ঠিক। লাল দাড়ি বলল, তোমার কাছে এসেছি একটা সাহায্যের জন্যে। আগেই বলে রাখি, ডেগুস্বরের মতো কোনো ঘটনা যেন ঘটাতে যেয়ো না। তা হলে কিন্তু খবর আছে, হ্যাঁ।

জবাবে আমি কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম। এবার কথা বলল আমার ট্রেনের সঙ্গী, বেঁটেখাটো লালচুলো মানুষটা। বলল, কথা শুরুর আগেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে নিই। এ হলো আমার ভাই ড্যানিয়েল ড্রাভট আর আমি পিচি কার্নেহান। আমাদের পেশা সম্পর্কে যত কম মুখ খুলব। ততই মঙ্গল। তবে আমরা এমন কোনো কাজ নেই যা করিনি। সৈনিক, নাবিক, কম্পোজিটর, ফটোগ্রাফার, প্রুফরিডার, ফেরিঅলা, সাংবাদিক সব ধরনের পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আমরা সারা ভারতবর্ষ চষে বেরিয়েছি। বেশিরভাগ সময়ই পায়ে হেঁটে। তবে এ জীবন আমাদের আর ভালো লাগে না। তাই ঠিক করেছি রাজা হব।

রাজা হবে? অবাক হয়ে গেলাম আমি। বললেই রাজা হওয়া যায় নাকি?

অবশ্যই যায়। বলল ড্রাভট। রাজা হবার স্বপ্ন আমরা দেখে আসছি গত ছমাস ধরে। কোন দেশের রাজা হওয়া যায় সন্ধান পাবার জন্যে আমরা বই-পত্র, মানচিত্র সব ঘেঁটেছি। শেষে এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি, যেখানে আমাদের মতো করিকর্মা মানুষের পক্ষে রাজা হওয়া সহজ কাজ। জায়গাটার নাম হলো কাফিরিস্তান। যতদূর জানি এটা আফগানিস্তানের সর্বানে, পেশোয়ার থেকে তিন শ মাইল দূরে। ওখানে ম্লেচ্ছ লোকদের বাস। আমরা ওখানেই ঘাটি করব। পাহাড়ি এলাকা, আর মেয়েগুলো বেশ সুন্দরী।

কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের চুক্তির বাইরে। বলল কার্নেহান। মদ কিংবা মেয়েমানুষ স্পর্শ করা যাবে না, ড্যানিয়েল।

জানি সেটা। আমরা ওখানে গিয়ে অশিক্ষিত লোকগুলোকে সহজেই বশ করতে পারব। তারপর এক সময় রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেরাই রাজা হয়ে যাব।

আরে, সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ মাইল ভেতরে যেতে পার কিনা তাই। দেখ, ব্যঙ্গ করলাম আমি। স্রেফ কচু কাটা হয়ে যাবে। ওই দেশে পৌঁছুতে তোমাদের আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওখানে শুধু পাহাড় আর গ্লেসিয়ার। কোনো ইংরেজ আজতক আফগানিস্তান পাড়ি দিতে পারেনি। পাহাড়ি লোকগুলো ভয়ানক হিংস্র স্বভাবের। ওখানে যেতে পারলেও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুমি আমাদের পাগল ভাবতে পার, বলল কার্নেহান, তাতে বরং আমরা খুশিই হব। যাকগে আমরা যে জন্যে এসেছি তোমার কাছে সেটা শোন। তুমি আমাদের এই দেশটা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দাও। আর ওদের ম্যাপটা দেখাও। আমরা বইটই পড়তে পারি। তবে তোমার মতো শিক্ষিত নই।

আমি ওদের অনুরোধে ভারতের বিশাল ম্যাপটা খুলে বসলাম, দুটো ফ্রন্টিয়ার ম্যাপও দেখালাম। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে ইনফকান ভল্যুম পড়েও শোনালাম।

এই যে, এখানে, ম্যাপে বুড়ো আঙুল ঠেকাল ড্রাভট। জগদ্দালকের কাছে, পিচি আর আমি রাস্তাটা ভালো করেই চিনি। রবার্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলাম ওখানে। জগদ্দালক থেকে ডানে মোড় নিয়ে ল্যাংমান অঞ্চল দিয়ে এগোতে হবে। তারপর চৌদ্দ-পনেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড় পাড়ি দিতে হবে। ওখানে নিশ্চয়ই এ সময় খুব ঠান্ডা পড়বে। ম্যাপে দেখলে বোঝা যায় না জায়গাটা কতদূর।

দেশটা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে। বললাম আমি। নাও, ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইন্সটিটিউটের এই লেখাটা পড়।

কার্নেহান লেখাটা পড়ল। বলল, ড্যান, এ দেশে বেশিরভাগই দেখছি চেছে। তবে বইতে লিখেছে ইংরেজদের সাথেই ওদের সম্পর্ক রয়েছে।

ঠিক আছে, বলল ড্রাভট, যা জানার মোটামুটি জেনে নিয়েছি। এখন চারটে বাজে। তুমি ইচ্ছে করলে ঘুমিয়ে নিতে পার। ভয় নেই, তোমার কোনকিছু নিয়ে কেটে পড়ব না। কাল সন্ধ্যায় আমরা রওনা হয়ে যাব, ইচ্ছে করলে সেরাইতে এসো। দেখা হবে।

তোমরা আসলে পাগল হয়ে গেছ, বললাম আমি। ভালো চাইলে ফিরে এসো নইলে কপালে সত্যি দুর্গতি আছে তোমাদের।

তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। বলল ড্যান। ইচ্ছে হলে সেরাইতে এসো। না হলে নাই।

ওদের সাথে আর তর্ক করতে মন চাইল না। দুজনকে আমার অফিস রুমে রেখে বাড়ি ফিরে এলাম। খুব ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাতে হবে।

কুমহারসেন সেরাই হলো বড় একটা বাজার। এখানে উত্তর থেকে পণ্য নিয়ে উট আর ঘোড়ার দল আসে। পন্য খালাস হয়, পূর্ণ হয় সেরাই বাজারে। মধ্য এশিয়ার প্রায় সব জাতের মানুষের মিলন মেলা এ বাজার। তবে বেশিরভাগই ভারতের গ্রামের লোকজন। বলখ আর বোখারা এখানে মিলিত হয় বেঙ্গল এবং বোম্বের সাথে। এমন কোনো জিনিস নেই যা সেরাইতে পাওয়া যায় না। অনেক অদ্ভুত জিনিসও মেলে যা মানুষের কাজে লাগে না। আমি পরদিন বিকেলে এখানে এলাম দেখতে ওরা দুজন সত্যি সেরাইতে এসেছে নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে শুয়ে আছে বাড়িতে।

আমাকে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দুই শ্রীমানই ছদ্মবেশ নিয়ে হাজির হয়ে গেল সেরাইতে। একজন সেজেছে ধর্মযাজক, অন্যজন তার ভৃত্য। ছদ্মবেশি ধর্মযাজক অনেকগুলো মাটির খেলনা নিয়ে এসেছে। সেরাই-এর লোকজন তাকে দেখে হাসাহাসি শুরু করে দিল।

এক ঘোড়া ব্যবসায়ী আমাকে বলল, প্রীস্ট আসলে একটা পাগল। কাবুল যাচ্ছে আমিরের কাছে খেলনা বিক্রি করতে। হয় আমির ওকে খাতির করবেন নতুবা কল্লা নামিয়ে দেবেন। লোকটা আজ সকালে এসেছে। এসেই পাগলামী শুরু করে দিয়েছে।

আমি জবাবে কিছুই বললাম না। রাজপুতনার ঘোড়া ব্যবসায়ী ইউসুফ জাই হেঁড়ে গলায় বলল, ওহে, যাজক মশাই, কোত্থেকে এসেছেন আপনি, যাবেনই বা কোথায়?

এসেছি রোয়াম থেকে, হাতে একটা লাঠি বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিল প্রীস্ট। এসেছি অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে। তবে কোনো কিছুই আমাকে দমাতে পারেনি। যাব উত্তরে আমিরের কাছে। আমাকে কি কেউ সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। তা হলে তাকে আমি দোয়া করব। এমন দোয়া করব যাতে তার উটের দল কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। তার সন্তান কখনো অসুস্থ হবে না। স্ত্রী থাকবে বিশ্বস্ত।

হুজুর, ইউসুফ জাই বলল, দিন কুড়ির মধ্যে একটা ক্যারাভান রওনা হবে পেশোয়ার থেকে কাবুলের পথে। আমার উটের দলও যাবে তাদের সাথে। আপনি ইচ্ছে করলে যেতে পারেন।

আমার এখনই যাওয়া দরকার। হুংকার ছাড়ল প্রীস্ট। আমি আমার ডানাঅলা উটের পিঠে চড়ে এক দিনের মধ্যে পেশোয়ার পৌঁছে যেতে পারি। ওহে হাজার মির খান,

চেঁচাল সে তার চাকরকে উদ্দেশ্য করে, উটগুলো বের কর। তবে সবার আগে আমাকে চড়তে দাও।

পশুটা হাঁটু গেড়ে বসল, এক লাফে তার পিঠে উঠল প্রীস্ট, আমার দিকে ঘুরে হাঁক ছাড়ল, ইচ্ছে করলে আপনিও সঙ্গে আসতে পারেন, সাহেব। কিছুটা রাস্তা না হয় এক সাথে গেলাম। আপনাকে এমন এক কবচ দেব যা আপনাকে কাফিরিস্তানের রাজা বানিয়ে দেবে।

ভণ্ড প্রীস্ট আর কী করে দেখার আগ্রহ নিয়ে ওর সাথে উঠের পিঠে চড়ে বসলাম। সেই থেকে বেরিয়ে একটা খোলা রাস্তায় এসে বাহনের রাশ টেনে ধরল প্রীস্ট।

বুদ্ধিটা কেমন বের করেছি, বল তো? বলল সে ইংরেজিতে। কার্নেহান ওদের ভাষা জানে না। তাই ওকে আমার চাকর বানিয়ে দিয়েছি। আমরা এরপর একটা ক্যারাভান ধরব পেশোয়ারের, জগদ্দালক পর্যন্ত যাব, তারপর ঘোড়া বা গাধা যা-ই পাই, ওতে চড়ে ঢুকে পড়ব কাফিরিস্তানে। আমিরের জন্যে জিনিস নিয়ে যাচ্ছি বটে। একবার বস্তাগুলোয় হাত বুলিয়েই দেখ না।

আমি বস্তায় হাত দিতেই মার্টিনির একটা বাট ঠেকল, তারপর একটা, তারপর আরো একটা।

মোট বিশটা বন্দুক, গর্বের সাথে বলল ড্রাভট।

লাটিম আর মাটির পুতুলের নিচে লুকিয়ে প্রচুর গোলাবারুদও নিয়ে যাচ্ছি।

একবার এই জিনিস নিয়ে ধরা পড়লে তোমাদের কিন্তু খবর হয়ে যাবে, বললাম আমি। পাঠানদের কাছে একটা মার্টিনির মূল্য তাদের নিজের ওজনের সমান রুপোর মতো।

শোন, বহু কষ্টে যোগাড় করা পনেরো শ রুপী এই উট দুটোর পেছনে ব্যয় করেছি, বলল ড্রাভট। কাজেই সহজে ধরা পড়ছি না। আমরা খাইবার গিরিপথ ধরে যাব রেগুলার ক্যারাভানের সাথে। একজন গরিব প্রীস্টকে কে সন্দেহ করবে বা ঘাটতে আসবে?

যা যা চেয়েছিল সব পেয়েছ? জানতে চাইলাম আমি।

সব পাইনি, তবে পেয়ে যাব। কবে আবার দেখা হবে জানি না, দোস্ত। তাই তোমার স্মৃতি হিসেবে কিছু দাও আমাকে। তোমাকে আমার সত্যি ভালো লেগেছে।

আমি ঘড়ির চেইন থেকে কম্পাসটা খুলে ড্রাভটকে দিলাম। সে খুব খুশি হলো। আন্তরিকতার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, বিদায়, কার্নেহান, দোস্তের সাথে হাত মিলাও।

দ্বিতীয় উটে ছিল কার্নেহান। সে-ও আমার সাথে হাত মিলাল। তারপর দুজনে মিলে অদৃশ্য হয়ে গেল ধূলি ধূসরিত পথে। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা যে ছদ্মবেশ নিয়েছে তাতে ধরা পড়ার ভয় ক্ষীণ। সেরাইতেই এর প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করেই কার্নেহান এবং ড্রাভট আফগানিস্তানে ঢুকতে পারবে। তবে কোনোভাবে যদি ধরা পড়ে যায় তা হলে ওদের কপালে কঠিন মৃত্যু লেখা আছে।

দিন দশেক পরে আমার স্থানীয় এক বন্ধুর চিঠি পেলাম পেশোয়ার থেকে। সে লিখেছে, এক পাগলা প্রীস্টের কান্ডকারখানায় এখানে দিন কয়েক মানুষজন খুব হাসাহাসি করেছে। এই লোক জপমালা নিয়ে যাচ্ছে বোখারার আমিরের কাছে বিক্রি করতে। সে কাবুলগামী এক ক্যারাভানের সঙ্গী হয়েছে পেশোয়ার থেকে। অবশ্য ব্যবসায়ীরা তাকে সাথী হিসেবে পেয়ে অখুশি নয়। কারণ এরা সবাই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা একজন ধর্মযাজক সাথে থাকলে রাস্তায় বিপদ-আপদ হবে না।

ওরা হয়তো এত দিনে সীমান্ত ছাড়িয়েছে, ভাবলাম আমি। তবে ওদের নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় হলো না। কারণ ওই সময় ইউরোপের একজন রাজা মারা যাবার কারণে সেই খবর নিয়ে খবরের কাগজের আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

.

সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। রাত গড়িয়ে দিন হয়, কালের আবর্তে বদলায় ঋতু। গ্রীষ্ম শেষে শীত আসে, তারপর বসন্ত...এভাবে যায় সময়। চাকরিতে দেখতে দেখতে দুবছর হয়ে গেল আমার। এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলেন, আমার প্রেসের যন্ত্রগুলো আরো জীর্ণ হলো, অফিসের বাগানের গাছগুলো লম্বায় আরো খানিকটা বাড়ল।

একদিন, বেলা তিনটার দিকে অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ছাপা বন্ধ হুকুম দিয়ে অফিসে ঢুকেছি আমি, দেখি একলোক শরীরটা ঝুঁকিয়ে কাঁধের মধ্যে মালা ঢুকিয়ে মৃদু-মৃদু দুলছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইল সে, ফিসফিস করে বলল, আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দিতে পার? ঈশ্বরের দোহাই, তেষ্টায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

আমি ঘরের বাতি জ্বেলে দিলাম।

আমাকে চিনতে পারছো না? ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে, মুখ দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল। আলোতে এবার তার মুখটা দেখতে পেলাম। মাথার চুল ধূসর, চেহারা ভীষণ বিবর্ণ। চেনা-চেনা লাগল আগন্তুককে, কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলাম না।

তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না, হুইস্কির গ্লাসটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তোমার জন্যে কী করতে পারি?

তরল আগুনটা এক ঢোক গিলল সে, এত প্রচণ্ড গরমেও কেন জানি শিউরে উঠল।

আমি চলে এসেছি, বলল সে, আমি রাজা ছিলাম কাফিরিস্তানের আমি এবং ড্রাভট – মুকুট পরা রাজা! এই অফিসে শলা পরামর্শ করেছিলাম আমরা–তুমি ওখানে বসেছিলে, আমাদের হাতে বই দিয়েছ। আমি পিচি পিচি টালিয়াফেরো কার্নেহান, তুমি এখনো এখানেই পড়ে আছ–ওহ্! লর্ড!

এবার আর ওকে চিনতে কষ্ট হলো না। অবাক ভাবটা গোপন করে ওকে সহানুভূতি জানাবার চেষ্টা করলাম।

ঘটনা সত্য, কর্কশ গলায় বলল কার্নেহান, ছেঁড়া তেনায় ব্যান্ডেজ করা পায়ে হাত বোলাচ্ছে। বাইলেলের মতোই সত্য ঘটনা। আমরা রাজা হয়েছিলাম, মাথায় রাজমুকুটও পরেছি-আমি এবং ড্রাভট-বেচারা ড্যান–আহা, বেচারা, কখনো আমার পরামর্শ নিতে চাইত না, শত অনুরোধ। করলেও!

হুইস্কিটা শেষ কর, বললাম আমি। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে সম্ভব হলে পুরো ঘটনা আমাকে খুলে বল। তোমরা সীমান্ত পার হয়েছ জানতাম। ড্রাভট পাগলা গ্রীস্টের ছদ্মবেশ নিয়েছিল, তুমি সেজেছিলে তার চাকর। মনে। আছে?

আমি এখানে পাগল হইনি–তবে হয়তো শ্রীঘই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে। আমার। সব মনে আছে আমার। সব বলব তোমাকে। আমার চোখের দিকে তাকাও। নইলে হয়তো উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করব আমি।

আমি ওর দিকে তাকালাম। কার্নেহান একটা হাত রাখল টেবিলের উপর, কব্জিটা ধরলাম আমি। পাখির থাবার মতো কুঁচকে গেছে হাতের চামড়া, উল্টোপিঠে হীরের ছাপের দগদগে, লাল ঘা।

ওদিকে না। আমার চোখের দিকে তাকাও। বলল কার্নেহান।

এ ব্যাপারটা পরে ব্যাখ্যা করব তোমাকে। তবে ঈশ্বরের দোহাই, আমার মাথার গোলমাল করে দিও না। আমরা ওই ক্যারাভানের সাথে রওনা হয়ে যাই, আমি এবং ড্রাভট। সাথের লোকজনদের ভেড়া বানিয়ে রাখার জন্যে নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলাম দুজনে। সেগুলো বেশ কাজেও লেগেছে। ড্রাভট সন্ধ্যাবেলায় মজার মজার গল্প বলে সবাইকে খুব আনন্দ দিত। একবার হাসতে-হাসতে তো ড্রাভটের লম্বা দাড়িতে আগুনই ধরে গিয়েছিল। সে নিয়েও কত হাসাহাসি।

তোমরা তো জগদ্দালক পর্যন্ত গিয়েছিলে, বললাম আমি।

ওখান থেকে কাফিরিস্তানে ঢুকলে কী করে?

না, জগদ্দালকে আমরা যাইনি। ওদিকে রাস্তাঘাট ভালো শুনলেও পরে দেখি উট চলার মতো ভালো নয়। আমরা ক্যারাভান ছেড়ে একা এগোবার সময় ড্রাভটের পরামর্শে স্থানীয় স্ট্রেচ্ছদের ছদ্মবেশ নিই। ড্রাভট বলেছিল কাফিররা পাদ্রী বা ধর্মযাজকের ছদ্মবেশ পছন্দ নাও করতে পারে। আমরা এমনকি মাথাও কামিয়ে ফেলি। ওই দেশটা ছিল পর্বত সঙ্কুল, খাড়া চড়াই উত্রাই পার হতে পারছিল না আমাদের উট দুটো। শেষে উট দুটোকে মেরে ফেলতে হয়। আমরা উটের মাংসও খেয়েছি। শেষে এত অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে কি করব ভেবে যখন দিশা পাচ্ছিলাম না, এমন সময় দেখলাম দুটো লোক চারটে খচ্চর নিয়ে আসছে। ড্রাভট ওদের কাছে গিয়ে বলল, আমার কাছে খচ্চরগুলো বিক্রি করে দাও। তখন একজন বলল, খচ্চর কেনার টাকা যখন তোমাদের আছে, বোঝাই যাচ্ছে তোমরা বেশ ধনী। এই বলে সে ডাকাতি করার চেষ্টায় ড্রাভটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ড্রাভট ওকে ধরে এমন আছাড় দেয়, এক আছাড়েই সে শেষ। বাকি লোকটা সঙ্গীর অমন দশা দেখে চো চো দৌড় দেয়। আমরা তখন খচ্চরের গায়ে অস্ত্রের বোঝা চাপিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে দিই।

এ পর্যন্ত বলে কার্নেহান বিরতি দিল। আমি ওকে আরেক গ্লাস হুইস্কি। ঢেলে দিলাম। জানতে চাইলাম ও দেশের প্রকৃতির কথা তার কিছু মনে আছে কি না।

যতটুকু মনে আছে বলছি, শুরু করল কার্নেহান। তবে আমার মাথাটা তেমন কাজ করছে না। ওরা আমার মাথায় পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বোঝাতে ড্রাভটের মৃত্যু আরও কত

ভয়ঙ্কর ছিল। দেশটার চারদিকে ছিল পাহাড়, লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত, ছিল নিঃসঙ্গচারী। আমরা একটার পর একটা পাহাড় পাড়ি দিতে থাকি। জোরে কথা বলার সাহসও ছিল না। তখন ছিল শীতকাল। ভয় হত পাহাড় ধসিয়ে কখন হিমবাহ নেমে আসে গায়ের ওপর। কিন্তু বেপরোয়া ড্রাভট চুপ করে থাকার পাত্র নয়। সে বলত, একজন রাজাকে চুপ করে থাকা মানায় না। তাকে অবশ্যই গান গাইতে হবে। সে খালি খচ্চরের পাছায় লাথি মারত আর ক্রমাগত পথ চলত। অমন ভীষণ-ঠান্ডার মধ্যেও কোথাও থামেনি সে। ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে খচ্চরগুলোর অবস্থা মরো-মরো হয়ে যায়। আমরা পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় ঢোকার পরে খচ্চরগুলো মেরে ফেলি। তবে ওগুলোকে দিয়ে উদরপূর্তির উপায় ছিল না। ওদিকে এত জিনিসপত্র নিয়ে কীভাবে পথ চলবে ভেবে না পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র ভরা বাক্সের ওপরেই বসে থাকি, আগডুম বাগডুম চিন্তা করতে থাকি।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। দেখলাম জনা দশেক লোক, হাতে তীর ধনুক, দৌড়ে আসছে উপত্যকা দিয়ে। লোকগুলোর চুলের রঙ হলুদ, সুঠাম শরীর। তাদেরকে ধাওয়া করছে কমপক্ষে বিশ জনের একটা দল। ড্রাভট বলল সে দশ জনের দলটার পক্ষ নেবে। তারপর দুহাতে দুই রাইফেল নিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে গুলি করতে লাগল। গুলি করে একজনকে ফেলে দিল ড্রাভট। তারপর একের পর এক ওদের গুলি করতে লাগলাম দু জনে মিলে। ওদের বেশিরভাগ গুলি খেয়ে মারা গেল, বাকিরা পালাল প্রাণ ভয়ে। আমাদের রণংদেহী মূর্তি দেখে দশ জনের ওই দলটাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের দিকে এগোতে তারা আমাদের লক্ষ করে তীর ছুঁড়তে লাগল। ড্রাভট তখন

ওদের মাথার ওপরে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। ভয় পেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল মাটিতে। ড্রাভট ওদেরকে লাথি মেরে দাঁড় করাল। তারপর সবার সাথে হাত মিলিয়ে বুঝিয়ে দিল আমরা ওদের শত্রু নই, বন্ধু। ওদের হাতে গোলাবারুদের বাক্সগুলো তুলে দিল ড্রাভট বহন করার জন্যে, এমনভাবে নির্দেশ দিল যেন ইতোমধ্যে রাজা বনে গেছে সে।

বাক্সগুলো নিয়ে ওরা উপত্যকা ধরে পাহাড়ের ওপরে একটা পাইনের বনে ঢুকল, ওখানে পাথরের তৈরি বড়-বড় বেশ কয়েকটা মূর্তি।

ওই দশ জনের দলে সবচে বলিষ্ঠ এবং লম্বা লোকটির নাম ছিল ইমব্রা, সে দলপতি। ইব্রা নিজের নাকের সাথে ড্রাভটের নাক ঘষে আনুগত্য প্রকাশ করল। এরপর তারা ড্রাভটের জন্য খাবার নিয়ে এল। কিন্তু ওদের দেয়া প্রত্যেকের খাবার সে প্রত্যাখ্যান করল। শেষে গ্রাম থেকে যখন ধর্মযাজক এবং মোড়ল খাবার নিয়ে এল, ড্রাভট সেই খাবারটা খেল। ওরা আমাদের বোধহয় দেবতাটেবতা কিছু ভেবেছিল। মনে করেছে আকাশ। থেকে ছিটকে পড়েছি।

বুঝলাম সবই, বললাম আমি। তা রাজা হলে কী করে?

আমি রাজা হইনি, বলল কার্নেহান। রাজা হয়েছিল ড্রাভট। ড্রাভটের মাথায় সোনার মুকুট খুব মানিয়ে গিয়েছিল। সে প্রতিদিন সকালে ইমব্রাকে সাথে নিয়ে বসে থাকত, গ্রামবাসী এসে তাকে পুজো করত। এটা ছিল ড্রাভটের আদেশ। একবার একদল দস্যু গ্রাম

আক্রমণ করে। আমরা এমনভাবে গুলি ছুঁড়তে শুরু করি যে ওরা পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এভাবে একের পর এক গ্রামে আমরা আমাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকি। গ্রামে কোনো সমস্যা হলেই গ্রামবাসী সমাধানের জন্য আসত। ড্রাভটের কাছে। ড্রাভট সব সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দিত। সে একাই ছিল বিচারপতি। ড্রাভট বলত তার আদেশ না মানলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। অশিক্ষিত গ্রামবাসী আমাদের ভয়ে তাই সব সময় থর থর করে কাঁপত।

আমরা এক-এক করে অনেকগুলো গ্রামে ভয়-ভীতি দেখিয়ে এবং নানা কৌশল খাঁটিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকি। একবার বরফ ঢাকা এক গ্রামে লোকজন কেউ ছিল না, কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া। ওরা আমাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমরা ওদের আরও ভয় পাইয়ে দিতে গুলি করি। তারপর পাশের গ্রামে চলে যাই।

ওই গ্রামের গ্রাম প্রধান প্রথমে বীরত্ব দেখাতে চাইলেও পরে আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আমরা কিছু গ্রামবাসীকে ড্রিল, মার্চপাস্ট ইত্যাদিও শিখিয়েছিলাম। বেশিরভাগ লোকজন আমাদের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। এদিকে আমাদের সাম্রাজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

আমরা শেষের দিকে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। কয়েকটি গ্রাম শাসন করত ড্রাভট, আমি করতাম বাকিগুলো। তবে আমার একার পক্ষে এই বিশাল রাজ্য শাসন

করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমি ড্রাভটকে আমার সমস্যার কথা লিখে জানাই, বলি সে যেন এই রাজ্যভার গ্রহণ করে। তারপর আমি প্রথম উপত্যকায় ফিরে যাই প্রীস্টরা কী করছে দেখতে। ওই গ্রামের নাম ছিল এরহেব। এরহেবের প্রীস্টরা কাজ কাম ভালোই করছিল। তবে তারা অভিযোগ করল, পাশের গ্রাম থেকে নাকি মাঝে-মাঝে রাতের বেলা তীর ছুঁড়ে মারা হয়। আমি ঐ গ্রামে ঢুকে পরপর চার রাউন্ড ফায়ার করে এলাম। সাবধান করে দিলাম যাতে আর কেউ কেরানি দেখানোর সাহস না পায়।

কিছুদিন পরে, একদিন সকালে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ড্যান ড্রাভটের আগমন ঘটল আমাদের আস্তানায়। পাহাড় থেকে রীতিমতো মার্চ করে এল সে, সঙ্গে শতাধিক মানুষ। অবাক হয়ে গেলাম, ওর মাথায় চকচক করছে ভারী স্বর্ণ-মুকুট।

মাই গড, কার্নেহান, বলল ড্রাভট, দারুণ কাজ হচ্ছে হে। গোটা দেশের মালিক এখন আমরা। আমার পরিচয় এখানে রানী সেমিরামিসের। পুত্র আলেকজান্ডার, আর তুমি আমার ছোট ভাই এবং একজন দেবতাও। আমি গত ছয় হপ্তা ধরে লড়াই করেছি। সবগুলো লড়াইতে জিতেছি। ওদের রাজা বনে গেছি। তোমার জন্যেও একটা রাজমুকুট এনেছি। শু নামের একটা জায়গায় বসে ওরা সোনার মুকুট জোড়া বানিয়েছে। ওখানে পাহাড়ের নিচে সোনা থকথক করছে, মাংসের মধ্যে চর্বির মতো। আর আছে মহামূল্যবান রত্ন, পাথরের খাঁজে-খাঁজে। নদীর বালুতে প্রচুর খনিজও দেখলাম। এই যে দেখ এক লোক আমার জন্যে অম্বর নিয়ে এসেছে। যাও, সব প্রীস্টদের ডেকে নিয়ে এস। তোমার মাথায় এখন মুকুট পরানো হবে।

এক লোক একটা কালো ব্যাগ খুলে মুকুটটা বের করল। মুকুটটা ছোট কিন্তু খুব ভারী। কমপক্ষে পাঁচ পাউন্ড ওজন হবে, ব্যারেলের ঢাকনির মতো দেখতে।

পিচি, বলল ড্রাভট, আমরা আর মারামারির মধ্যে যেতে চাই না। তারপর সে আমার সাথে বিলি ফিশের হাত মিলিয়ে দিল। বিলি হলো বাষকাই গ্রামের মোড়ল। ওর নাম আমরাই দিয়েছি বিলি ফিশ। ও পরে আমাদের সবচে বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে ওঠে।

ড্রাভট বলল, কমপক্ষে চল্লিশ জন গ্রাম্য মোড়ল আমার অধীনে। আমরা ওদের নিয়ে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারব।

এরপর ড্রাভট বলল গ্রাম প্রধান এবং প্রীস্টদের সে বড় একটা সম্মেলন করবে। ইমব্রার মন্দিরটা আপাতত প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করবে, জানাল সে।

ড্রাভটের ধৈর্য কম। আর সে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি পেতে চায়। সে। সেইরাতেই গ্রামের লোকজন নিয়ে পাহাড়ের পাশে আগুন জ্বালিয়ে সম্মেলনের ব্যবস্থা করল। ড্রাভট আমাদের পরিচয় দিল দেবতা হিসেবে, বলল আমাদের পূর্বপুরুষরা জাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। বলল আমরা এখানে এসেছি কাফিরিস্তানকে এমন একটি দেশে পরিণত করতে যেখানে মানুষ কখনো না খেয়ে থাকবে না। অনাহারে মরবে না, সবাই সুখে শান্তিতে বাস করবে।

বেশ গুরুগম্ভীর একটা বক্তৃতা দেয়ার পরে গ্রাম্য প্রধানরা শ্রদ্ধা জানাতে একে-একে এল আমাদের সাথে হাত মেলাতে। ওদের একেক জনের নাম দিলাম আমরা বিলি ফিশ, হলি ডিলওয়ার্থ, পিক্কি কেরগান ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে সবচেয়ে অবাক করা ঘটনাটা ঘটল পরদিন রাতে, মন্দিরে। বুড়ো বটগাছের মতো প্রাচীন ধর্মযাজকরা তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের লক্ষ করে চলছিল। আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল ভেবে এরা যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে আমাদের সবই বুজরুকি, তা হলে না জানি কি দশা হবে। তবে ভাগ্যই বলতে হবে তেমন কিছু ঘটল না।

ড্রাভট গ্রামের মেয়েদের হাতে বানানো বেশ দামি একটি আলখেল্লা পরে বড় একটা পাথরের ওপর বসল। ওরা এটাকে বলে স্টোন অভ ইমব্রা। বাশকাই গ্রামের সবচে বুড়ো প্রীস্ট লোকটা কেন যেন পাথরটাকে উল্টে দেয়ার চেষ্টা করছিল। না পেরে শেষে ওটার তলা ঘষতে থাকে হাত দিয়ে। ধুলো আর মাটি সরে গিয়ে পাথরের গায়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে একটা চিহ্ন। কাকতালীয় ব্যাপারটা আমাদের জন্যে যেন সাপে বর হয়ে দাঁড়াল। ড্রাভট আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আবার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। প্রীস্টরা বলছে এটি নাকি একটি হারানো চিহ্ন। এর অর্থ এদের কারো জানা নেই। এখন বরং আমাদের দুশ্চিন্তা আরও কমল। আমরা যে দেবতা এই বিশ্বাসটা ওদের ভেতরে এবার বদ্ধমূল হবে। তারপর খামোকাই বন্দুকের বাট দিয়ে পাথরে একটা বাড়ি মারল ড্রাভট, তারপর গ্রামবাসীদের দিকে ফিরে বজ্র নির্ঘোষে বলতে

লাগল, মহাপুরুষদের যে আর্শীবাদ রয়েছে আমার ওপর তার ওপর নির্ভর করে এবং পিচির পক্ষে আমি ঘোষণা করছি, কাফিরিস্তানের সকল ফ্রি মিসোনারীর রাজা আজ থেকে আমি এবং পিচি। এই বলে মাথায় মুকুট পরল সে, আমার মাথায়ও চাপিয়ে দিল একটা। তারপর বলল, আগামী সে মাসের মধ্যে আমরা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করব। দেখব তোমরা কে কীভাবে কাজ করছ।

পরবর্তীকালে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে অনেক কাজ করলাম। আমি গ্রামবাসীদের চাষাবাদ শেখালাম, কীভাবে দড়ির ব্রিজ তৈরি করতে হয় শেখালাম। বড়-বড় গিরিখাদের মাঝখানে সেতুগুলো ঝুলান হলো।

ড্রাভট আমার কাজে সন্তুষ্টই ছিল। তবে আমার কোনো পরামর্শ সে কানে তুলত না, নিজের মর্জি মাফিক চলত। অবশ্য লোকের সামনে ও আমাকে কখনো অসম্মান করেনি। লোকজন ভয় পেত আমাদেরকে। ভয় পেত আমাদের নিজের হাতে গড়া সেনাবাহিনীকে। তবে ওরা ড্রাভটকে ভালও বাসত। প্রীস্ট আর গ্রাম প্রধানদের সাথে দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ড্রাভটের। পাহাড়ের ওপরে থেকে কেউ নালিশ নিয়ে এলে চার প্রীস্টের কাছে পরামর্শ চাইত ড্রাভট, কী করা যায় সে ব্যাপারে। এরা ছিল বাশকাইর বিলি ফিশ, শু-র পিচি কেরগান, কাফুজেলামের এক গ্রাম প্রধান এবং মাডোরার প্রীস্ট। গ্রামে যদি মারপিট বেধে যেত তার সমাধান দিত এই চার প্রীস্টই।

আমার কাজ ছিল দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। কমপক্ষে পাঁচ শ মানুষকে আমি ড্রিল করা শিখিয়েছি, দুশ জনকে অস্ত্র বাহন করতে শিখিয়েছি। হাতে তৈরি গাদা বন্দুক তাদের কাছে আজব বস্তু বলে মনে হত। ড্রাভট স্বপ্ন দেখত এক সময় বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে সে, একদিন গোটা পৃথিবীর মালিক হয়ে বসবে।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। রাজা হবার স্বপ্ন দেখেছিল ড্রাভট, এখন সে সম্রাটের সমান ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলায় বলে একটা কথা আছে, ঠিক সেটাই একদিন ঘটল ড্রাভটের জীবনে, আর তার সব কাজের সাগরেদ ছিলাম বলে একই নিয়তির শিকার হতে হলো আমাকেও।

আমরা যাত্রা শুরুর আগে একটা চুক্তিপত্র করেছিলাম। তাতে দ্বিতীয় ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ ছিল আমরা কখনোই সাদা কিংবা বাদামী কোনো নারীর দিকে নজর দেব না। কিন্তু সেই শর্তের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ড্রাভটের মনে বিয়ের শখ চাগিয়ে উঠল। বলল, আমি বিয়ে করতে চাই পিচি, এদেশের মেয়েগুলো ইংরেজ মেয়েদের চেয়েও সুন্দরী। তবে শুধু আমিই সুখ ভোগ করব কেন? তুমিও বিয়ে করবে, পিচি। তোমাকেও সুন্দরী একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দেব।

আমাকে লোভ দেখিও না।বললাম আমি। নারী সঙ্গের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আরে আমি তো স্রেফ বিয়ে করার জন্যে বিয়ে করব না, বলল ড্রাভট। আমার চাই একজন রানী যে আমাকে পুত্র সন্তান উপহার দেবে। হবে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা। আমার জন্যে সবচেয়ে শক্তিশালী উপজাতিদের মাঝ থেকে কনে খুঁজে আনবে, পিচি। এই শীতেই আমি বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চাই।

আমি ড্রাভটকে বোঝাতে চাইলাম, বললাম মেয়েরা বিশ্বসঘাতিনী হয়, কোনো মেয়ে আমার সাথে কবে ভালবাসার অভিনয় করে দাগা দিয়ে গেছে এবং সে-ক্ষত আমার এখনো শুকায়নি, সে গল্পও শোনালাম। বললাম, তোমাকে মিনতি করছি, ড্যান। এমন কিছু করতে যেয়ো না। তা হলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। বাইবেলে বলেছে, রাজাবাদশারা তাদের সময় নারীদের পেছনে নষ্ট করতে পারবে না, বিশেষ করে যে রাজার রয়েছে। নতুন রাজ্য গঠনের গুরু দায়িত্ব।

আমি যা বলেছি তাই করব, গম্ভীর গলায় কথাটা বলে পাইনের বনে গেল ড্রাভট পায়চারী করতে। এখানে হাঁটাহাটি করার সময় সে সব মাস্টার প্ল্যান করে।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। তবে ড্যান যতটা সহজ ভেবেছিল কনে খুঁজে পাওয়া ততটা সহজ মোটেই হলো না। পরিষদ সভা ডাকল ড্যান ড্রাভট, নিজের বিয়ের প্রস্তাব রাখল সেখানে। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলল না, বলা ভালো খুলতে চাইল না। শুধু বিলি ফিশ বলল, সে মেয়েদের জিজ্ঞেস করে দেখবে। শুনে ভয়ানক ক্ষেপে গেল ড্রাভট। আমার দোষটা কোথায়?খ্যাক-খ্যাক করে উঠল সে। আমি বাঘ না ভালুক যে মেয়েদের

খেয়ে ফেলব। বরং তোমাদের ফালতু মেয়েছেলেদের চেয়ে আমার জায়গা অনেক উঁচুতে। আমি কি এই দেশটাকে ছায়ার মতো আগলে রাখছি না? গতবার আফগানদের হামলা থেকে কে বাঁচিয়েছিল তোমাদের? (আসলে কাজটা করেছিলাম আমি, রাগের চোটে ড্রাভট ভুলে গেছে সে কথা।) কে তোমাদের জন্য বন্দুকের ব্যবস্থা করে দিয়েছে? কে তোমাদের ভাঙা সেতু নির্মাণ করেছে? সমানে এভাবে গাঁক গাঁক করেই যেতে লাগল সে। বিলি ফিশসহ অন্যান্যরা চুপ হয়ে রইল।

পরে আমি বিলি ফিশকে একান্তে ডেকে নিয়ে শুধালাম, সমস্যাটা কী, বিলি ফিশ? আমাকে সত্যি কথাটা বল তো?

আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, বলল বিলি ফিশ। আমাদের মেয়েরা কী করে একজন দেবতা বা শয়তানকে বিয়ে করবে? এটা মোটেই উচিত হবে না।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওরা আমাদের দেবতা জ্ঞান করে। এখন ভুলটা ভেঙে দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই বললাম, একজন দেবতা যা খুশি করতে পারে। রাজা যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ করেন তা হলে তিনি আর তাকে মরতে দেবেন না।

তাকে অবশ্যই মরতে হবে, দৃঢ় গলায় বলল বিলি ফিশ। এই পাহাড়ে আরও অনেক দেবতা এবং শয়তান আছে। এদেরকে যে মেয়ে বিয়ে করছে পরবর্তীতে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, আপনারা দুজনেই পাথরের সেই কাটা চিহ্ন রহস্যের

কথা জানেন। দেবতা ছাড়া মানুষের পক্ষে ওই রহস্য জানা সম্ভব নয়। আমরা আপনাদের শুরুতে মানুষই ভেবেছিলাম। কিন্তু ওই পাথরের চিহ্ন দেখার পর থেকে জানি আপনারা মানুষ নন, দেবতা।

আমি আর বলার মতো কথা খুঁজে পেলাম না। সে রাতে আমার ঘুম হলো না দুশ্চিন্তায়। বারবার মনে হচ্ছিল ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের জীবনে।

সে রাতে পাহাড়ের ওপরের ছোট্ট মন্দিরটা থেকে বারবার ভেসে এল শিঙা ফোকার আওয়াজ। শুনলাম গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে। পরে শুনেছি রাজাকে বিয়ে করার জন্যে ওই মেয়েটিকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল এ কারণে সে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল।

ড্যান অবশ্য অত কথা শুনতে চাইল না। সে সাফ-সাফ বলে দিল, আমি অমন ভীতু মেয়ে চাই না, তবে তোমাদের রীতিনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছেও আমার নেই। প্রয়োজনে আমি নিজেই মেয়ে বেছে নেব।

মেয়েটা আসলে একটু ভয় পেয়েছে, বলল এক প্রীস্ট। তার ধারণা হয়েছে সে মরে যাবে।

আগামী কাল সকালের মধ্যে মেয়ে যোগাড় করে না আনতে পারলে তোমরাও কেউ বাঁচতে পারবে না, গরগর করে উঠল ড্রাভট। প্রীস্টকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিল ড্রাভট। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে বেড়াল পরদিন সকালের সুখ-কল্পনাকে আশ্রয় করে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। তখন ড্রাভট অবশ্য ঘুমে অচেতন। দেখি গ্রামের প্রায় সব প্রীস্ট এসে হাজির হয়েছে, গ্রাম প্রধানরাও রয়েছে সঙ্গে, ফিসফিস করে কী যেন বলছিল তারা, আমাকে আড়চোখে লক্ষ করল।

কী হয়েছে, ফিশ? বাশকাই গ্রাম প্রধানকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ঠিক বলতে পারব না।, জবাব দিল বিলি ফিশ। তবে রাজাকে এই পাগলামী ছাড়তে বলুন। না হলে ঘোর বিপদে পড়তে পারেন তিনি। ভাবগতিক তেমন সুবিধের ঠেকছে না আমার কাছে। অবশ্য জনা বিশেক লোক নিয়ে এসেছি সাথে। ওরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু অন্যদের কথা বলতে পারছি না। তাদের মধ্যে বিক্ষোভের আলামত পাচ্ছি। ঝড় শেষ হবার সাথে-সাথে আমরা বাশকাই ফিরে যাব।

রাতের বেলা তুষার ঝড় হয়েছে। এখানে জোর বাতাস বইছে। গোটা প্রকৃতি ঢেকে গেছে সাদা বরফে। আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা। দেখলাম ড্রাভট বেরিয়ে এল তার ঘর

থেকে, মাথায় সোনার মুকুট, টলছে সে, হাত দোলাতে-দোলাতে এগিয়ে এল আমার কাছে।

শেষ বারের মতো বলছি তোমাকে, ড্যান, ফিসফিস করে করলাম আমি, এসব ছাড়ান দাও। বিলি ফিশ বলছে ঝামেলা হতে পারে।

আমার লোক ঝামেলা করবে? তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল ড্রাভটের কণ্ঠে প্রশ্নই ওঠে না। তুমি তো মস্ত বোকা, পিচি। বিয়ে করার এমন সুযোগ পেয়েও হারালে। যাকগে, মেয়েটা কোথায়? সব প্রীস্ট আর মোড়লদের নিয়ে এসো, সম্রাট নিজের চোখে দেখতে চায় কনেকে তার সাথে মানাবে কি না।

অবশ্য কাউকে ডেকে পাঠানোর দরকার ছিল না। সবাই এসেছে এবং পাইনের বনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় যে যার বন্দুক এবং বর্শার ওপর। ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। একদল প্রীস্ট গিয়েছিল মন্দির থেকে মেয়েটিকে নিয়ে আসতে।

বিলি ফিশ তার কুড়ি জন সশস্ত্র মানুষ নিয়ে রাজার পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি দাঁড়ালাম ড্রাভটের পাশে। আমার পেছনেও বিশ জনের সশস্ত্র একটা দল। ওরা রুপোর গহনা আর মূল্যবান রত্ন পরা একটি মেয়েকে নিয়ে এল। মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু ভয়ে সাদা হয়ে আছে মুখ। সে বারবার পেছন ফিরে প্রীস্টদের দিকে তাকাচ্ছিল।

একে দিয়েই চলবে, মেয়েটার আপাদমস্তক দেখে বলল ড্যান। আমাকে এত ভয় কিসের সুন্দরী? এসো, চুমু খাও। সে মেয়েটির গলা জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি সভয়ে চোখ বন্ধ করল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অস্ফুট গোঙানি, ড্যানের মস্ত লাল দাড়ির আড়ালে তার মুখখানা হারিয়ে গেল।

শালী আমাকে কামড়ে দিয়েছে। আর্তনাদ করে উঠল ড্যান, ঘাড়ের কাছে হাত বোলাতে লাগল। সত্যি তাই। তার হাত রক্তে লাল হয়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখামাত্র বিদ্যুৎ খেলে গেল বিলি ফিশের শরীরে। সে ড্যানকে কাঁধে করে একটানে নিয়ে এল নিজের দলের মাঝখানে।

এদিকে ভয়াবহ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে প্রীস্টদের মধ্যে। ক্রুদ্ধ গলায় গর্জন ছাড়ল তারা। দেবতা বা শয়তান নয়, ওরা আমাদের মতোই মানুষ। হতভম্ব হয়ে গেলাম দেখে এক প্রীস্ট হাতের বর্শা নিয়ে যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিতে ছুটে আসছে আমার দিকে। তারপর যা শুরু হলো সে ভয়াবহতার বর্ণনা দেবার সাধ্য আমার নেই।

আক্ষরিক অর্থেই জায়গাটা রণক্ষেত্র হয়ে উঠল। আমরা দেবতা নই, স্রেফ ওদের মতো মানুষ, কারণ আমাদেরও গা থেকে ওদের মতো রক্ত ঝরে, এ ব্যাপারটা উপলব্ধি করার পরে সমস্ত প্রীস্ট, গ্রাম প্রধান এবং শতশত গ্রামবাসী যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। আমাদের সাথে রইল শুধু বিলি ফিশ এবং তার দল। আমাদের বন্দুক ওদের চেয়ে উন্নত মানের হলেও অতগুলো হিংস্র মানুষের সাথে পেরে ওঠা মুখের কথা নাকি?

পেছনে বেশ কিছু হতাহত মানুষ ফেলে বিলি ফিশের পরামর্শমতো আমাদের রণেভঙ্গ দিতেই হলো। ড্যান অবশ্য আসতে চাইছিল না। ক্রোধে সে-ও উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অসম এই যুদ্ধে পেরে উঠব না জেনে ওকে জোর করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললাম।

কিন্তু ওরা আমাদের পিছু ছাড়ল না। প্রীস্টরা বড়-বড় পাথর গড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। আমাদের সৈন্যবাহিনীও প্রাণপণে যুদ্ধ করল। কিন্তু ওরা সংখ্যায় কয়েক শ আর আমরা অল্প কয়েকজন। কোনো মতে ওদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে উপত্যকার নিচে এসে দেখি আমরা মাত্র ন জন বেঁচে আছি। আমি, ড্যান, বিলি ফিশ এবং জনা ছয় সৈনিক।

বিলি ফিশ বলল, আমাদের নিয়ে তার গ্রাম বাশকাইতে যাবে। ওরা সবগুলো গ্রামে খবর পাঠাবে, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়।

ড্যানের বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে উন্মাদের মতো আচরণ করছিল। একবার আমাকে খুব বকাঝকা করল। বলল, এ সব কিছু নাকি আমার দোষেই হয়েছে। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই তাই রাজার বিরুদ্ধে ওদের ষড়যন্ত্র টের পাইনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি প্রত্যুত্তরে কিছু বললাম না। জানি বললে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবে সে।

অনেকক্ষণ গজগজ করে শেষে ড্যান বলল, একবার বাশকাই গিয়ে পৌঁছি। তারপর ফিরে এসে সবগুলো বিদ্রোহীর ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করে ছাড়ব।

আমরা সারা দিন আর সারা রাত হাঁটলাম। ড্যান বরফের ওপর দিকে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেল বারবার, অভ্যাস মতো নিজের লাল দাড়ি চিবুতে লাগল আর বিড়বিড় করে সারাক্ষণ কি যেন বকে চলল।

রক্ষা পাবার কোনো উপায় আমাদের নেই, এক সময় হতাশ গলায় বলল বিলি ফিশ, ধর্মগুরুরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে আপনারা দেবতা নন, মানুষ। আপনারা আর কটা দিন কেন দেবতা হয়ে থাকতে পারলেন না? এখন ধরা পড়লে আপনারা তো মরবেনই, আমিও শেষ! বলে বরফের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, তার দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল।

পরদিন সকালে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম যেখানে সমতল ভূমি বলে কিছু নেই, খালি চড়াই আর উত্রাই। কোনো খাবারও নেই। বিলির সঙ্গী সেই ছয়জন সৈনিক বারবার তাদের সর্দারের দিকে তাকাতে লাগল, যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলল না কিছুই। দুপুর নাগাদ আমরা হাজির হয়ে গেলাম বরফ ঢাকা, ভোতা এক পাহাড় চুড়োয়। মাত্র চুড়োয় উঠেছি, এমন সময় ওদের চোখে পড়ে গেলাম। বিরাট একটা দল অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে।

প্রীস্টরা খুব দ্রুত খবর পাঠাতে পেরেছে দেখছি, তেতো গলায় বলল বিলি ফিশ। ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

শত্রুপক্ষ থেকে আকস্মাৎ গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। একটা গুলি এসে লাগল ড্যানিয়েলের পায়ের গুলতিতে। সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। চারদিকে শত্রু দেখে কাত্রাতে কাত্রাতে বলল, ফিরে যাও, বিলি ফিশ। তোমার লোকদের নিয়ে চলে যাও। তোমার পক্ষে যা করা সম্ভব তা করেছ। এখন প্রাণে বাঁচতে চাইলে কেটে পড়ো। তুমিও কার্নেহান, ওরা হয়তো তোমাকে হত্যা করবে না। আমি একা ওদের মোকাবেলা করব। ঝামেলা আমিই পাকিয়েছি। আমি রাজা। আমার ঝামেলা আমাকেই শেষ করতে দাও।

আমি বললাম, তোমাকে ছেড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বিলি ফিশ, তোমার রাস্তা খালি। তুমি যেতে পার। আমরা দুজন যতক্ষণ পারি ওদের ঠেকিয়ে রাখব।

আমি একজন সর্দার, গম্ভীর গলায় বলল বিলি ফিশ, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। আমার লোকেরা ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে।

তার মুখ থেকে কথা খসা মাত্র বাকি, সঙ্গে-সঙ্গে বাশকাইর সৈন্যরা দৌড়ে পালাল। তারপর আমরা তিনজন রুখে দাঁড়ালাম শত্রুদের বিরুদ্ধে সেই ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যে সেই শীত এখানো যেন ঢুকে আছে মাথার ভেতরে।

.

প্রেসের লোকজন সবাই ঘুমাচ্ছে। আমার অফিস ঘরে দুটো কেরোসিন বাতি জ্বলছে, টের পাচ্ছি ঘামে ভিজে গেছে শরীর, কপাল থেকে ঘামের রেখা নামছে। কার্নেহানের দিকে ঝুঁকলাম। ও কাঁপতে শুরু করেছে। ভয় হলো অজ্ঞান না হয়ে পড়ে। আমি রুমাল দিয়ে মুখ মুছে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হলো?

তারপর? গুঙিয়ে উঠল কার্নেহান। মরণপন লড়াইয়ে হেরে গেলাম আমরা। বিলি ফিশ, আমাদের সহৃদয় বন্ধুটির গলা কেটে ফেলল ওরা এক কোপে। তারপর ড্যানকে ধরে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে নিয়ে চলল অনেক দূরে একটা খাদের ধারে। সারাটা রাস্তা ওরা ওকে পেছন থেকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে গেল। ড্যান অমন অবস্থার মধ্যেও আমাকে বারবার বলছিল, তোমার এই দুর্দশার জন্যে আমিই দায়ী, পিচি। আমিই তোমাকে তোমার নিরুদ্বেগ জীবন থেকে টেনে এনেছি কাফিরিস্তানে একদল বুনোর হাতে খুন হবার জন্যে। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল সে।

ওরা ড্যানকে একটা খাদের ওপর দড়ির ব্রিজে নিয়ে তুলল। তারপর এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলল মুণ্ড। দ্বিখণ্ডিত শরীরটা ছিটকে পড়ে গেল কয়েক শ ফুট নিচে।

এরপর আমার পালা। ওরা আমাকে পাহাড়ের জঙ্গলে নিয়ে যীশুকে যেভাবে ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল, ঠিক সেভাবে একটা গাছে ঝুলিয়ে দিল। হাতে এবং পায়ে কাঠের গজাল ব্যবহার করেছিল ওরা। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার, অত যন্ত্রণা সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত আমি টিকে যাই। পরদিন সকালে ওরা আমাকে জীবিত দেখে খুব অবাক হয়ে যায়। আমাকে ওরা গাছ থেকে নামায়...

এ পর্যন্ত বলে চেয়ারে দুলতে-দুলতে বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কার্নেহান। দশ মিনিট কেঁদে বোধহয় বুকটা খালি হলো, হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে আবার শুরু করল সে।

আমাকে ওরা মন্দিরে নিয়ে গেল। কিছু খেতে দেয়নি। ওরা বলাবলি করছিল ড্যানিয়েল মানুষ হলেও আমাকে দেবতার পর্যায়ে ফেলা যায়। কারণ ক্রুশে ঝুলেও আমি বেঁচে গেছি। ওরা আমাকে তারপর বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বলল, বাড়ি যাও। আর কখনো এদিকে এসো না।

আমার পুরো একটা বছর লেগেছে বাড়ি ফিরে আসতে। ওরা আমার হাতে ড্যানের কাটা মুণ্ডুটা ধরিয়ে দিয়েছিল সোনার মুকুটসহ। এ কাজটা করেছিল আমি যাতে আর ওদিকে পা বাড়ানোর সাহস না করি। আমি বহুদিন অনাহারে অর্ধাহারে থেকেছি। কিন্তু সোনার মুকুটটা হাত ছাড়া করিনি। কারণ এই মুকুট মাথায় পরত আমার ভাই ড্যান। তার

মুকুটের মর্যাদা আমার কাছে অনেক বেশি। ওতো আমার ভাই, বন্ধু, সবই ছিল। এই যে দেখ আমার ভাইয়ের কী দশা করেছে ওরা।

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে একটা ঘোড়ার চামড়ার থলে খুলল কার্নেহান, তারপর আমার দিকে ঠেলে দিল শুকনো, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ড্যানিয়েল ড্রাভটের কাটা মুণ্ডুটা। বাতির আলোয় সেই বিখ্যাত লাল দাড়ি যেন আবার ঝলসে উঠল, কোটর দুটো শূন্য, ভাঙা খুলির ওপর ঝকঝকে একটা রত্নখচিত সোনার মুকুট বসিয়ে দিল কার্নেহান।

এই সেই রাজা, বলল কার্নেহান। যত দিন বেঁচে ছিল নিজেকে কাফিরিস্তানের রাজা ভেবেই বেঁচেছে। ভাবলে কষ্টে বুক ফেটে যায় বেচারা ড্যানিয়েল এক সময় রাজা ছিল।

কাটা মুণ্ডুটার দিকে তাকিয়ে আমার গা শিউরে উঠল। এই লোকটার সাথে আমার মারোয়ার জংশনে পরিচয় হয়েছিল ভাবতে কেমন যেন লাগল। কার্নেহান উঠে দাঁড়িয়েছিল চলে যাবার জন্যে। আমি ওকে নিষেধ করলাম যেতে। কারণ বাইরে যাবার মতো শারীরিক সামর্থ ওর নেই।

আমাকে হুইস্কির বোতলটা দাও আর পারলে কয়েকটা টাকা দাও, হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল সে। আমি এখন ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাব। বলব শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যেন আশ্রমে থাকার অনুমতি পাই। না, ধন্যবাদ, গাড়ি ডেকে দিতে হবে না। আমার কাজ আছে দক্ষিণে মারোয়ারে-এক্ষুনি ছুটতে হবে ওখানে।

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। হাঁটা দিল ডেপুটি কমিশনারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। ওই দিন দুপুরবেলা আমাকে বাজার সওদা করতে যেতে হলো সদর রাস্তায়। দেখলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কাঁপতে কাঁপতে ভিক্ষা চাইছে কার্নেহান। কিন্তু কেউ ওকে ভিক্ষা দিচ্ছে না। দেখে আমার খুব মায়া হলো। ওকে জোর করে গাড়িতে তুলে কাছের একটা মিশনারীতে নিয়ে গেলাম। গাড়িতে যাবার পথে কার্নেহান করুণ গলায় গান গাইতে থাকল, আমাকে চিনতে পারল না।

দিন দুই পরে কার্নেহানের খবর নিতে মিশনারীতে গেলাম। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, ওর ভয়ানক সানস্ট্রোক হয়েছিল। গত কাল সকালেই মারা গেছে লোকটা। আচ্ছা, লোকটা নাকি দুপুরবেলা প্রখর রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গাইছিল?

হ্যাঁ, বললাম আমি। আচ্ছা, মারা যাবার সময় ওর সঙ্গে কোনো জিনিস ছিল?

আমার জানামতে ছিল না, জবাব দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

দ্য সিটিজেন – ফ্রেডরিক ফোরসাইথ

বাড়ি পালানো ছিল তার সবসময়ই প্রিয় বিষয়। ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়াম টিউবগুলো চালিয়ে আসছেন। দেখেছেন সত্তরটিরও বেশি বড় বড় শহর, এর বেশিরভাগই রাজধানী।

ত্রিশ বছর আগে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চোখের, ঝাঁকড়াচুলো, দুই আস্তি নে সাঁটানো নতুন, ঝকঝকে জুনিয়র ফাস্ট অফিসারের দুটি রিংয়ের এক তরুণ, যিনি দূর দেশে যেতে খুব পছন্দ করতেন। স্টপ-ওভারগুলোতে তিনি উপভোগ করেছেন ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈশ জীবন, গিয়েছেন দূর প্রাচ্যের মন্দিরে। এখন তিনি ডকিংয়ে, নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

ওই দিনগুলোতে সুন্দরীতমা স্টুয়ার্ডেসদের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সম্পর্ক ছিল তবে সুসান তাকে বিয়ে করার পরে তিনি ওইসব ত্যাগ করেন। পাঁচ হাজার রাত হোটেলের বিছানায় কাটানোর পরে তাঁর একমাত্র আকুলতা ছিল বাড়ি ফিরে সুসানের গায়ের ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ নেয়া।

তিনি এখন এক কন্যা এবং এক পুত্রের জনক। ছেলে চার্লসের বয়স তেইশ, পেশায় কম্পিউটার প্রোগ্রামার, মেয়ে জেনিফার, আঠারো, হিস্টোরি অব আর্ট নিয়ে পড়াশোনার জন্য ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে। এরা তাকে সুস্থিত একটি অবস্থা এবং বাড়ি ফেরার

আরেকটি কারণ দিয়েছে। আর দুবছর পরে তিনি অবসরে যাবেন। ইনি ক্যাপ্টেন আড্রিয়ান ফ্যানন। এ মুহূর্তে একটি ক্রু বাসে রয়েছেন। আর কিছুক্ষণ পরে তিনি একটি বোয়িং ৭৪৭-৪০০ জাম্বো বিমানে ব্যাংকক বিমান বন্দর থেকে ৪০০ যাত্রী নিয়ে উড়াল দেবেন লণ্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টের উদ্দেশে।

ক্রুবাসটি এ মুহূর্তে ব্যাংকক বিমান বন্দরে যাচ্ছে। বাসে তিনি, দুজন ফার্স্ট অফিসার ছাড়া আরও আছেন কেবিন সার্ভিস ডিরেক্টর বা CSD, পনেরজন স্টুয়ার্ড, এদের চারজন পুরুষ, বাকি এগারজন নারী। দিন দুই আগে তিনি এদেরকে নিয়ে হিথ্রো থেকে উড়ে এসেছেন, জানেন CSD মি.হ্যারি পালফ্রে ফ্লাইট ডেকের দরজা থেকে শুরু করে প্লেনের লেজ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক সামাল দেবেন। কারণ পালফ্রে অতিশয় অভিজ্ঞ একজন বিমান কর্মী।

বাইরে ব্যাংককের আবহাওয়া আর্দ্র এবং গরম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্রু বাসটির ভেতরে তাই আরাম লাগছিল যাত্রীদের। টেক অফের দুই ঘণ্টা আগেই ক্রু বাস ঢুকে পড়ছে এয়ারপোর্ট পেরিমিটারে। বাসটি এগোল BA (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ) অফিস অভিমুখে। BA অফিস জানিয়েছে সিডনি থেকে যাত্রা করা স্পিডবার্ড ওয়ান জিরো ব্যাংককের স্থানীয় সময় রাত ৯৯ ৪৮-এ এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে। আসলে এটি প্রায় চলেই এসেছে বলা যায়।

ক্রু বাসের এক মাইল পেছনে একটি কালো লিমুজিন। এর একমাত্র যাত্রী উর্দিপরা ড্রাইভারের পেছনে বসে আছেন। তাঁরা আসছেন অভিজাত ওরিয়েন্টাল হোটেল থেকে। ওখানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভটি তিনদিন ধরে অবস্থান করছিলেন। গাড়ির বুটে রাখা আছে তার সুটকেস, খাঁটি চামড়ার তৈরি সলিড পিতলের লক, দেখেই বোঝা যায় এর মালিক খুব বেশি ভ্রমণ করেন না বটে তবে সফরকালে সস্তা জিনিসও ব্যবহার করেন না। তার পাশে, সিটের ওপর পড়ে আছে কুমিরের চামড়ার অ্যাটাচি কেস।

তাঁর চমৎকার ছাঁটাইয়ের ক্রিম সিল্ক সুটের ব্রেস্ট পকেটে শুয়ে আছে একটি ব্রিটিশ পাসপোর্ট যাতে নাম লেখা হিউগো সিমুর এবং রয়েছে ব্যাংকক থেকে লণ্ডন যাত্রার রিটার্ন হাফ টিকেট। অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস। স্পিড়বার্ড ওয়ান জিরো যখন রানওয়ে থেকে ট্যাক্সি রোল করে BA ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে যাচ্ছে, ওইসময় লিমোজিনটি মৃদু গরগর শব্দে চেক-ইন হলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মি. সিমুর তাঁর লাগেজ ট্রলিতে তুললেন না। ম্যানিকিওর করা একটি হাত তুলতেই এক থাই পোর্টার ছুটে এল। ড্রাইভারকে বকশিস দিয়ে ব্যবসায়ীটি ভোলা বুটে রাখা তাঁর সুটকেসটির দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন, তারপর পোর্টারের পেছন পেছন চেক ইন হলে ঢুকলেন। এগোলেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফার্স্ট ক্লাস ডেস্কে। গাড়ি থেকে নেমে ট্রপিকাল হিটের মধ্যে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড সময় তাঁকে থাকতে হলো।

ফার্স্ট ক্লাস চেক ইনে এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে না। ডেস্কের পেছনে তরুণ ক্লার্কটি অন্য কারও জন্য ব্যস্তও ছিল না। দশ মিনিটের মধ্যে সুটকেসটি ব্যাগেজ-হ্যাণ্ডলিং এরিয়ায় রওনা হয়ে গেল যেখানে ওটার ট্যাগ দেখিয়ে দেবে যে ওটা BA লণ্ডন ফ্লাইটে যাচ্ছে। মি. সিমুরকে বোর্ডিং কার্ড দেয়া হয়েছে এবং পাসপোর্ট কন্ট্রোলের পেছনে ফাস্ট ক্লাস লাউঞ্জটি তাঁকে দেখিয়ে দেয়া হলো।

ইউনিফর্ম পরা থাই ইমিগ্রেশন অফিসার বার্গাণ্ডি রঙের পাসপোর্ট এবং বোর্ডিং পাসে চোখ বুলিয়ে অবশেষে তাকাল গ্লাস স্ক্রিনের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে।

দ্রলোক মধ্যবয়সী, হালকা রোদে পোড়া চামড়া, সদ্য কামানো মুখ, লৌহ ধূসর চুল, পরনে নরম, ঘামশূন্য সাদা সিল্ক শার্ট, জিম থম্পসনের দোকান থেকে কেনা সিল্ক টাই এবং ক্রিম সিল্ক সুট যেটি ব্যাংককের সেরা এক দর্জি বানিয়েছে, যারা ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে সেভিল রোর নকল তৈরি করে দিতে পারে। সে আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট ঠেলে দিল কাঁচের পর্দার নিচে।

Sawat-di, krab, বিড়বিড় করে বললেন ইংলিশম্যান। থাই অফিসার ভদ্রতা দেখিয়ে হাসল। থাই ভাষায় খুব কম মানুষই ধন্যবাদ জানাতে পারে, বিশেষ করে বিদেশীদের জন্য এটি প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

ওদিকে সিডনি থেকে ব্যাংকক আসা প্লেনটি থেকে যাত্রীরা নামতে শুরু করেছে। লম্বা করিডর ধরে তারা ইমিগ্রেশনে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেন খালি হয়ে গেল। এখন ওতে ক্লিনিং স্টাফরা উঠবে আবর্জনা পরিষ্কার করতে। অন্তত চোদ্দটি বিনলাইনার ভরে যাবে আবর্জনায়।

এদিকে মি. সিমুর তাঁর কুমিরের চামড়ার অ্যাটাচি কেস নিয়ে ফাস্ট ক্লাস লাউঞ্জে পা বাড়ালেন। তাঁকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে এক গ্লাস হোয়াইট ওয়াইন নিয়ে এল। তিনি ফোর্বস ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে গেলেন। শীতল, বিলাসবহুল, সুপরিসর এ লাউঞ্জে আরও জনাকুড়ি যাত্রী রয়েছে।

তিনি যখন পত্রিকা পড়ছেন ওই সময় বোয়িং ৭৪৭-৪০০র ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীরা চেক ইন হলে ভিড় জমিয়েছে। এ বিমানটিতে চোদ্দটি প্রথম শ্রেণীর আসন রয়েছে, তেইশটি আছে ক্লাব ক্লাস সিট। এগুলো সবই ভরে যাবে। এর পরের আসনগুলো হলো ইকোনমি ক্লাস বা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলার ক্লাস। এর যাত্রী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪০০। চেক ইন হল এর দশটি ডেস্ক এতগুলো যাত্রীকে সামাল দিতে গলদঘর্ম হয়ে গেল। এই যাত্রীদের মধ্যে হিগিন্স পরিবারও আছে। এই যাত্রীরা সবাই নিজেদের লাগেজ বহন করছে। তারা এসেছে কোচে চড়ে। গরমে এবং ঘামে এদের বেসামাল দশা। ডিপারচার লাউঞ্জে পৌঁছাতে হিগিন্স পরিবারের এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

.

ক্যাপ্টেন এবং তাঁর ক্রুরা অফিসে পনেরো মিনিট সময় কাটালেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে চোখ বুলানোর জন্য। এখানে ফ্লাইট প্ল্যান রয়েছে যাতে বলা হয়েছে ফ্লাইটে কতটা সময় লাগবে, মিনিমাম কতটুকু জ্বালানি নিতে হবে এবং বেশ কয়েকটি কাগজে রুট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে যা আজ রাতে অনুসরণ করবেন ক্যাপ্টেন। এ তথ্যগুলো যুগিয়েছে ব্যাংকক এবং লণ্ডনের বিভিন্ন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার। UK রুটের আবহাওয়া বার্তা বলছে আজ রাতের আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকবে।

কাগজপত্রে সইটই করে চার পাইলট প্লেনে ওঠার জন্য প্রস্তুত হলেন। সিডনি থেকে আসা যাত্রীরা অনেক আগেই চলে গেছে। ক্লিনাররা এখনও প্লেনে আছে তবে সেটা CSD র বিষয় এবং মি. হ্যারি পালফ্রে দক্ষতার সঙ্গে যথারীতি ওসব ঝামেলা চোকাবেন।

থাই ক্লিনাররাই CSD র কেবল চিন্তার বিষয় নয়। তাঁকে অন্যান্য সমস্ত দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। ল্যাভেটরি ঠিকঠাক পরিষ্কার হলো কিনা দেখতে হবে। ৪০০ যাত্রীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য এবং পানীয় নিয়ে আসা হচ্ছে। এমনকী তিনি লণ্ডনের লেটেস্ট খবরের কাগজের ব্যবস্থাও করেছেন। এগুলো মাত্রই হিথ্রো থেকে আরেকটি জেট বিমান করে এল। মি. পালফ্রে যখন এসব তদারকি করছেন ওইসময় ক্যাপ্টেন এবং তাঁর ক্রুরা প্লেনে উঠে বসলেন।

ক্যাপ্টেন ফ্যালন সিঁড়ি বেয়ে তার এলাকায় চলে এলেন। এন্ট্রি লেভেল থেকে আপার কেবিন এবং সেখান থেকে হেঁটে ফ্লাইট ডেক ডোরে। তাঁর দুই ক্যাপ্টেন এবং একজন ফাস্ট অফিসার যে যার জ্যাকেট খুলে ফেলে রেস্টরুমের দরজার পেছনে ওগুলো ঝুলিয়ে রেখে নিজেদের আসনে বসল।

সামারের সময় ক্যাপ্টেন ফ্যালনকে সাধারণত দুজন ফার্স্ট অফিসার সঙ্গ দেয়। তবে এটা জানুয়ারি শেষ এবং টানা তের ঘণ্টার এ জার্নিতে তাঁর সঙ্গে একজন ফাস্ট অফিসার আছে। অপরজন ছুটিতে।

ক্যাপ্টেন ফ্যালনের বামে বসল একজন পাইলট, ডানে সিনিয়র ফার্স্ট অফিসার। ফ্লাইট ডেকের পেছনে, বাম দিকে, দুইট বাঙ্কসহ ছোট একটি কামরা আছে। ক্যাপ্টেন অটোমেটিক পাইলটে প্লেন চালাতে দিয়ে, তার অপর দুই পাইলটের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে নিশ্চিন্ত মনে চার পাঁচ ঘণ্টা ওখানে নিদ্রা যেতে পারেন। তিনি দুই পাইলটকে কন্ট্রোলে রেখে বাঙ্করুমে ঢুকলেন কাগজে স্টক মার্কেটের খবরে চোখ বুলাতে।

গোটা এয়ারক্রাফ্ট এখন পরিচালিত হচ্ছে Auxiliary Power Unit বা APU দ্বারা। এটি আসলে পঞ্চম জেট ইঞ্জিন যার সম্পর্কে খুব কম যাত্রীই জানে। এই দানব এয়ারক্রাফট যে APU দ্বারা চলছে তার পাওয়ারের সাহায্যে একটি ছোটখাট ফাইটার

একাই চলতে সঙ্গম। এই পাওয়ার বিমানটির বাইরের সবকিছু স্বাধীনভাবে কাজ চালানোর সামর্থ দিচ্ছে– আলো, বাতাস, ইঞ্জিন স্টার্টসহ আরও অনেক কিছু।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলার ডিপারচার লাউঞ্জে মি., মিসেস হিগিন্স এবং তাদের মেয়ে জুলি ইতিমধ্যে ক্লান্ত এবং মেয়েটির মেজাজ খিটখিটে হতে শুরু করেছে। তারা চার ঘন্টা আগে তাদের দুই তারকা হোটেলটি ছেড়ে এসেছে। এখানে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। কোচে লাগেজ তোলো, কোনোকিছু ফেলে গেলে কিনা তা পরীক্ষা করো, লাইনে দাঁড়াও, ছোট একটি সিটে বসো, ট্রাফিক জ্যাম, দেরি হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা, আবার যানজট, কোচ থেকে এয়ারপোর্টে নামমা, লাগেজ খুঁজে বের করো, তারপর ট্রলির সন্ধান, বাচ্চাটা আবার কোথাও ছুটে গেল কিনা সেদিকেও লক্ষ রাখো, চেক ইনের এক মাইল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকো, কিউতে দাঁড়াও, অপেক্ষা করো, তারপর সিকিউরিটি এক্স-রে মেশিন, বডি সার্চ কারণ বেল্ট বাকলের কারণে বেজে উঠেছে অ্যালার্ম, জুলির চিৎকার কারণ তার পুতুলটা পাঠানো হয়েছে এক্স-রের জন্য, ডিউটি ফ্রি শপে কিছু হাবিজাবি কেনাকাটা, আবার কিউ এবং অপেক্ষা ... অবশেষে বোর্ডিংয়ের আগে লাস্ট স্টপে শক্ত প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে থাকো।

জুলি তার পুতুলটি বুকে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ল। সে এবার হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। পুতুলটি তার বাবা তাকে ফুকেট থেকে কিনে দিয়েছে। তাকে দেখে কয়েক গজ দূরে বসা এক লোক ডাক দিল।

এই যে খুকী, খুব সুন্দর পুতুল তো!

দাঁড়িয়ে পড়ল জুলি, চোখ কুঁচকে তাকাল লোকটার দিকে। লোকটার পায়ে কাউবয় বুট, ভেঁড়া, মলিন জিনস, গায়ে ডেনিম শার্ট, গলায় জপমালা। তার চেয়ারের পাশে একটি ছোট হ্যাঁভারস্যাক। চুলগুলো ফ্যাকাশে, গোসল করেনি বোধহয়, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি।

আট বছরের জুলির জানার কথা নয় এ একজন হিপ্পি। দূরপ্রাচ্য হিপ্পিদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় জায়গা। এর কারণ এখানকার জীবনযাত্রা সহজ এবং সস্তা, তাছাড়া এসব দেশে মাদকও মেলে সহজে।

ও আমার নতুন পুতুল, বলল জুলি। ওর নাম পুকি।

বেশ নাম। কিন্তু ওকে পুকি বলো কেন? জিজ্ঞেস করল হিপ্পি।

কারণ ড্যাডি ওকে পুন্ড কেট থেকে কিনে দিয়েছে। আমি চিনি জায়গাটা। চমৎকার সাগর সৈকত আছে। তোমরা ওখান থেকে ছুটি কাটিয়ে এলে বুঝি?

হুম। আমি ড্যাডির সঙ্গে সাঁতার কেটেছি। কত মাছ দেখলাম!

মিসেস হিগিন্স বুড়ো আঙুলের খোঁচা দিল তার স্বামীর পায়ে, ইঙ্গিতে দেখাল তাদের মেয়েকে।

জুলি, এখানে এসো, ডার্লিং, মিসেস হিগিন্স ডাকল তার মেয়েকে। মায়ের এ গলার স্বরটি চেনে জুলি। রাগ করলে বা অসন্তুষ্ট হলে মা এভাবে ডাকে। সে লাফাতে লাফাতে চলে গেল তাদের কাছে। হিগিন্স কটমটে চোখে তাকাল হিপ্পির দিকে। হিপ্পিদের সে মোটেই পছন্দ করে না। এরা বদ, নোংরা এবং মাদকসেবী। এরকম একটা লোকের সঙ্গে তার মেয়েকে কথা বলতে দেয়ার প্রশ্নই নেই। হিপ্পি অগ্নিদৃষ্টির মাজেজা বুঝতে পারল। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। তবে মাথার ওপর ধূমপান নিষেধ-এর সাইনবোর্ডে চোখ পড়তে পা বাড়াল স্মোকিং এরিয়ায়। নাক সিটকাল মিসেস হিগিন্স। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা করা হলো এখনওই বোর্ডিং শুরু হবে, চেক করা হবে ৩৪ থেকে ৫৭ সারির বোর্ডিং পাস। মি. হিগিন্স তার বোর্ডিং পাস বের করল। ৩৪ নং সারি, সিট D,E এবং F। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সে চূড়ান্ত লাইনটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

.

প্লেন ছাড়ার সময় রাত ১১.৪৫। ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটের যাত্রা। ক্যাপ্টেন ফ্যালনের বিমান কাল সকাল ৬টা ২০ মিনিটে লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌঁছানোর কথা। তখন ওখানকার তাপমাত্রা থাকবে শূন্যের কাছাকাছি, আর ব্যাংককে এ মুহূর্তের তাপমাত্রা দেখাচ্ছে ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, হিউমিডিটি ৯০ ডিগ্রির ওপরে।

কেবিন ডোরে নক হলো। CSD ভেতরে ঢুকলেন প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট বা যাত্রী তালিকা নিয়ে।

চারশ পাঁচ জন, স্কিপার, বললেন তিনি।

তালিকায় সই করে ওটা CSD পালফ্রেকে ফিরিয়ে দিলেন ফ্যালন। ইনি এটা তুলে দেবেন BAর গ্রাউণ্ড স্টাফকে। বিশাল ফ্লাই মেশিনটির লোকজন তাদের সার্ভিলেন্সের কাজ শেষ করছে। ব্যাগেজ হোল্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, হোস পাইপগুলো ডিসকানেক্টড, গাড়িগুলো সম্মানজনক দূরত্বে সরে গেছে। দানবটি তার চারটি প্রকাণ্ড রোলসরয়েস ইঞ্জিন চালু করে দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

প্রথম শ্রেণীর কেবিনে মি. সিমুর তাঁর সিল্ক জ্যাকেটটি খুলে সামনের ওয়ার্ডরোবে রেখেছেন। ঢিলে করে দিয়েছেন টাই। তাঁর কনুইয়ের কাছে বুদ্বুদ তোলা শ্যাম্পেনের গ্লাস, CSD তাঁকে তাজা ফিনান্সিয়াল টাইমস এবং ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা দিয়ে গেছেন।

৩৪ নং সারিতে হিগিন্স পরিবার জাঁকিয়ে বসেছে। তারা ভাগ্যবান। কারণ G নম্বর আসনটি খালি। ফলে চার আসনের এই সারিটি তারা একান্ত ই নিজের করে পাচ্ছে।

জন হিগিন্স D নম্বর সিটে বসল। এটি আইলের এক পাশে, তার স্ত্রী দখল করল G নম্বর আসন, আইলের অপর পাশে। তাদের মাঝখানে বসল জুলি। কোলে তার পুকি।

স্পিডবার্ড ওয়ান জিরো স্টার্ট নিয়েছে। ট্যাক্সিং করে যাচ্ছে টেক অফ পয়েন্টের দিকে। ক্যাপ্টেন ফ্যালন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন টাওয়ার কন্ট্রোলের সঙ্গে। মেইন রানওয়ের দূর প্রান্তে পৌঁছে তিনি টেক অফের অনুমতি চাইতেই পেয়ে গেলেন।

রানওয়েতে ঘুরল জাম্বো, নাকটা খাড়া হয়ে আছে সেটার লাইন বরাবর এবং টারমাক থেকে উঁচুতে। ক্যাপ্টেন লিভার ঠেলে দিলেন সামনের দিকে, আঙুল বাঁকা করলেন Toga (Take off/ Go Around) সুইচে চাপ দিতে। চারটে ইঞ্জিনের পাওয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে গেছে প্রি সেট ফিগারে।

জাম্বোর গতি দ্রুততর হলে যাত্রীরা গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেল। দশ সেকেণ্ড পরে বোয়িংটি ডানা মেলল আকাশে।

প্লেন মাটি ছাড়তেই ফ্যালনের নির্দেশে তার কো-পাইলট সুইচ টিপে গোটা আণ্ডারক্যারেজ তুলে নিল। ঘটাংঘট কয়েকবার শব্দ হলো, তারপর সমস্ত আওয়াজ এবং ভাইব্রেশন বন্ধ হয়ে গেল। বিমানটি প্রতি মিনিটে ১৩০০ ফুট ওপরে উঠছে, তারপর ১৫০০ ফুট, শেষে আরও সহজ হয়ে এল তার শূন্যে উড্ডয়ন।

প্লেন আকাশে ওঠার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন হিগিন্স। সে প্লেনে চড়তে ভয় পায়, বিশেষ করে টেক অফের সময় তার বুক শুকিয়ে যায় ডরে। এতক্ষণ সে সিটের আর্মরেস্ট চেপে ধরে রেখেছিল। এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছে। তবে ভয় পেলেও সে তার পরিবারকে ভয়ার্ত চেহারা দেখাতে চায় না।

আইলের দিকে মাথা তুলে তাকাতেই দেখতে পেল সেই হিপ্পিটা ওদের চার সারি সামনে বসেছে। ৩০৪ তে। তার সামনে দীর্ঘ প্যাসেজ বাল্কহেড পর্যন্ত ঠেকেছে। ওখানে ক্লাব ক্লাস আলাদা করে ফেলেছে ইকোনমি ক্লাসকে। এদিকে কমপ্লিট একটি গ্যালি রয়েছে চারটে ল্যাভেটরিসহ। হিগিন্স দেখতে পাচ্ছে চার-পাঁচজন স্টুয়ার্ডেস রাতের খাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সে ছয় ঘন্টা আগে হোটেল রুমে বসে স্ন্যাক খেয়েছে। তারপর আর দানাপানি পড়েনি পেটে। খিদেও পেয়েছে। সে জুলির দিকে তাকাল, ও আরামে বসতে পেরেছে কিনা দেখতে। মেয়েকে কার্টুন চ্যানেল ছেড়ে দিল।

.

ব্যাংকক থেকে টেক অফ করে উত্তর অভিমুখে চলেছেন ক্যাপ্টেন ফ্যালন। নিচের দিকে তাকালেন। পরিষ্কার রাত। তাদের পেছনে গালফ অব। থাইল্যান্ড, সামনে দেশটির আয়তন সমান ছড়িয়ে রয়েছে আন্দামান সাগর। চাঁদের আলোয় জলমগ্ন ধানক্ষেতগুলো দেখলে মনে হয় গোটা দেশ জল দিয়ে তৈরি। স্পিডবার্ড ওয়ান জিরো ৩১০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে চলেছে। লন্ডন যেতে একে একে পার হবে কলকাতা, দিল্লি, কাবুল,

তেহরান, পূর্ব তুরস্ক, বলকান এবং জার্মানি। তিনি স্পিডবার্ড ওয়ান জিরোকে অটো পাইলটে দিলেন, হাত-পা টানটান করলেন। আপার ডেকের এক স্টুয়ার্ডেস তার জন্য কফি নিয়ে এল।

.

৩০সি-র হিপ্পি লেট নাইট ডিনারের মেনুকার্ড দেখছে। খাওয়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। এ মুহূর্তে একটি সিগারেটে সুখটান দিতে পারলে খুব ভালো হতো। তবে এখনই এ সুযোগ নেই। পরে সুযোগ পেলে সে গাঁজা ভরা একটি সিগারেট খাবে।

গরুর মাংস আনুন, পাশে দাঁড়ানো হাসিমুখের স্টুয়ার্ডেসকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। তার উচ্চারণে আমেরিকান টান থাকলেও পাসপোর্ট বলছে সে একজন কানাডিয়ান, নাম ডোনোভান।

.

পশ্চিম লন্ডনে, সশস্ত্র রক্ষী দ্বারা সুরক্ষিত একটি অফিসে ফোন বেজে উঠল। ডেস্কে বসা লোকটি ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা বাজে কিন্তু এখনই সাঁঝের আঁধার ঘনিয়েছে।

ইয়েস।

বস, BA 0-1-0 ব্যাংকক থেকে উড়াল দিয়েছে।

ধন্যবাদ।

সে ফোন রেখে দিল। উইলিয়াম বিল বাটলার ফোনে কথা বলে সময় নষ্ট করার মানুষ নয়। আসলে সে এমনিতেও খুব কম কথা বলে। সবাই এ কথা জানে। তারা এও জানে যারা ভালো কাজ দেখাতে পারে তাদের প্রতি সে সদয় থাকে আর অকর্মাদের প্রতি তার আচরণ অত্যন্ত বিরূপ।

তবে একটি কথা কেউ জানে না তা হলো তার ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল, তার অহংকার, মেয়েটি স্কলারশিপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল কিন্তু হেরোইনের ওভারডোজ খেয়ে মারা যায়। বিল কাটলার হেরোইন একদমই পছন্দ করে না। সে আরও ঘৃণা করে হেরোইন ব্যবসায়ীদেরকে। এ কারণে হেরোইন ব্যবসায়ীদের যমে পরিণত হয়েছে সে। তার বিভাগ HM কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজের পক্ষে হার্ড ড্রাগসের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে চলেছে। মাদক ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করাই বাটলারের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

.

পাঁচ ঘণ্টা পর। স্পিড়বার্ড ওয়ান জিরো এ মুহূর্তে কাবুল এবং কান্দাহার পার হয়ে উত্তরে পানশির পর্বতমালার দিকে চলেছে। ওখানে ধর্মোন্মাদ তালেবানদের বাস।

প্লেনের যাত্রীরা ডিনার সেরে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সবগুলো জানালার পর্দা ফেলা, বাতির আলো কমানো, গায়ে পাতলা কম্বল। যারা ঘুমায়নি তারা ইন ফ্লাইট মুভি দেখছে, কেউ কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে।

34Gতে মিসেস হিগিন্স ঘুমিয়ে পড়েছে, চিবুক পর্যন্ত টেনে দেয়া ব্ল্যাঙ্কেট, মুখ অর্ধেক খোলা, প্রশান্ত নিঃশ্বাস নিচ্ছে। E এর F সিটদুটোর আর্মরেস্ট সরিয়ে, ওটাকে একটি আসনে রূপান্তরিত করে তাতে হাত পা ছড়িয়ে, বুকে পুতুল চেপে আরাম করে ঘুমাচ্ছে জুলি।

তবে ঘুম নেই জন হিগিন্সের চোখে। সে প্লেনে কখনও ঘুমাতেও পারে না। যতই ক্লান্ত লাগুক শরীর, জেগে থাকে। এ মুহূর্তে সে থাইল্যান্ডে তাদের ছুটি কাটানোর কথা ভাবছিল। একটি প্যাকেজ ট্যুরে গিয়েছিল সে ওখানে। নইলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন কেরানির পক্ষে সপরিবারে দূরপ্রাচ্য ভ্রমণে যাওয়ার সাধ্য কোথায়?

তারা ফুকেট আইল্যাণ্ডের পানসিয়া হোটেলে উঠেছিল। জুলিকে নিয়ে সৈকতে সাঁতার কেটেছে, কোরাল রিফে রঙিন মাছ দেখে খুশিতে মেয়ের কী চিৎকার! সে হোটেল শপ থেকে জুলিকে ওই পুতুলটি কিনে দিয়েছে।

ফুকেটের কথা ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল জন হিগিন্সের। প্লেন একটি ছোট্ট এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ঝাঁকি খেতে ঘুমঘুম ভাবটা কেটে গেল, সে সভয়ে চেপে ধরল সিটের আর্মরেস্ট।

হিগিন্স দেখল চার সারি সামনে হিপ্পিটা জেগে গেছে। সে ঘড়ি দেখল, কম্বলের মধ্যে নড়েচড়ে বসল। তারপর সিধে হলো।

হিপ্পি চারপাশে একবার চোখ বুলাল কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা দেখার জন্য। তারপর আইল ধরে বাল্কহেডের দিকে এগুলো। এখানে একটি পর্দা আছে তবে আধ গোটানো, গ্যালি এরিয়া থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। আলোতে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো কার্পেট এবং দুটো ল্যাভেটরি ডোর। হিপ্পি দরজায় পা বাড়াল, দুটির দিকেই একে একে তাকাল তবে খুলবার কোনো লক্ষণ নেই তার মধ্যে। নিশ্চয় ভেতরে লোক আছে, ভাবল হিগিন্স, যদিও সে পায়খানায় কাউকে যেতে দেখেনি। হিপ্পি একটি ল্যাভেটরির দরজায় হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ত্রিশ সেকেণ্ড পরে তার সঙ্গে যোগ দিলেন আরেকজন। হিগিন্স সতর্ক হয়ে উঠল। এ মানুষটি হিপ্পি থেকে একদমই আলাদা। তার চেহারায়। আভিজাত্য এবং বড়লোকি চালচলন পরিষ্কার ফুটে বেরুচ্ছে। ইনি সামনের ক্লাব কিংবা প্রথম শ্রেণীর আসন থেকে এসেছেন। কিন্তু কেন?

গ্যালির আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় মানুষটির পরনে ক্রিম সুটের ট্রাউজার্স, সিল্ক শার্ট, গলায় ঢিলে করে বাঁধা টাইটিও সিল্কের। এ নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তিনি কি এতদূর এসেছেন প্রাতঃকৃত্য সারতে?

তারপর ওরা দুজনে কথা বলতে শুরু করল। মি. বড়লোক এবং হিপ্পি। নিচু গলায়, ভঙ্গিটা জরুরি। বড়লোক মানুষটিই মূলতঃ হিপ্পির দিকে ঝুঁকে কথা বললেন, সে শুধু অসংখ্যবার মাথা দুলিয়ে ভদ্রলোকের কথায় সায় দিয়ে গেল। শরীরী ভাষা বলছে বড়লোকটি হিপ্পিকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন আর হিপ্পি মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রতিটি কথায়।

জন হিগিন্স সেই ধরনের মানুষ যারা সবসময় পড়শীরা কে কী করছে তার সুলুক সন্ধান রাখে এবং সবকিছুর মধ্যেই একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ শোকার চেষ্টা করে। এবারেও তাই ঘটল।

সে ভাবছিল মি. বড়লোকের যদি পায়খানায় যাওয়ার দরকার হতো তাহলে তিনি প্রথম শ্রেণী এবং ক্লাব ক্লাসের পাঁচ/ছটি ল্যাভেটরির যে কোনও একটিতে যেতে পারতেন। এই অসময়ে নিশ্চয় সবগুলো পায়খানা দখল হয়ে থাকবে না। না, ওরা এ জায়গাটি এবং এ সময়টি বেছে নিয়েছে কথা বলার জন্য। এরা স্রেফ আজাইরা প্যাচাল পাড়তে আসেনি, যেমনটি পায়খানা বা অন্য লাইনে দাঁড়ানো মানুষজন করে সময় কাটানোর জন্য।

ওরা বিচ্ছিন্ন হলো। সিল্ক শার্ট অদৃশ্য হয়ে গেলেন দৃশ্যপট থেকে, ফিরে গেলেন সামনে, তাঁর আসনে। হিপ্পি কোনো ল্যাভেটরিতেই ঢুকল না, চলে এল নিজের সিটে। জন হিগিন্সের মাথায় তখন চিন্তার ঝড়। বুঝতে পারছে সে একটি অদ্ভুত তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে গেছে যদিও জানে না বিষয়টি কী। সে চোখ বুজে ঘুমের ভান ধরল হিপ্পিকে চারপাশের অন্ধকারে নজর বুলাতে দেখে। কেউ তাকে দেখে ফেলেছে কিনা, নিশ্চিত হতে চাইছে বোধহয়।

দশ মিনিট বাদে তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল জন হিগিন্স। এ লোক দুটি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এখানে সাক্ষাত করেছে। হয়তো বড়লোকটি কোনও স্টুয়ার্ডেসের মারফত হিপ্পির কাছে চিরকুট পাঠিয়েছিলেন এ সময়টায় তিনি ওর সঙ্গে দেখা করবেন। যদিও হিগিন্স কোনও স্টুয়ার্ডেসকে হিপ্পির কাছে কোনও চিরকুট দিতে দেখেনি। তবে?

এমনও হতে পারে ওরা দুজন থাইল্যাণ্ডে বসেই এ বিশেষ মুহূর্তটির কথা ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু কেন? কিছু আলোচনা করার জন্য? কোনও প্রগেস রিপোর্ট দেবে? হিপ্পি কি ব্যবসায়ীটির পিএ? অবশ্যই না। কোনও ধনবান ব্যবসায়ীর প্রাইভেট সেক্রেটারি অমন ফকিরনির মতো পোশাক পরে না। হিগিন্সের মনে সন্দেহ গাঢ়তর হলো।

রাত এগারোটা। লণ্ডন। বিল বাটলার তার ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিভিয়ে দিল ঘরের বাতি। সে ভোর সাড়ে চারটায় অ্যালার্ম দিয়ে

রেখেছে। সোয়া পাঁচটায় সে হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌঁছাবে। এ সময়টুকু হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে, গাড়ি চড়ে রওয়ানার জন্য যথেষ্ট। তার টাচডাউনের সময় সকাল সোয়া ছয়টা। এরপরে কী ঘটবে না ঘটবে পুরোটাই জানে ভাগ্য।

সারাটা দিন প্রচুর পরিশ্রম গেছে। কোন দিনই বা যায় না? ক্লান্ত হলেও ঘুম আসছিল না বাটলারের। মনে চিন্তার স্রোত।

Us Drug Entarcement Administration 7 DEAs Talicsta এক সহকর্মীর আভাস পাবার পরেই শুরু হয়েছে হান্ট।

ব্রিটিশ আইলের নব্বই ভাগ এবং পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে হেরোইনের যে চালানটা আসে তা টার্কিশ। এ ব্যবসা নির্দয় ধূর্ততার সঙ্গে পরিচালনা করছে তুর্কি মাফিয়া, এরা খুবই হিংস্র যদিও সবসময় লো প্রোফাইলে থাকে বলে বেশিরভাগ ব্রিটিশ এদের ব্যাপারে কিছু জানে না।

এদের প্রডাক্ট আসে আনাটলিয়ার পপি ফুল থেকে। দেখায় অশোধিত বাদামী রঙের চিনির মতো। মোমবাতির আগুনে টিনফয়েলে এ জিনিস রেখে গরম করে ধোয়া টেনে নেয় মাদকসেবীরা। ব্রিটিশ মাদকাসক্তরা শরীরে খুব কমই ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে, আমেরিকানরা করে।

গোল্ডেন ট্রায়ালে এবং ফান ইস্টার্ন ট্রাফিক এই টার্কিশ ডোপ উৎপাদন করে না, এটি থাইল্যাণ্ড হোয়াইট নামে পরিচিত, দেখতে লাগে বেকিং পাউডার। এ জিনিসটি আমেরিকানদের খুব পছন্দ।

DEA বাটলারকে জানিয়েছে তাদের এক আণ্ডারওয়ার্ল্ড সোর্স বলেছে গত ছয় মাসে ব্রিটেনে ছয় কেজি খাঁটি কলম্বিয়ান কোকেন এবং দুই কিলো থাই হোয়াইট পাঠানো হয়েছে এক ক্যারিয়ার বা মিউল-এর মাধ্যমে।

পরিমাণটি বিরাট কিছু না হলেও ফেলে দেয়ার মতো নয়। প্রতি ট্রিপে ব্রিটিশ অর্গানাইজার ২০০,০০০ পাউণ্ড করে পেয়েছে। পরিমাণ শুনে বিল বাটলার বুঝতে পেরেছে এ জিনিস জাহাজ কিংবা ট্রাকে করে আসেনি, এসেছে আকাশ পথে। প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজে। সে এবার ঘুরে শুয়ে চার ঘণ্টার ঘুম ঘুমাবার চেষ্টা করল।

.

ঘুমাতে পারছে না জন হিগিন্সও। তাদের বিমান যখন পূর্ব তুরস্কের আনাটলিয়ার পথে, ওইসময় সে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরের র‍্যাক থেকে নিজের অ্যাটাচি কেসটি নামিয়ে আনল। কেউ নড়াচড়া করছে না, এমনকী হিপ্পিও না।

সিটে বসে হিগিন্স কেস খুলে সাদা কাগজের একটি প্যাড এবং কলম বের করল। কাগজের প্যাডটি সে প্যানসিয়া হোটেল থেকে নিয়ে এসেছে। প্যানসিয়া লোগো এবং ঠিকানার অংশটুকু সাবধানে ছিঁড়ে নিয়ে অ্যাটাচি কেসটিকে লেখার ডেস্ক বানিয়ে ক্যাপিটাল লেটারে চিঠি লিখতে শুরু করল হিগিন্স। আধঘন্টা লাগল তার কাজটি করতে।

তার লেখা যখন শেষ, বিমান তখন আংকারার আকাশে। জন হিগিন্স কাগজটি ভাঁজ করে BAর দেয়া ইউনিসেফ চ্যারিটির একটি খামে ঢুকিয়ে তার ওপর বড় বড় হস্তাক্ষরে লিখল: FOR THE CAPTAIN. URGENT।

সিধে হলো হিগিন্স, নিঃশব্দে হেঁটে গেল ল্যাভেটরি দরজার পর্দার ধারে। উঁকি দিল গ্যালিতে। এক তরুণ স্টুয়ার্ড তার দিকে পেছন ফিরে ট্রেতে সকালের নাশতা সাজাতে ব্যস্ত। হিগিন্স সরে এল। বেজে উঠল বাযার। শুনল স্টুয়ার্ড গ্যালি ছেড়ে সামনে কদম বাড়িয়েছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সুড়ৎ করে ভোলা জায়গায় ঢুকে পড়ল হিগিন্স। ট্রের ওপর সাজানো দুটি কফি কাপের মাঝখানে খামটি খাড়া ভাবে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এল নিজের আসনে।

আরও আধঘণ্টা বাদে,আরও ব্রেকফাস্ট ট্রে রেডি করতে গিয়ে খামটি নজরে এল স্টুয়ার্ডের। প্রথমে ভাবল ইউনিসিফের কোনও ডোনেশন খাম। পরে লেখাটি চোখে পড়ল

তার। কপাশে ভাঁজ পড়ল স্টুয়ার্ডের, একটু ভেবে দেখা করতে চলল কেবিন সার্ভিস ডিরেক্টরের সঙ্গে।

এ জিনিসটি দুটো কফি কাপের মাঝখানে ছিল, হ্যারি। ভাবলাম ফ্লাইট ডেকে না গিয়ে আগে আপনাকে দেখাই।

চোখ পিটপিট করলেন হ্যারি পালফ্রে।

ঠিকই করেছ, সাইমন। হয়তো ভুয়া কোনও চিঠি। এটা আমার কাছে থাক। তুমি বরং ব্রেকফাস্ট ট্রেগুলো...

চলে গেল স্টুয়ার্ড। ইউনিফর্ম ট্রাউজার্সে ঢাকা তার সুঠাম নিতম্বের দিকে তাকিয়ে হ্যারির বুকে আঁচ করে বিধল কামনার ছুরি। তিনি বহু স্টুয়ার্ডকে নিয়ে শুয়েছেন, তবে এ ছেলেটা দারুণ। হয়তো হিথ্রোতে... তিনি খামটির দিকে তাকালেন। এবার ভাবলেন খুলে দেখবেন, শেষে মত বদলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। টোকা দিলেন ফ্লাইট ডেকের দরজায়।

এটা স্রেফ ফর্মালিটি। CSD যে কোনও সময় ফ্লাইট ডেকে আসতে পারেন। তিনি ভেতরে ঢুকলেন। বামের আসনে বসে আলোকিত একটি উপকূলের দিকে তাকিয়ে আছে রিলিফ

ক্যাপ্টেন। ফ্যালন এখানে নেই। CSD গেলেন বাঙ্ক রুমে। এখানে তাঁকে ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো।

ধূসর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে দরজা খুলে দিলেন ক্যাপ্টেন ফ্যালন।

হ্যারি?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, স্কিপার। কেউ এ জিনিসটি মিডসেকশন গ্যালির দুটো কফি কাপের মাঝখানে খুঁজে দিয়ে গেছে। নিজের চেহারা দেখায়নি সে। অচেনা কেউ একজন, অনুমান করি।

তিনি খামটি বাড়িয়ে ধরলেন।

আড্রিয়ান ফ্যালনের পেটে মোচড় দিল। ত্রিশ বছরের ক্যারিয়ারের কখনও তিনি হাইজ্যাকের শিকার হননি। বোমা হামলার ভয়ে তাঁকে ভীত হতে হয়নি। তবে তাঁর অনেক সহকর্মীরই এসব অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে এ দুঃস্বপ্নের মাঝে তাঁকেও যেতে হবে। তিনি খামটি ছিঁড়ে, চিঠিতে বের করে বাঙ্কের কিনারে বসে পড়তে লাগলেন। চিঠিতে লেখা : ক্যাপ্টেন, আমি নিজের নাম বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। কারণ এর মধ্যে আমি নিজেকে কোনোভাবেই জড়াতে চাই না। তবু একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে আমার মনে হলো আমি যা দেখেছি তা আপনাকে অবগত করা

দরকার। আপনার দুজন যাত্রী অত্যন্ত অদ্ভুত আচরণ করছে এবং তাদের এহেন আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এরপরে চিঠিতে বিস্তারিত লেখা প্রত্যক্ষদর্শী কী দেখেছে এবং কেন তার কাছে গোটা ব্যাপারটি অদ্ভুত এবং রহস্যময় লেগেছে। শেষে লেখা:

দুই যাত্রীর একজনের চেহারা ও পোশাক আশাক হিপ্পিদের মতো, সে বসেছে 30C আসনে। অপরজনের কথা আমি বলতে পারব না তবে আমার ধারণা তিনি প্রথম শ্রেণী কিংবা ক্লাব ক্লাসের যাত্রী।

বড়লোক যাত্রীটির বর্ণনাও দেয়া হয়েছে চিঠিতে। সবশেষে লেখা:

আশা করি আমি কোনও ঝামেলা সৃষ্টি করছি না তবে দুজন মানুষ যদি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয় এবং তা কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করা দায়িত্ব মনে করেই এ পত্র লেখা।

ক্যাপ্টেন ফ্যালন চিঠিতে হ্যারি পালফ্রেকে দিলেন। তিনি চিঠি পড়া শেষ করে ঠোঁট কামড়ালেন।

মিডনাইট অ্যাসাইনেশন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

এরা কেন একত্রিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও ইংগিত নেই। সে যাকগে, হ্যারি, তুমি আমাকে প্যাসেঞ্জার লিস্টটি এনে দেবে?

CSD যাওয়ার পরে চুল টুল আঁচড়ে, শার্ট ঠিকঠাক করে রিলিফ ক্যাপ্টেনকে ফ্যালন জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমান পজিশন?

গ্রিক কোস্ট সামনেই। কোনও সমস্যা, আড্রিয়ান?

আরে নাহ।

পালফ্রে ফিরে এলেন যাত্রী তালিকা নিয়ে। 30C আসনের যাত্রীর নাম কেভিন ডোনোভান।

আর অপর যাত্রী? বড়লোকটি?

মনে হয় তাঁকে আমি দেখেছি। বললেন পালফ্রে। ফার্স্ট ক্লাস, সিট 2K, তিনি প্যাসেঞ্জার লিস্টে আঙুল বুলালেন। এঁর নাম মি. হিউগো সিমুর।

লাফ মেরে কোনও উপসংহারে পৌঁছানোর আগে নিশ্চিত হও, বললেন ক্যাপ্টেন। ফার্স্ট ক্লাস এবং ক্লাব ক্লাসে ভালোভাবে খোঁজ নাও! ওয়ারড্রোবে ক্রিম সিল্কের জ্যাকেটের খোঁজ করো।

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন পালফ্রে। ফ্যালন স্ট্রং ব্ল্যাক কফির জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে ফ্লাইট ডিটেলস চেক করতে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে CSD নিচ থেকে ফিরে এলেন। জানালেন ওটা হিউগো সিমুরই বটে, কোনো সন্দেহ নেই। ক্যাপ্টেন ফ্যালন তাঁর বিমানের দুজন সন্দেহভাজন যাত্রীর বিষয়ে সমস্ত তথ্য দিয়ে সতর্ক করে দিলেন হিথ্রো বিমান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে। এখন তারা যা অ্যাকশন নেয়ার নেবে।

.

সোয়া চারটায় অ্যালার্মের শব্দ শোনা হলো না বিল বাটলারের। তার আগেই চারটা বাজার দশ মিনিট আগে ঘুম ভেঙে গেল ফোনের শব্দে। হিথ্রো এয়ারপোর্টের চার নম্বর টার্মিনাল থেকে তার লোক ফোন করেছে। তার কথা শুনতে শুনতে ঘুমের চটকা পুরোপুরি ভেঙে গেল বাটলারের। কুড়ি মিনিট পরে সে উঠে পড়ল গাড়িতে। গাড়ি চালাতে চালাতে হিসেব নিকেশ কষতে লাগল।

ফাঁদে ফেলার জন্য বা টোপ ফেলতে অচেনা বহু অভিযোগই আসে। বেশিরভাগই বইয়ে লেখা পুরানো সব ট্রিক। এগুলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত বিল বাটলার। সাধারণত এ ধরনের ফোন আসে। শহরের কোনও পাবলিক বুথ থেকে, কারও নাম ধরে বলা হয় সে আসছে ফ্লাইটের একজন ক্যারিয়ার।

তবে কাস্টমসের পক্ষে এ ধরনের ফোন কল অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। যদিও ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বর্ণিত ট্যুরিস্ট একজন নিরপরাধ মানুষ। যে ফোন করেছিল সে নিশ্চয় লণ্ডনের কোনো গ্যাং সদস্য।

বর্ণিত মানুষটিকে যখন জেরা করা হবে আসল অপরাধী হয়তো ততক্ষণে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়েছে।

কিন্তু তাই বলে একজন এয়ারক্রাফট ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আসা ওয়ার্নিং? এটি নতুন ঘটনা। তাঁর বিমানের একজন যাত্রী তাঁকে চিঠি লিখেছে? দুজন যাত্রীকে সন্দেহ করা হচ্ছে? এর পেছনে সুসংগঠিত কোনও মস্তিষ্ক কাজ করছে এবং বাটলারের কাজ হবে বুদ্ধির লড়াইয়ে আড়ালের ওই লোকটিকে হারিয়ে দেয়া।

বিল বাটলার চার নম্বর টার্মিনালের সামনে গাড়ি থামাল। প্রায় খালি ভবনের দিকে লম্বা কদমে এগোল। সাড়ে চারটা বাজে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ডজনখানেক প্রকাণ্ড জেট

বিমান চার নম্বর টার্মিনালকে প্রায় দখল করে রেখেছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য জায়গাটি উন্মদাশ্রমে পরিণত হবে।

.

সকাল ছটা। বিল বাটলার তার নক টিমের দশ জন সদস্যকে টার্মিনাল চারের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আগামী চল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোস্টন এবং মিয়ামি থেকে আসা প্লেনগুলোর সঙ্গে যোগ হবে পূর্ব থেকে আসা বিমান। অফবোর্ড প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে টার্মিনাল পরিণত হবে জনসমুদ্রে। এমবার্কেশন, ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস সব জায়গাতেই ছদ্মবেশে নিজেদের নোক ঢুকিয়ে দিয়েছে বাটলার। তবে মুশকিল হলো, অনেক সময়ই দেখা যায় ক্যারিয়ার ভয়ের চোটে তার লাগেজই সংগ্রহ করে না। ক্যারুজলে একের পর এক সুটকেস আসতে থাকে, ওগুলো কারা তুলে নিচ্ছে, তার ওপর সতর্ক নজর থাকে কাস্টমসের। কিন্তু বিশেষ একটি কেস হয়তো কেউ তুলতেই এল না।

ওয়েস্ট ড্রেটন জানালো স্পিড়বার্ড ওয়ান জিরো চ্যানেল পার হয়ে সাফোক উপকূলের দিকে আসছে। কোর্স অনুযায়ী সে এয়ারপোর্টের উত্তর দিকে আসবে, তারপর লম্বা একটা চক্কর দিয়ে মেইন রানওয়েতে নেমে পড়বে।

সকাল ছটা পাঁচে স্পিডবার্ড ওয়ান জিরো উপকূল পার হলো। ইতিমধ্যে যাত্রীদের কাছ থেকে খাবারের ট্রে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে ভিডিও বিনোদন। কেবিন ক্রুরা ফার্স্ট এবং ক্লাব ক্লাসের যাত্রীদের হাতে তুলে দিতে লাগল যার যার জ্যাকেট। জানালার ধারে বসা যাত্রীরা উঁকি মেরে দেখল তাদের নিচ দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে আলোকমালা।

মি. হিউগো সিমুর ফার্স্ট ক্লাস ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্লিন শেভড, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, গা দিয়ে দামী মিচফিল্ড আফটারশেভের সুঘ্রাণ আসছে। সিটে বসে তিনি টাই ঠিকঠাক করে নিলেন, ওয়েস্টকোটের বোম লাগালেন এবং স্টুয়ার্ডেসের কাছ থেকে ক্রিম সিল্ক জ্যাকেটটি নিয়ে ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখলেন। কুমিরের চামড়ার অ্যাটাচি কেসটি তাঁর দুই পায়ের ফাঁকে বসে রইল।

ইকোনমি ক্লাসে কানাডিয়ান হিপ্পি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের জন্য আইঢাই করছে প্রাণ। আইলের ধারে বসেছে বলে পোর্ট হোল দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য সেই চেষ্টা সে করলও না।

চার সারি পরে হিগিন্স পরিবারের ঘুম ভেঙেছে, তারা নিচে নামার জন্য প্রস্তুত। জুলি তার পুকিকে বলছে তার নতুন বাড়িতে সে কী কী মজার জিনিস দেখতে পাবে। মিসেস হিগিন্স তার ক্যারি অন ব্যাগে শেষ টুকিটাকি জিনিসপত্র ভরছে। পরিপাটি মি. হিগিন্স

তার প্লাস্টিকের অ্যাটাচি কেসটি হাঁটুর ওপর রেখেছে, হাত জোড়া তার ওপর ভাঁজ করা। সে তার কর্তব্য পালন করেছে। এখন তার ভালো লাগছে।

.

সকাল ছটা আঠারো মিনিটে হিথ্রো বিমান বন্দরে নেমে এল স্পিড়বার্ড ওয়ান জিরো। প্লেন থামতেই এয়ারপোর্টের টেকনিকাল স্টাফের কভারল পরা এক তরুণ এসে সাক্ষাত করল হ্যারি পালফ্রের সঙ্গে। সে CSDর কাছ থেকে হিগিন্সের লেখা চিঠিটি নিয়ে গেল কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। সে চলে যাওয়ার পরে, CSD তার পেছনে দাঁড়ানো প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের দিকে ঘুরলেন।

গুডবাই, স্যার। আশা করি আপনারা ফ্লাইটটি উপভোগ করেছেন।

তারা CSDকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পরে ক্লাব ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা নামল। সবশেষে ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীরা।

.

ইমিগ্রেশন হলটি প্রকাণ্ড এবং পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসাররা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ডেস্কের পেছনে জন সমুদ্র সামাল দিতে। ওপরে এবং এক পাশে, আয়না লাগানো

একটি দেয়াল, আসলে এটি টু-ওয়ে মিরর, এর পেছনে একটি ঘর আছে। এ ঘরে বিল বাটলার দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

তার নিচে দশজন পাসপোর্ট অফিসার, দুজন ইউকে এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন পাসপোর্টের লোক, বাকি আটজন পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর পাসপো ের্ট চেক করবে। বাটলারের একজন সহকারী এদেরকে ব্রিফ করেছে। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের মধ্যে সদ্ভাব সর্বদাই বিদ্যমান, তবে এ ব্রিফিং তাদের মাঝে নিস্তেজ সকালে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ফার্স্ট ক্লাস যাত্রীদের মধ্যে মাত্র চারজন ব্রিটিশ, বাকিরা থাই অথবা অস্ট্রেলিয়। চার ইউকে নাগরিকের পাসপোর্ট ডেস্ক পার হতে অত্যল্প সময় লাগল। তবে তৃতীয় জন যখন তার পাসপোর্ট হাতে পেল, ইমিগ্রেশন অফিসার সামান্য মাথা কাত করে আয়নাঅলা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। বিল বাটলারের হাতে সেই চিঠিটি। ক্রিম সিল্ক সুট শুধু একজনই পরেছেন। হিউগো সিমুর। সে তার হাতে বাঁধা খুদে কমিউনিকেটরে দ্রুত কথা বলল।

ও এখন বেরিয়ে আসছে। ক্রিম সিল্ক সুট। হাতে কুমিরের চামড়ার অ্যাটাচি কেস।

রনজিত গুল সিং একজন শিখ। সে ম্যানচেস্টার ভার্সিটি থেকে এম.এ পাশ করেছে এবং কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজের একজন অফিসার। নকএর সে একজন সদস্যও বটে। সে পাসপোর্ট কন্ট্রোলের পেছনের প্যাসেজে ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে ছিল। ডান কানে হিয়ারিং প্লাগের সমান ছোট ইয়ারপিসের মাধ্যমে সে মেসেজটি শুনতে পেল।

কয়েক সেকেন্ড পরে ক্রিমসুট পরা এক লোক তার পাশ দিয়ে হেঁটে পুরুষদের ল্যাভেটরিতে ঢুকল। এ তথ্য বাটলারকে দিতে সে হুকুম দিল, ওর পিছু নাও। দ্যাখো কী করে।

কিন্তু হাত মুখ ধোয়া ছাড়া আর কিছুই করলেন না ক্রিম সুট। কারও সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন না তিনি। সিং তথ্যটি দিল তার বসকে।

এদিকে হিপ্পিকে অনুসরণ করছিল ক্যাজুয়াল ড্রেস পরা আরেক তরুণী। আর হিউগো সিমুর তখন ল্যাভেটরি থেকে বেরিয়ে এসে ইকোনমি ক্লাস যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেছেন। তিনি কিছুই করছেন না।

বিল বাটলারের সন্দেহ হলো এ লোকটি ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছেন। তার মনে হচ্ছে হিপ্পিটি ডীকয় বা টোপ। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছে বোধ করি কনসাইনমেন্টটি আছে। তবে ব্যাংকক থেকে আসা লাগেজগুলো যখন ছয় নম্বর ক্যারুজেল থেকে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা একের পর এক তুলে নিতে লাগল তিনি কিন্তু তার সুটকেসটি স্পর্শও করলেন না। কনভেয়র বেল্টটি অন্তত কুড়ি বার চক্কর দিল, তবু ওদিকে এগিয়ে গেলেন না ভদ্রলোক কিংবা একবার তাকিয়েও দেখলেন না। তিনি এ মুহূর্তে রয়েছেন হলরুমের শেষ মাথায় ট্রলি সেকশনে, যেখান থেকে লোকে ট্রলিতে বোঝাই করছে তাদের মালপত্র।

ক্যারুজেল থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে হিপ্পি ডোনোভান। অপেক্ষা করছে তার ভারী, কালো রঙের হ্যাঁভার স্যাকটির জন্য। আর দুটি ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এল মি. হিগিন্স, তার স্ত্রী এবং কন্যা জুলিকে নিয়ে। জুলি, জীবনে এই প্রথম বিদেশে গেছে, বায়না ধরেছে সে আলাদা। একটি ট্রলিতে তার ব্যাগ এবং পুকিকে নেবে।

এক এক করে যাত্রীরা যে যার ব্যাগ নিল ক্যারুজেল থেকে। নিজের রঙচঙে ব্যাগটি দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল জুলি, ওই যে, ড্যাডি!

তার চিৎকার শুনে অনেক যাত্রীই পেছন ফিরে মেয়েটিকে একবার দেখে স্নেহপূর্ণ হাসি দিল। জুলির ব্যাগটি মাঝারী সাইজে স্যামসোনাইট, গায়ে তার প্রিয় সব কার্টুন চরিত্রের অসংখ্য ছবি সটানো : স্কুবিডু, শ্যাগি, উইলি, কয়োটি এবং রোড রানার। প্রায় একই সঙ্গে তার বাবা-মার ব্যাগ দুটিও হাজির হলো। মি. হিগিন্স তাড়াতাড়ি ব্যাগগুলো নামিয়ে নিল।

হিপ্পি তার হ্যাঁভারস্যাক পেয়ে কাঁধে ঝোলাল। পা বাড়াল গ্রীন চ্যানেলের দিকে। ওদিক দিয়েই যাত্রীরা সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। মি. সিমুর অবশেষে তার চামড়ার সুটকেসটি নিয়ে, ট্রলিতে চাপিয়ে গ্রীন চ্যানেল অভিমুখে চললেন। বিল বাটলার ইতিমধ্যে গ্রীন চ্যানেলের সামনে চলে এসেছে এবং আয়নার পেছনে দাঁড়িয়ে লোকজনকে লক্ষ করছে।

তবে হিপ্পি গ্রীন চ্যানেল পর্যন্ত যেতে পারল না। তার আগেই ইউনিফর্মধারী কাস্টমসের দুই লোক তার পথ আটকে দাঁড়াল। এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, স্যার, কি দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু আসবেন?

রেগে কাঁই কানাডিয়ান।

এসবের মানে কী?

প্লিজ আসুন, স্যার।

এবারে বিস্ফোরিত হলো কানাডিয়ান।

এই যে এক মিনিট। তেরো ঘন্টা প্লেনে জার্নি করে এখন আমি এসব হাবিজাবি কথা শুনতে চাই না, বুঝতে পেরেছেন?

তার চেঁচামেচিতে তার পেছনে মানুষের সারিটি দাঁড়িয়ে পড়ল যেন গুলি খেয়েছে। তবে পরের মুহূর্তে তারা দেখেও না দেখার ভান করে সামনে এগোল। এদের মধ্যে হিউগো সিমুরও আছেন।

তবে কানাডিয়ানের কোনোই ওজর আপত্তি টিকল না। তাকে জোর করে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সিমুর যখন এক্সিট আর্চ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাকেও বাধা দিল দুই অফিসার। তিনি প্রথমে ভান করলেন যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। তবে বুঝতে পেরে তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। তিনি প্রতিবাদ করলেও শেষ পর্যন্ত অফিসারদের সঙ্গে বাধ্য হলেন একটি সার্চ রুমে ঢুকতে।

একটি ওয়ানওয়ে মিরনের পেছনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাটলার। রাঘব বোয়ালটাকে ধরা গেছে। চেজিং শেষ। এখন কেস দুটো পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ওগুলোর মধ্যে কী আছে।

দুটি আলাদা কামরায় দুজনকে পরীক্ষা করা হলো। সময় লাগল তিন ঘণ্টা। কিন্তু হ্যাঁভারস্যাক খালি। লাইনিং ফ্রেম ইত্যাদি খুলেও ভেতরে কিছুই পাওয়া গেল না। এতে অবাক হলো না বিল বাটলার। কারণ ডীকয়রা কখনও কিছু বহন করে না।

তবে হিউগো সিমুর তাকে বিমূঢ় করে তুলল। তার চামড়ার সুটকেস ডজনবার এক্সরে করেও ভেতরে কিছু মিলল না। লুকানো কমপার্টমেন্টেও কিছু নেই। কুমিরের চামড়ার অ্যাটাচি কেসেরও একই অবস্থা। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটি টিউব পাওয়া গেল শুধু। সিমুরকে ন্যাংটো করে সার্চ করা হলো, এক্স-রে করা হলো তার জামাকাপড়। কিছু নেই।

সকাল দশটার দিকে মুক্তি পেল দুজনেই। সিমুর তখন চিৎকার করে বলছেন ওদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন। বাটলার এসব হুমকি ধামকি মোটেই পাত্তা দিল না। এরকম সবাই করে। কারণ কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজের আসল ক্ষমতা সম্পর্কে এদের কোনও ধারণাই নেই।

ওদের পিছনে লোক লাগাব, বস? জিজ্ঞেস করল নক টিমের দুই নম্বর সদস্য। বাটলার একটু ভেবে মাথা নাড়ল।

এরা যদি সত্যি নিরপরাধ হয়ে থাকে খামোকাই পিছু নেয়া হবে। আর যদি নিরপরাধ না হয় তবে ব্যাংকক থেকে কেউ তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। বাদ দাও। পরের বারে দেখা যাবে।

.

কানাডিয়ানটি এয়ারপোর্ট কোচে চড়ে লণ্ডন চলে এল, উঠল প্যাডিংটনের কাছে জরাজীর্ণ এক হোটেলে। মি. হিউগো সিমুর ট্যাক্সি নিয়ে দূরের এক দামী হোস্টেলের উদ্দেশে রওনা হলেন।

বেলা দুটোর পরে লণ্ডনের বিভিন্ন রাস্তায় চারজন লোক চারটি ফোন পেল। তারা সবাই ফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সবাইকে একটি ঠিকানায় রিপোর্ট করতে বলা হলো। এদের একজন একটি ফোন করে ছুটল তার গন্তব্যে।

বিকেল চারটা। বিল বাটলার কতগুলো সার্ভিসড অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একটি গাড়িতে বসে আছে একা। এ ধরনের বাসা সাপ্তাহিক, এমনকী দিনের ভিত্তিতেও ভাড়া পাওয়া যায়।

বেলা চারটা পাঁচে নম্বরবিহীন একটি ট্রানজিট ভ্যান এসে থামল তার পেছনে। এটির জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল বাটলার। ভ্যান থেকে তার নক টিমের দশজন সদস্য বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিফিংয়ের সময় নেই। গ্যাংটির হয়তো কোথাও কোনও লুক আউট লুকিয়ে আছে। যদিও গত আধঘণ্টা ধরে নজর রাখার পরেও সে কোনও জানালার পর্দাও তুলতে দেখেনি। সে তার দলের সদস্যদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্লকের দরজা ধরে আগে বাড়ল। ফ্রন্ট ডেস্কে কেউ নেই। সে তার দুই লোককে লিফটের দরজায় নজর রাখতে বলে বাকি আটজনকে নিয়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। তিন তলার ফ্ল্যাট।

নক দল দরজায় নক করার প্রয়োজন অনুভব করল না। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলল দরজা। ওরা সবাই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

ভাড়া করা ড্রইংরুমে পাঁচ জন লোক। তারা প্রতিরোধের চেষ্টাই করল। বসে থাকল চুপচাপ। আকস্মিক এ হামলায় হতভম্ব। বাটলার ঢুকল সবার শেষে। তার লোকেরা ওই পাঁচজনকে তাদের আইডি দেখিয়ে দিলে তারা আর উচ্চবাচ্য করার সাহস পায়নি। বাটলার সবার আগে ধরল আমেরিকানটাকে।

পরে জানা যায় সে-ই ফোন করে বলেছিল কানাডিয়ান হিপ্পি একটা ডীয় এবং হিথ্রো এয়ারপোর্টের কাস্টমস হটলাইন ব্যবহার করবে। তার ব্যাগে পাওয়া গেল ছয় কিলো খাঁটি কলম্বিয়ান কোকেন।

মি. সালভাতর বোননা, আমি আপনাকে অন্যদের সঙ্গে যোগসাজশে এই দেশে নিষিদ্ধ পদার্থ নিয়ে আসার অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম...

মিয়ামির লোকটিকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে বাটলার ফিরল হিপ্পির দিকে। খিটখিটে কানাডিয়ানকে নিয়ে যাওয়ার সময় বাটলার পেছন থেকে তার সহকর্মীদেরকে বলল, ওকে আমার গাড়িতে তোললা। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

মি. হিউগো সিমুর সিল্কের সুট ছেড়ে টুইড এবং স্ল্যাকস পরেছেন। ইনি দ্বিতীয় ডীকয়। তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ডের নোটে মোট দশ হাজার পাউন্ড উদ্ধার করা হলো। অপারেশনে সহায়তা করার জন্য তাকে এ টাকাটা দেয়া হয়েছিল। বাকি দুজনের দিকে তাকালেন বাটলার।

কনসাইনমেন্টটি ওদের দুজনের মাঝখানে, টেবিলের ওপর রয়েছে। এটি এখনও কেসের মধ্যেই আছে যেটি কাস্টমস ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে। ফলস বটম খুলে নিচে ফাঁকা একটা জায়গা পাওয়া গেছে, ওর মধ্যে সিলথেন ব্যাগে রয়েছে দুই কিলো ওজনের থাই হোয়াইট হিরোইন। তবে কেসটির গায়ে স্কুবিডু এবং শ্যাগির কার্টুন ছবি এখনও লটকে আছে।

মি. জন হিগিন্স, এ জিনিসটি আমাদের দেশে আমদানি এবং আমদানিতে অন্যদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো...

দায়িত্বশীল নাগরিকটিকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সে হড়হড় করে বমি করে দিল। সে চলে যাওয়ার পরে শেষ লোকটির দিকে ফিরল বাটলার। ইনিই ব্যাংকক চালানের মাথা। আড়ালের আসল মানুষ। লণ্ডনের আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। জানেন উন্মুক্ত এ আকাশ আর ভবিষ্যতে দেখার সুযোগ হবে না তার।

আমি আপনাকে অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করছিলাম, বন্ধু।

কোনও সাড়া নেই।

দারুণ একটা ফন্দি এঁটেছিলেন। ডীয় একজন নয়, দুজন। গ্রীন চ্যানেলের সুবিধা নিয়ে নিরপরাধ মি. হিগিন্স এবং তার পরিবারকে বুদ্ধ বানিয়ে এ সুযোগটা আপনি নিয়েছেন। আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি মি. হ্যারি পালফ্রে...

বাটলার তার দুই লোককে ভাড়া করা বাড়িটিতে রেখে এল যদি তারা আরও কোনও এভিডেন্স খুঁজে পায়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাস্তায়। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। তবে এ কাজটি সে উপভোগই করবে। তার দলের দুই নম্বর সদস্যটি হুইলে বসেছে। বাটলার পেছনে, নিশ্চুপ কানাডিয়ানের পাশে এসে বসল।

সরাসরি কাজের কথায় আসি, বলল বাটলার। তুমি কবে জানলে এই ডাবল ব্লাফে সিমুর তোমার পার্টনার?

ওই ফ্ল্যাটে বসে। কিছুক্ষণ আগে, জবাব দিল হিপ্পি।

বজ্রাহত দেখাল বাটলারকে।

ল্যাভেটরি ডোরে মাঝরাত্তিরে তোমরা কী কথা বলছিলে?

কীসের কথা? কীসের ল্যাভেটরি? আমি ওই লোককে এর আগে জীবনেও দেখিনি।

হেসে উঠল বাটলার যে কাজটি সে খুব কমই করে।

তাতো বটেই। হিথ্রোর ওই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি তো নিয়মকানুনগুলো জানাই। ওখানে বসেও তোমার কাভার ফাঁস করার কোনও উপায় ছিল না। সে যাকগে, ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। খুব ভালো দেখিয়েছ, শন। আজ রাতে আমি তোমাকে বিয়ার খাওয়াব।

ফার্স্ট ক্লাস হানিমুন — হেনরি স্লেসার

ডিভোর্সের বয়স সাত মাস দুই সপ্তাহ চার দিন পার হয়ে গেলেও শনিবার সকালে গ্লোরিয়াবিহীন বেডরুমে মনে বেশ আনন্দ নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল এডোয়ার্ড গিবসনের। হাই তুলল সে, হাত পা আয়েশ করে ছড়িয়ে দিল, ডাবল বেডে গা মোড়ামুড়ি করতে করতে একাকী থাকার মজাটুকু উপভোগ করছিল ও।

ইনসমনিয়ায় ভোগা গ্লোরিয়ার ক্যানকেনে কণ্ঠের ঘ্যানঘ্যান আর তার সুখের ঘুম নষ্ট করবে না, রাতের বেলা হার্টের প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া কিংবা শাস নিতে কষ্ট হওয়ার ক্রমাগত অভিযোগ আর বিরক্ত করবে না এডোয়ার্ডকে। এডোয়ার্ড অলস, তার ভেতর দয়ামায়া নেই, তার ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে, রাতের বেলা বিশ্রী নাক ডাকে বলে ঘুমাতে পারে না গ্লোরিয়া, সে অমনোযোগী, গ্লোরিয়ার অসুখ বিসুখের দিকে তার কোনো খেয়াল নেই ইত্যাদি হাজারো বিষয় নিয়ে আর কোনো লেকচারও শুনতে হবে না এডোয়ার্ড গিবসনকে।

ডান পায়ের আঙুলের এক লাথিতে একদা গ্লোরিয়ার শয্যা থেকে বালিশ ফেলে দিল ও। সে কত সুখী ভেবে মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

তবে প্রাতঃকৃত্য ও গোসল সেরে ও যখন নাস্তার টেবিলে বসল, মনের উল্লাস দূর হয়ে গেল। টোস্টে পুরু করে মাখন মাখাতে গিয়ে মনে পড়েছে আজ গ্লোরিয়াকে ওর

খোরপোশের টাকা দেয়ার দিন। টোস্টে আর কামড় দেয়া হলো না, খিঁচড়ে গেছে মেজাজ। খাবারটা টেবিলে রেখে বেডরুমে ঢুকল এডোয়ার্ড। ভিক্টোরিয়ান ডেস্কের টপ ড্রয়ার খুলে চেক বইটি বের করল। রাগ এবং অনিচ্ছা নিয়ে চার অংকের সংখ্যাটি বসাতে হলো চেকের ওপর।

তিন মাসের আদালতে বিচ্ছেদ লড়াই শেষে গ্লোরিয়ার একমাত্র বিজয়–প্রতিমাসে এডোয়ার্ডের কাছ থেকে সে চার হাজার ডলার করে ভরণপোষণের খরচ পাচ্ছে। অনেক টাকা। যদিও তার ব্যাংক ব্যালান্স মন্দ নয়। তবু প্রতিমাসে ওই বিরক্তিকর মহিলার পেছনে এতগুলো টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে ভাবতেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এডোয়ার্ডের মন। কিন্তু করার কিছু নেই। আদালতের আদেশ তো আর সে অমান্য করতে পারবে না।

চেকটি কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিতে হবে গ্লোরিয়ার বাসার ঠিকানায়। এডোয়ার্ড শুনেছে বহাল তবিয়তেই আছে তার ভূতপূর্ব স্ত্রী। থাকবে না! মাস মাস মাগনা চার হাজার ডলার পেলে তো স্বর্গে থাকার কথা। রাগে গা টা আবার চিড়বিড় করে ওঠে এডোয়ার্ডের।

সে চেকটি খামে ভরেছে, বেজে উঠল কলিংবেল। কপালে ভাঁজ পড়ল এডোয়ার্ডের, বিস্মিত। ঘড়ি দেখল। সাড়ে নটা। এ সময় তো সাধারণত কেউ আসে না। তবে কে এল? সেই ফেরিঅলাটা নয়তো? এক লোক মাঝে মাঝে ছুটির দিনে হাবিজাবি জিনিস বিক্রি করতে আসে। একদিন প্রচণ্ড ধমকও দিয়েছে এডোয়ার্ড এসব তার লাগবে না বলে। ফেরিঅলা মিনমিন করে বলেছে ম্যাডাম নাকি তার কাছ থেকে প্লাস্টিকের ঝুড়ি,

বালতি এসব কিনতেন। এডোয়ার্ড লোকটিকে পরিস্কার বলে দিয়েছিল ম্যাডাম এখন আর এখানে থাকেন না। তারপরও ব্যাটা দুইদিন ওকে বিরক্ত করেছে। আজ হারামজাদাকে ঠিক চড় কষিয়ে দেবে ডেভিড। রেগেমেগে সে ঝড়াং করে দরজা খুলল। না, ফেরিঅলা নয়, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কার্ল সেবরন।

সুপ্রভাত, দাঁত বের করে বলল কার্ল।

কার্ল সেবরন এডোয়ার্ডের সঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করত। রুমমেট ছিল। ধান্ধাবাজ টাইপের মানুষ। ছোটখাট নানান ব্যবসা করেছে। কিন্তু ধান্ধাবাজির কারণে কোনো ব্যবসাই টিকিয়ে রাখতে পারেনি। গ্লোরিয়ার সঙ্গে কয়েকদিন আগে ওকে ঘুরতে দেখেছে এডোয়ার্ড। কার্ল হয়তো তার সুদর্শন চেহারা দিয়ে গ্লোরিয়াকে গেঁথে ফেলেছে। ওর গায়ের কালো রঙের নতুন সুটটা হয়তো গ্লোরিয়ারই উপহার। এডোয়ার্ডের খোরপোশের টাকা দিয়ে কেনা? পায়ের জুতোজোড়াও চকচকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে দুলছে। টানটান মুখের চামড়া, চেহারায় কিছু পাবার প্রত্যাশা।

তুমি এখানে কী করছ? এডোয়ার্ডের গলার স্বর একটু বেশিই কর্কশ শোনাল। তোমার জন্য একটু বেশি সকাল হয়ে গেল না?

হয়তো বা, অচঞ্চল কার্ল। ভেতরে আসতে পারি?

নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল এডোয়ার্ড। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ড্রইংরুমে ঢুকল কার্ল। বসল সোফায়। কলেজে একই বিষয়ে পড়াশোনা করলেও ওরা কখনও বন্ধু হতে পারেনি। আসলে কার্লের চালিয়াতি ভাবটাই সহ্য করতে পারত না এডোয়ার্ড। এক রুমে থাকলেও কথাবার্তা হত খুব কম। একে এড়িয়েই চলত এডোয়ার্ড। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পরে অন্য রুমে কার্লের সিট অ্যালট হলে হাঁপ ছেড়েই বেঁচেছিল ও। কার্লের সঙ্গে ইদানিং দুএকবার দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কারণ ওই গ্লোরিয়া। ধুমসী গ্লোরিয়ার সঙ্গে কার্ল ডেটিং করছে, এ ব্যাপারটা মাঝে মাঝে হজম করতে বেশ কষ্টই হয় এডোয়ার্ড গিবসনের।

গ্লোরিয়ার সঙ্গে শীঘ্রি দেখা হয়েছে? কার্লের বিপরীত দিকের উইং চেয়ারটি দখল করল এডোয়ার্ড। গলায় উপহাস।

সে তো সবসময়ই দেখা হয়, হাসল কার্ল। আসলে আজকে আমি গ্লোরিয়ার ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

গ্লোরিয়ার ব্যাপারে বহু কথা শুনেছি, টেবিলে রাখা ডানহিলের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট নিল এডোয়ার্ড। সরু চোখে লক্ষ করছে অপরজনকে। দুজনে মিলে তো ভালোই জুটি করেছ।

হেসে উঠল সেবন। তোমার হিংসা হচ্ছে?

অবাক হচ্ছি। হয় গ্লোরিয়া একদম বদলে গেছে নতুবা তোমার মতো নির্বোধ, বধির এবং কানা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। ও যে কী জিনিস তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ?

বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, বলল কার্ল। তবে মাঝে মাঝে ও খুব আদুরে হয়ে ওঠে। এবং দিলখোলা।

মনে মনে সাবেক স্ত্রীকে একটা গালি দিল এডোয়ার্ড। হাতের সিগারেটটি না ধরিয়েই অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। তোমার মতলবটা কী, কার্ল? কেন এসেছ এখানে?

বললামই তো। গ্লোরিয়ার বিষয়ে কথা বলতে। জানি ও পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নারী নয়। ওর শরীরে থলথলে চর্বি, সবসময়ই কোনো না কোনো অসুখে ভুগছে। এবং কথা বলে বলে তোমার কানের পোকা নড়িয়ে দেবে।

তো?

তবে সেদিন একটা কথা ভাবছিলাম। ওকে তো তোমার প্রতিমাসেই খোরপোশ বাবদ মোটা অংকের টাকা দিতে হচ্ছে। টাকার পরিমাণটা কত, এডোয়ার্ড?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

অনুমান করি তিন-চার হাজারের কম নয়, নাকি?

দেখো, কার্ল–

তুমি আমার কথা আসলে বুঝতে পারছ না, খ্যাক খ্যাক করে হাসল কার্ল। আমি তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে আসিনি। এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে। প্রতিমাসে তোমার কষ্টার্জিত অর্থ গ্লোরিয়ার পেছনে যাতে ব্যয় করতে না হয় সে বিপদ থেকে বাঁচাতে একটা বুদ্ধি করেছি আমি। কাজেই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না, দোস্ত।

তুমি আমার খরচ বাঁচাতে চাইছ?

তাই তো বললাম। প্রতিমাসে তোমার তিন-চার হাজার ডলার টাকা বেঁচে যাবে। কী, আগ্রহ হয়?

যথেষ্টই আগ্রহ বোধ করছে এডোয়ার্ড। তবে চেহারা ভাবলেশহীন করে রাখল।

ঠিক আছে। বলো শুনি তোমার বুদ্ধিটা কী?

কী আবার, বিয়ে। গ্লোরিয়া আবার বিয়ে না করলে তো তোমাকে খোরপোশ দিয়েই যেতে হবে। আইন তো তাই বলছে।

গ্লোরিয়ার বিয়ে? পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বোধ ছাড়া কেউ ওকে বিয়ে করবে না। আমি চিনি তো ওকে। হাড়ে হাড়ে চিনি। পাঁচটা বছর একসঙ্গে ছিলাম। গড, আমার হাড়মাংস চিবিয়ে খেয়েছে! শিউরে উঠল যেন এডোয়ার্ড। তারপর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে জানতে চাইল, বোলো না যে তুমি ওকে বিয়ে করার চিন্তাভাবনা করছ।

স্বাভাবিক অবস্থায় কস্মিনকালেও এ চিন্তা করতাম না। কিন্তু ইদানীং খুব টানাটানি যাচ্ছে। দেনার সাগরে ডুবে আছি।

তুমি কি ভাবছ গ্লোরিয়া তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে? আরে, ও তো আমার টাকায় চলে।

আমি গ্লোরিয়ার কাছে টাকা চাইতে যাবও না। আমার আসলে এখুনি বেশ কিছু টাকা দরকার। পাওনাদারের ডরে বাসায় ঘুমাতেও পারি না এমন অবস্থা। ওরা এখন ফোনেও হুমকি দিচ্ছে। তাই অনেক সময় ফোনের তার খুলে রাখি। কার্ল ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকটায় একবার নজর বুলাল পাওনাদাররা এঘরেও এসে হাজির হয়েছে কি না দেখার জন্যই বোধহয়।

তুমি কি আমার কাছে কোনো পরামর্শ চাইতে এসেছ, কার্ল?

আসলে তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে এসেছি। মৃদু হাসল কার্ল। বিয়ের প্রস্তাব। আমি বিয়ে করব যদি তুমি আমাকে টাকা দাও। ক্যাশ। এবং এখন।

শিস দিল এডোয়ার্ড। থোকা, তোমার মাথাটাই আসলে খারাপ হয়ে গেছে।

আমার কোনো উপায় নেই, বলল কার্ল। তার মুখের দু কোনা কুঁচকে গেছে। আজ রাতের মধ্যে যদি আমি দশ হাজার ডলার জোগাড় করতে না পারি ওরা আমার লাশ ফেলে দেবে বলেছে। এডোয়ার্ডের চোখে চোখ রাখল সে। এডোয়ার্ড, আই মিন ইট! আমি গ্লোরিয়াকে বিয়ে করতে রাজি আছি যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি ওকে প্রস্তাব দেব।

তুমি কী করে জানো ও রাজি হবে?

রাজি হবে, ও নিয়ে তোমাকে একটুও ভাবতে হবে না। কিন্তু আমাকে নগদ দশ হাজার ডলার পেতেই হবে। এবং দ্রুত।

তোমাকে আমি নগদ দশ হাজার ডলারঅই দেব, নরম গলায় বলল এডোয়ার্ড। প্যাকেট থেকে আরেকটি সিগারেট নিল। এবারে ধরাল। কিন্তু আমি শিওর হবো কী করে? কী করে বুঝব তুমি পিছিয়ে যাবে না?

প্রয়োজনে আমি তোমাকে লিখিত দেব, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ কার্লের। আমি ওর কাছে গিয়ে এখুনি প্রস্তাব দেব। তুমি চাইলে ওকে এখুনি ফোন করতে পারি।

ঠিক হ্যায়, বলল এডোয়ার্ড, বেড়ে গেছে হৃদস্পন্দন।ওকে ফোন করো, কার্ল।

ড্রইংরুমের কোনায় ফোন স্ট্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

সোফা ছাড়ল কার্ল। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। সোনালি রঙের রিসিভার তুলে গ্লোরিয়ার নম্বরে ফোন করল। ওকে লক্ষ করছে এডোয়ার্ড। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে মনে হয় রিংটোন শুনছে। একটু পরে তার মুখে হাসি দেখা গেল।

গ্লোরিয়া, বলল কার্ল। আমি কার্ল.. ভাল আছি, সুইটহার্ট, তুমি কেমন আছ? উচ্চকিত গলায় সে এবার হেসে উঠল। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানে আবার যাব আমরা। হয়তো আজ রাতেই। শোনো, গ্লোরিয়া... কার্ল ফোনের কর্ড পেঁচাচ্ছে। নার্ভাস লাগছে তাকে। তোমাকে একটা কথা বলব। কাল রাতেই বলতাম, কিন্তু চারপাশে এত লোকজন ছিল যে... ভাবছিলাম আজ রাতে কথাটা বলব তোমায়। কাল সারারাত ঘুমাতে পারিনি, জানো,

জানু? কথাটা বলার জন্য কিছুতেই তর সইছিল না, ডার্লিং। তাই আজ সকালেই ফোন দিলাম। জবাব না পেলে আমি স্রেফ পাগল হয়ে যাব।

চোখ বুজল কার্ল, তার কপালে ফুটে উঠেছে ঘাম। রোদ পড়ে চিকচিক করছে। সোনা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। গাঢ় গলায় ফিসফিস করল সে। আজকেই আমরা বিয়ে করব।

সে এডোয়ার্ডের দিকে তাকাল। উল্লসিত চেহারা। সত্যি বলছ? আনন্দিত শোনাল তার স্বর। সত্যি তুমি রাজি আছ? ... শোনো, তোমাকে আমি দুই ঘণ্টা সময় দিলাম। আমরা চার্চে বিয়েটা সেরে ফেলব... তোমাকে যে কত কথা বলার আছে!.. তাহলে ওই কথাই রইল। তুমি কিন্তু বেলা একটার মধ্যে চলে আসছ, বিয়েটা সেরে আমরা আজ হোটেল শেরাটনে লাঞ্চ করব, ডার্লিং। ওকে, সুইটি... গড ব্লেস ইউ।

ঝকঝকে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল কার্ল। ঝাড়া পাঁচ মিনিট বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর সোফায় এসে বসে পড়ল ধপ করে।

এডোয়ার্ড গিবসন ওর দিকে স্থির তাকিয়ে আছে। তুমি দেখছি মিথ্যা বলোনি, বলল ও। তুমি সত্যি বিয়ে করবে ওই...

মিথ্যা কেন বলতে যাব? থমথমে চেহারা কার্লের। টাকাটা দাও, তোমাকে লিখিত দিয়ে দিচ্ছি যে গ্লোরিয়াকে আমি বিয়ে করছি। পারলে একটু বাড়িয়ে দিও, এডোয়ার্ড। ধার শোধ করতেই তো পুরো টাকাটা চলে যাবে। বিয়ের একটা খরচাপাতি আছে না...

ঠিক আছে, হাসল এডোয়ার্ড। আমি তোমাকে আরও পাঁচশো ডলার দেব। আমার তরফ থেকে তোমাদের বিয়ের গিফট। একটা ফার্স্ট ক্লাস হানিমুন করে এসো। দীর্ঘ শরীর দিয়ে সিধে হলো ও। হেঁটে গেল কার্লের কাছে। ওর প্রশস্ত কাঁধে চাপড় মারল। একটু বসো, বন্ধু। আমি টাকা নিয়ে আসছি।

মুখে স্বস্তির হাসি নিয়ে লম্বা পদক্ষেপে নিজের বেডরুমে রওনা হলো এডোয়ার্ড গিবসন।

.

বিকেল চারটার দিকে ফোনের শব্দে সাধের ভাতঘুমটা ভেঙে গেল এডোয়াডের। হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে কান পাতল। ওপাশ থেকে ভেসে এল নাকী সুর গলা।

মি. গিবসন? আমি মারভিন ফ্লেমিং। আপনার সাবেক স্ত্রীর উকিল।

কে? ও, মি. ফ্লেমিং, ঠোঁট কামড়াল এডোয়ার্ড। গ্লোরিয়ার মতো এ লোকটাকেও ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। তারপর মনে পড়ল গ্লোরিয়া নামের বোঝাটা কাঁধ থেকে নেমে গেছে। কী ব্যাপার?

আমার হঠাৎ মনে হলো আপনি বোধকরি খবরটা পাননি। তাই ভাবলাম ফোন করি। নাকি খবর পেয়ে গেছেন?

কীসের খবর?

দুঃসংবাদই বলতে পারেন, গম্ভীর শোনাল মারভিন ফ্লেমিংয়ের গলা। বেশ দুঃসংবাদ। বলতে আমার কষ্টই হচ্ছে, তবে কিছু আইনগত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আপনার সাবেক স্ত্রীর মৃত্যুতে...

ওর কী হয়েছে?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। মিসেস গ্লোরিয়া গত রাতে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় মি. কার্ল তার পাশে ছিলেন। ভাবলাম আপনি

আর মি. সেবরন যেহেতু পুরানো বন্ধু, তাই...

পুরানো বন্ধুর নিকুচি করি! বেঁকিয়ে উঠল এডোয়ার্ড। ঠকাশ করে রেখে দিল রিসিভার। তার পরপরই আবার ফোন তুলে কার্লের নম্বরে ডায়াল করল। কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না দেখে রাগের চোটে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল এডোয়ার্ড, খট করে একটা শব্দ হল, ভেসে এল এক মহিলা কণ্ঠ। বোধহয় কাজের বুয়া-টুয়া হবে। মি. সেবনের বাসা। কে বলছেন?

কার্ল সেবরন আছে?

আপনি কে বলছেন?

আমার নাম এডোয়ার্ড গিবসন। কার্লের বন্ধু। ও আছে কি না বলেন।

মি. সেবরন বাসায় নেই।

কোথায় গেছে? রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল এডোয়ার্ড।

মি. সেবরন বেলা তিনটার দিকে এয়ারপোর্টে গেছেন। বোধহয় সেন্ট থমাসের প্লেন ধরবেন। তবে আমি ঠিক শিওর নই–

ও কি কিছু বলে গেছে? চেঁচিয়ে উঠল এডোয়ার্ড। নিশ্চয় বলে গেছে কিছু?

জি, স্যার। ভীত শোনাল তরুণ কণ্ঠ। বললেন কোন্ দূর দেশে নাকি হানিমুন করতে যাবেন। কিন্তু মি. সেবরন তো বিয়েই করেননি। হানিমুনের কথা কেন বললেন বুঝতে পারছি না...

মর্নিং ভিজিট – জেমস হেডলি চেজ

লেফটেনেন্ট দাঁড়িয়ে পড়ে হাত তুলল। ডান দিকে খামারবাড়িটি দেখতে পেয়েছে সে। নারকেল বীথিতে অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে।

চার নিগ্রো সৈনিক প্রস্তরমূর্তি বনে গেল। রাইফেল নামিয়ে তাতে হেলান দিয়ে রয়েছে।

মাথার ওপরের সূর্য ছোট্ট এই দলটিকে রোদের তাপে পুড়িয়ে ভাজা ভাজা করে ফেলছে। লেফটেনেন্টের মোটা চামড়া গড়িয়ে পড়ছে ঘাম, আঁটসাট ইউনিফর্মে সে খুবই অস্বচ্ছন্দ বোধ করছে। ঘামের দাগ লেগে নোংরা হয়ে গেছে সাদা ইউনিফর্ম। সে মনে মনে গালি দিল তীব্র গরম, প্রেসিডেন্ট এবং সবার ওপরে এ.বি.সি. সন্ত্রাসবাদীদের।

রোষকষায়িত দৃষ্টিতে সে তাকাল চার নিগ্রোর দিকে। তারা শূন্য চোখে চেয়ে আছে মাটির দিকে, যেন নির্বীর্য কতগুলো বলদ।

এটাই সেই জায়গা, বুলেটের মতো মাথাটা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে বলল লেফটেনেন্ট। তোমরা দুজনে ডানদিকে যাও, দুজনে বামে। তবে কোনো শব্দ করবে না। ঝামেলা দেখলে বেয়নেট চালাবে কিন্তু কোনো গুলি চলবে না।

খাপ খুলে তরবারি বের করল সে। রোদে ঝিকিয়ে উঠল ধারালো ফলা।

সৈন্যরা দুলকি চালে ছুটল খামারবাড়িটির দিকে। মাথা নিচু, হাতে আলগাভাবে ঝুলছে রাইফেল। এবড়োখেবড়ো মাটিতে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে তারা, যেন ডালকুত্তা কিছুর গন্ধ পেয়েছে।

মন্থর গতিতে আগ বাড়ল লেফটেনেন্ট। নিশব্দে হাঁটছে সে, যেন ডিমের খোলার ওপরে পা ফেলছে। একদা ঝকঝকে ইউনিফর্মের ভেতরে মেদবহুল শরীরটা কুঁকড়ে গেল পাছে হুশ করে কোনো বুলেট ছুটে আসে সেই ভয়ে। সে নারিকেল কুঞ্জ আর খামারের মাঝখানে জায়গা রেখে হাঁটছে। তবে নারিকেল গাছগুলো যখন আর তাকে আশ্রয় দিতে পারল না, সে ছুট দিল। কর্কশ জমিনে থপথপ করে দৌড়াচ্ছে, ভয়ানক উত্তাপ তাকে যেন রশির মতো পেঁচিয়ে ধরল।

চার সৈনিক ইতিমধ্যে খামার বাড়িতে পৌঁছে গেছে, একটা অসম বৃত্ত করে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে লেফটেনেন্টের জন্য। তাদের এখন প্রাণবন্ত লাগছে। কারণ জানে দুপুরের খর সূর্য থেকে রেহাই পেতে শীঘ্রি তারা ফিরে যাবে ব্যারাকে।

খামারবাড়িটি চৌকোণা, নারকেল পাতায় ছাওয়া ছাদ, সাদা চুনকাম করা দেয়াল। লেফটেনেন্ট সতর্কভাবে এগোচ্ছে, কুটিরের দরজা খুলে রোদে বেরিয়ে এল লম্বা, গরিবি পোশাক পরা এক কিউবান।

ঝট করে রাইফেল তুলল চার সৈনিক। চকচকে বেয়োনেট বাগিয়ে ভয় দেখাল। নট নড়নচড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিউবান। বুকে হাত বাঁধা। চেহারা ফ্যাকাশে।

লেফটেনেন্ট জিজ্ঞেস করল, লোপেজ?

চোখ পিটপিট করল কিউবান। সে শুধু তার সামনে বেয়োনেটের ইস্পাতের ফলাগুলোই দেখতে পাচ্ছে। তাকাল লেফটেনেন্টের দিকে।

জি, শুকনো, খসখসে গলায় জবাব দিল সে।

তরবারিটি এক পাক ঘোরাল লেফটেনেন্ট। তুমি বোধহয় আমার নাম শুনেছ। তার মুখে ফুটল নেকড়ের হাসি। আমি রিকার্ডো ডি ক্রেসপেডেস।

বালুতে পা ঘষল লোপেজ। চোখ কুঁচকে গেলেও চেহারা রইল কাষ্ঠবত। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন বলে সম্মানিতবোধ করছি, সেনর।

লেফটেনেন্ট বলল, আমরা ভেতরে যাব। সে তরবারি বাগিয়ে ধরে লোপেজের পাশ কাটাল। ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

দুজন সৈন্যসহ লোপেজ তাকে অনুসরণ করল। বাকি দুজন দাঁড়িয়ে থাকল দরজার বাইরে।

কামরাটির বড়ই দৈন্য দশা। ঘিঞ্জি এবং নোংরা ঘরের মাঝখানে রাখা কাঠের টেবিলটির দিকে এগিয়ে গেল ডি ক্রেসপেডেস। ওখানে বসল। রিভলভার হোলস্টারের ফ্ল্যাপের বোতাম খুলে নিল যাতে প্রয়োজনে ঝট করে অস্ত্রটি বের করে নিতে পারে। একজন সৈন্যকে বলল, জায়গাটা সার্চ করো।

লোপেজ অস্বস্তি নিয়ে বলল, হুজুর, এখানে আর কেউ নেই–আমার স্ত্রী ছাড়া।

পাশের কামরায় ঢুকল নিগ্রো। ডি ক্রেসপেডেস বলল, দ্যাখো তো ওর কাছে কোনো বন্দুক ফন্দুক আছে কিনা।

অপর সৈনিক তার মস্ত হাত দিয়ে লোপেজের শরীর হাতড়ে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরবারিটি তুলল লেফটেনেন্ট। একটা দীর্ঘ, অস্বস্তিকর নিরবতা নেমে এল।

পাশের কামরা থেকে নিগ্রোটা বেরিয়ে এল এক কিউবান মহিলাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে।

মহিলার দিকে তাকাতেই ডি ক্রেসপেডেসের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মহিলা দৌড়ে নিয়ে লোপেজকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে সাদা মুখ। তার পরনে সাদা ব্লাউজ এবং স্কার্ট, খালি পা। ডি. ক্রেসপেডেসের মনে হলো এমন সুন্দরী নারী জীবনে দেখেনি। গোঁফ মুচড়ে নিয়ে সে হাসল। তার হাসি দেখে লোপেজ বউকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে সেঁটে রাখল।

ডি ক্রোপেডেস বলল, তুমি এখানে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ। কোথায় সেগুলো?

ডানে বামে মাথা নাড়ল লোপেজ। আমার কাছে কোনো অস্ত্র নাই, হুজুর। আমি গরিব চাষা অস্ত্র নিয়ে আমার কোনো কাজ কারবার নাই।

মহিলার ওপর চোখ বুলাল ডি ক্রেসপেডেস। মেয়েটার বুক দুটো দারুণ। মেয়েটিকে দেখে সে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল বলে নিজেরই ওপরেই বিরক্ত হলো। খানিক অধৈর্য গলায় বলল, কথাটা এখুনি স্বীকার করলে তোমার জন্যই ভালো হবে, হে।

মহিলা কাঁদতে শুরু করল। লোপেজ তার কাঁধে হাত রাখল। কেঁদো না, বলল সে। ইনি রিকার্ডো ডি ক্রেসপেডেস।

শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়াল লেফটেনেন্ট। ও ঠিকই বলেছে। লাল টকটকে চোখ জোড়া ঘোরাল সে। মহিলা তার লালসাপূর্ণ চাউনি দেখেই বুঝে ফেলেছে লোকটার মতলব খারাপ।

মরিয়া সুরে লোপেজ বলল, হুজুর, আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে–

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ডি ক্রেসপেডেস। সে সৈন্যদের আদেশ দিল বাড়ি খুঁজে দেখতে কোথাও অস্ত্র লুকানো আছে কিনা। নিগ্রোরা অনুসন্ধান শুরু করলে সে সজোর টানে লোপেজের কাছ থেকে সরিয়ে আনল মহিলাকে। এদিকে এসো, বলল সে। আমি তোমাকে দেখতে চাই।

মুখ হাঁ করল লোপেজ কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। তার চোখ আধবোজা হয়ে এল। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। জানে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।

মহিলা ক্রেসপেডেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাতে বুক ঢেকে। ভয় ঢুকে গেছে রক্তে।

আমি এখানে কেন এসেছি জানো? মহিলার উন্মুক্ত বাহুতে হাত রাখল লেফটেনেন্ট। বিশ্বাসঘাতকরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। এখানে অস্ত্র লুকানো আছে। আমরা জানি। কোথায় ওগুলো?

ভীরু মেষশাবকের মত কাঁপছে মহিলা, লেফটেনেন্টের পাশে থেকে সরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। বলল, হুজুর, আমার স্বামী একজন ভালো মানুষ। সে অস্ত্রশস্ত্রের কথা কিছু জানে না।

জানে না? ডি ক্রেসপেডেস মহিলাকে কাছে টানল। তোমরা ওই সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে কিছু জানো না? মাচাডাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না?

সামনে এগিয়ে এল লোপেজ। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল স্ত্রীকে। আমরা কিছুই জানি না, হুজুর।

ডি ক্রেসপেডেস টেবিলের পাশ থেকে সরে গেল। কঠোর চেহারা। এ লোকটাকে ধরো। খেঁকিয়ে উঠল সে।

এক সৈনিক লোপেজের হাত মুচড়ে পিঠের কাছে ঠেসে ধরল।

মহিলা তার ঘন চুল খামচে ধরল। বিস্ফারিত চোখ। ওহ না... না....।

ডি ক্রেসপেডেস নিজে সার্চ পার্টিতে অংশ নিল, কিন্তু পেল না কিছুই। আবার রোদে বেরিয়ে এল সে, বাকি দুই সৈনিককে চিৎকার করে আদেশ দিল খামারের বাইরের

অংশটা খুঁজে দেখতে। তারপর ফিরে এল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকাল লোপেজের দিকে। অস্ত্রগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? বলল সে। জলদি বলো।

মাথা নাড়ল লোপেজ। আমরা অস্ত্রের ব্যাপারে কিছু জানি না, হুজুর।

সৈনিকের দিকে ফিরল ডি ক্রেসপেডেস। ওকে শক্ত করে ধরে রাখো। তারপর সে পা বাড়াল মহিলার দিকে। মহিলা ঘুরল ছুট দিয়ে পাশের কামরায় চলে যেতে, কিন্তু ওখানে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন সৈন্য। হাসছে। দাঁত না যেন পিয়ানোর চাবি। কী করবে সেই ভাবনায় দিশেহারা লোপেজের বউ, ডি ক্রেসপেডেস এসে খপ করে তাকে ধরে ফেলল। এক টানে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউস। মহিলা দুই হাতে বুক আড়াল করে দেয়ালে গুঁড়ি মেরে বসল। ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ডি ক্রেসপেডেস কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল লোপেজের দিকে। তুমি মরে যাওয়ার পরপরই তোমার বউকে আমি নেব। বলল সে। খাসা মাল।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল লোপেজ। সৈন্যটা এমনভাবে ওর হাত মুচড়ে ধরে রেখেছে, নড়াচড়া করতে পারছে না লোপেজ।

এক সৈনিক এমন সময় ঘরে ঢুকলে ডে ক্রেসপেডেস তাকে হুকুম দিল। এই লোকটা যতক্ষণ না কথা বলবে, একটা একটা করে ওর হাতের আঙুলগুলো কেটে ফেলবে।

চিৎকার দিল মহিলা। ডি ক্রেসপেডেসের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তার হাত ধরে আকুল গলায় বলল, সত্যি বলছি আমরা অস্ত্রশস্ত্রের কথা কিছু জানি না, হুজুর। দয়া করে ওকে মারবেন না।

ডি ক্রেসপেডেস মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ধুলো মাখা বুট জুতো দিয়ে ওর উন্মুক্ত বুকে ধাক্কা মারল। লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল মহিলা। হাত দিয়ে আড়াল করল মাথা।

সৈন্যরা লোপেজকে জোর করে বসিয়ে দিল টেবিলে। শক্ত কাঠের ওপর টেনে মেলে ধরল হাত। তারপর বেয়োনেটকে ছোট কুঠারের মতো ব্যবহার করে এক নিগ্রো এক কোপে লোপেজের একটা আঙুল কেটে ফেলল।

ডি ক্রেসপেডেস বসে বসে দেখল ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্ত টেবিল থেকে গড়িয়ে টপটপ করে মেঝেতে পড়ছে। সে মুখ বিকৃত করে সিধে হলো।

লোপেজের বন্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মৃদু আর্তনাদ ভেসে এল। দুই সৈন্য, যারা ওকে ধরে রেখেছে, এবার পালা বদল করল লোপেজের হাত টেবিলের ওপর ঠিকঠাক মেলে ধরতে।

ও কথা না বলা পর্যন্ত, বলল ডি ক্রেসপেডেস। জ্যাকেট খুলে সোর্ড বেল্ট খুলে ফেলল।

নিগ্রো বেয়োনেট তুলে নিয়েই সাঁই করে নামিয়ে আনল। হাড়ে ইস্পাত ঢুকে যেতে কট করে শব্দ হলো। আঙুল কেটে কাঠের মধ্যে ঢুকে গেল ফলা। ফলাটা বের করতে বেগ পেতে হলো সৈনিককে।

ডি ক্রেসপেডেস তার জ্যাকেট এবং সোর্ড বেল্ট টেবিলের ওপর রেখে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। ঘোঁত ঘোত করতে করতে কুঁকল। তারপর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল অপর কামরাটিতে। মহিলাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানায়। তারপর ফিরে এসে লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের ভেতরটা ভীষণ গরম যদিও জানালা দিয়ে ঢুকতে পারছে না রোদ।

মহিলা কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে। হাঁটু জোড়া ভাঁজ হয়ে চিবুকে ঠেকে আছে। চোখ বুজে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে। মোটকা শরীর নিয়ে বিছানায় উঠে এল ডি ক্রেসপেডেস, মহিলাকে ধরে চিৎ করে শোয়াল। তারপর হাতের জোরে চাপ দিয়ে ভাঁজ করা হাঁটু সমান করল। গা থেকে বাকি কাপড়টুকুও টেনে ছিঁড়ল। তার কোনো তাড়া নেই। তবে মহিলা তাকে ধাক্কা মেরে শরীরের ওপর থেকে ফেলে দিতে চাইলে সে জোরে ঘুসি। মারল বুকে, যেন পেরেক গাঁথল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল বেচারীর মুখ।

ডি ক্রেসপেডেস অভিজ্ঞতা থেকে জানে শক্ত, কাঠ হয়ে থাকা শরীর তাকে কোনো আনন্দ দিতে পারবে না তাই সে মহিলাকে শারীরিকভাবে ভেঙে ফেলতে মনস্থ করল।

দুই হাত রাখল মহিলার দুই বাহুর ওপর এবং নরম পেশীর মধ্যে ডেবে যেতে লাগল আঙুল। চোখ খুলে গেল মহিলার। আর্তনাদ করল। তার ওপর ঝুঁকে এল ডি ক্রেসপেডেস এবং বিশাল শরীর দিয়ে চেপে ধরে মোটা মোটা আঙুল মহিলার শরীরের আরও গভীরে ঢুকিয়ে দিল। ভয়াবহ ব্যথায় মহিলা কাঁদতে থাকল, প্রতিহত করার শক্তি নেই, নরম কাদা হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। ডি ক্রেসপেডেস যখন মহিলার শরীরে প্রবেশ করল ততক্ষণে সে একদম শান্ত হয়ে গেছে, শুধু নিঃশব্দ কান্নায় অঝোরে জল ঝরছে চোখ বেয়ে।

এদিকে সৈন্যদের অত্যাচারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে লোপেজ। এক সৈনিক এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল ললাপেজের মাথায়। জ্ঞান ফিরে পেল সে। আবার শুরু হলো নির্যাতন। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে না পেরে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সৈন্যরা। ওরা তাকে হত্যা করল।

.

ডি ক্রেসপেডেস রুম থেকে বেরিয়ে দেখে তার সৈন্যরা অপোবদনে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোপেজের দিকে তাকিয়ে বুট জুতো দিয়ে ঠেলা মারল। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে

নিয়ে হাই তুলল। ও কি কথা বলেছিল? উদাস গলায়। জিজ্ঞেস করল সে। ভাবছিল কতটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ফিরতে হবে ব্যারাকে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে উঁড়িতে শক্ত করে বাঁধল সিটবেল্ট। মাথায় চড়াল ক্যাপ। তারপর আবার ফিরে গেল লোপেজের কাছে। ওর দিকে তাকিয়ে প্রায় আপনমনেই বলল, হয়তো লোকটা অস্ত্র সম্পর্কে সত্যি কিছু জানত না। ওরা এর আগেও এরকম ভুল খবর দিয়েছে। সে ত্যাগ করে ফিরল দরজায়।

সোলজাররা যে যার রাইফেল তুলে নিয়ে তার পেছন পেছন এগোল। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লেফটেনেন্ট। ওই মহিলা, খিটখিটে গলায় বলল সে, আমি তো মহিলার কথা ভুলেই গেছিলাম। সে এক সৈন্যের দিকে তাকাল। ওর কাছে যাও। তোমার বেয়োনেট ব্যবহার করবে।

চোখ ঝলসানো রোদে দাঁড়িয়ে লেফটেনেন্ট ভাবছিল কতই না ভালো হতো যদি মহিলা তাকে ভালবাসত। ক্রন্দনরত নারীর কাছ থেকে খুব কমই তৃপ্তি পাওয়া যায়। তবু একেবারে যে মন্দ লেগেছে তা নয়। নারীদেহ তার খুব দরকার হয়।

সৈন্যটি বেরিয়ে এলে তাকে তার বেয়োনেট পরিষ্কার করার সময় দিল ওরা। তারপর এবড়ো খেবড়ো জমিনে পা ফেলে দৃঢ় ভঙ্গিতে এগোল ব্যারাকের দিকে।

হপ ফ্রগ – এডগার অ্যালান পো

রাজামশায় ঠাট্টাতামাসা পেলে দুনিয়া ভুলে যেতেন। বড় রঙ্গপ্রিয় ছিলেন ভদ্রলোক। বেঁচেছিলেন যেন কেবল রঙ্গব্যঙ্গের জন্যেই। তাঁর মন জয় করার নিশ্চিন্ত পন্থা হলো হাসির গল্প বলা এবং জমিয়ে বলে পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া।

রাজামশায় যদি নিজে এত আমুদে হন তো তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যরাও আমুদে হতে বাধ্য। সাতজন মন্ত্রীও নাম কিনেছিলেন ভঁড়ামোর জন্যে। রাজাকে অনুকরণ করতে গিয়ে রাজার মতই নাদাপেটা তেল চকচকে ভুড়িদাস বাবাজী হয়ে গিয়েছিলেন সাতজনই। মানুষ মোটা হলেই ভাঁড়ামো করে, না, ভাঁড়ামো করতে করতে মোটা হয়ে যায়-তা বলতে পারব না। চর্বির মধ্যে সঙ সাজার গুণ আছে কিনা, তাও বলতে পারব না। শুধু জানি, রোগা লিকলিকে হাড্ডিসার ভাঁড়েরা কখনো নাম কিনতে পারেনি।

রাজামশায় কিন্তু স্থূল রসিকতা ভাল বুঝতেন। সূক্ষ্ম রসিকতার কদর বুঝতেন না। কনুইয়ের পুঁতো দিয়ে হাসাতে জানতেন, কথার কারিকুরি। দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন না। বেশি সূক্ষ হাস্যপরিহাস সহ্য হত না–হাঁপিয়ে উঠতেন। মোদ্দা কথা, মৌখিক রঙ্গতামাশার চাইতে পছন্দ করতেন গাড়োয়ানি ইয়ার্কি।

এ গল্প যে সময়ের, তখন রাজরাজড়াদের সভাগৃহে মূর্খ ভড়েদের অভাব ছিল না। ভাঁড় না হলে রাজসভা জমত না। তারা চোখা চোখা বুলি আর ধারালো বুদ্ধি দিয়ে হাসির বোমা ফাটিয়ে ছাড়ত সভাগৃহ। রাজার অনুগ্রহ পেতে কে না চায়?

আমাদের এই রাজাটি একজন উজবুক ভাঁড় মোতায়েন রেখেছিলেন। সেরা উজবুক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর উজবুক মন্ত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে-নিজেকেও উজবুক শ্রেণী থেকে বাদ দেননি।

তাঁর সংগ্রহীত পেশাদার ভড় শুধু মূর্খ নয়, বিকৃত-অঙ্গ এবং বেঁটে বামন। ভাঁড়ের মত ভাঁড়। এ ভাঁড়ের দাম তিনগুণ তো হবেই। রাজসভায় বেঁটে বামন আকছার দেখা যেত সেকালে। বামনরা মূর্খই হয়। তাই তাকে ছাড়া রাজসভার একঘেয়েমি ঘুচতো না। যে কোন রাজসভার অলস দিনগুলো যেন ফুরতে চায় না–মনে হত বড্ড বেশি লম্বা। এ অবস্থায় রাজারা চাইত ভাঁড় আর বামন–দুজনকেই। ভাঁড় হাসাবে আর বামনকে দেখে হাসবেন। কিন্তু আগেই বলেছি, শতকরা নিরানব্বই জন ভাড়ই চালকুমড়োর মত বেঢপ মোটা হয়। সেক্ষেত্রে হপ ফ্রগ একাধারে তিন তিনটে গুণের অধিকারী হওয়ায় রাজার ভারী পছন্দ তাকে।

হপ-ফ্রগ এই বেঁটে বিকৃতাঙ্গ ভাঁড়ের নাম। এ নাম সাতজন মন্ত্রীর দেওয়া। কারণ, হপ-ফ্রগ সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। এক পায়ে ব্যাঙ তড়কা লাফ আর কেঁচোর মত কিলবিলিয়ে গতি-এই দুটো জুড়ে দিলে যে চলনভঙ্গী, হপ-ফ্রগ হাঁটে সেইভাবে। রাজার

ধারণা তিনি অতি সুপুরুষ (যদিও তাঁর মাথা হাঁড়ির মত এবং পেট জালার মত।)-তাই কদাকার হপ ফ্রগকে দেখলেই যেন তাঁর কাতুকুতু লাগে।

পায়ের গড়ন অস্বাভাবিক হওয়ার দরুণ হপ-ফ্রগকে পথ চলতে হত ঐভাবে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন বলিষ্ঠ মাংসপেশী সমৃদ্ধ একজোড়া বাহু। ফলে, গাছে উঠতে বা দড়ি বেয়ে ঝুলতে জুড়ি ছিল না তার। বাচ্চা। বাঁদর আর চঞ্চল বেঁজির মত অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় খেলা দেখাতে পারত দড়ি বা গাছে। তখন আর তাকে ব্যাঙ বলে মনে হত না।

হপ-ফ্রগ কোন দেশে জন্মেছিল জানি না। নিশ্চয় রাজার এলাকা থেকে অনেক দূরে কোন অসভ্য অঞ্চলে। জোর করে ধরে আনা হয়েছিল তাকে তার জন্মস্থান থেকে। আনা হয়েছিল আরো একটি বামন মেয়েকে। মাথায় সে হপ-ফ্রগের চেয়ে সামান্য খাটো। দুজনকেই উপহার পাঠানো হয়। রাজাকে খোসামোদ করার জন্য।

মেয়েটির নাম ট্রিপেটা। বামন হলেও নিখুঁত সুন্দরী সে। ভাল নাচতে পারত। সুতরাং সবাই ভালবাসত তাকে। হপ ফ ব্যায়ামবীর হলে কি হবে, কারোর সুনজরে ছিল না। ট্রাপেটা আর হপ-ফ্রগের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল দুজনেই বামন বলে। দুজনেই দুজনকে নানাভাবে উপকার করত।

কি একটা উপলক্ষে রাজার খেয়াল হলো মুখোশ-নৃত্যের আসর বসাবেন। এ সব ক্ষেত্রে হপ-ফ্রগ আর ট্রিপেটার ডাক পড়ে সবার আগে। কেননা দুজনেরই উর্বর মাথা থেকে

নানারকম পরিকল্পনা বেরোয়। বিশেষ করে হপ-ফ্রগ এমন সব চরিত্র কল্পনা করত, জামাকাপড় বানাতো, মুখোশ নাচের ছন্দ আবিষ্কার করত-যা কেউ ভাবতেও পারে না।

উৎসবের রাত এসে গেল। কুঁড়েমির জন্যে রাজা এবং তাঁর সাত মন্ত্রী কিন্তু নিজেদের জন্যে কোন যোগাড়যন্ত্র করেননি। অথচ নিমন্ত্রিত অতিথিরা সাতদিন আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে–হরেকরকম পোশাক আর মুখোশ বানিয়ে নিয়েছে। যে ঘরে নাচ হবে, সে ঘরটিও ট্রিপেটার তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। সাজেন নি কেবল রাজা আর তার মন্ত্রীরা। রাত ঘনিয়ে আসতেই টনক নড়ল সবার। ডাক পড়ল দুই বামনের।

ওরা এসে দেখল মন্ত্রীদের নিয়ে মদ্যপানে বসেছেন রাজা। হপ-ফ্রগ মদ সহ্য করতে পারত না একদম। মদ খেলেই মাত্রা ছাড়া উত্তেজনায় তুরুক–নাচ নাচত, রাজা তা জানতেন। মজা দেখাবার জন্যে জোর করে ওকে মদ গেলাতেন।

সেদিনও হইহই করে উঠলেন হপ-ফ্রগকে দেখে–এসো, এসো। এক ঢোক খেয়ে যাও–মগজ সাফ হয়ে যাবে।

হপ-ফ্রগ রসিকতা করে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পারল না নাছোড়বান্দা রাজার সঙ্গে। সেদিন আবার ওর জন্মদিন। দেশের বন্ধু বান্ধবদের জন্যে মন কেমন করছিল। রাজা তা জেনেই খোঁচা মারলেন অদৃশ্য বন্ধুদের উল্লেখ করে।

বললেন, নাও, নাও। একটু গিলে নাও। মনে কর অদৃশ্য বন্ধুদের সঙ্গে খাচ্ছ?

কথাটা তীরের মত বিধল হপ-ফ্রগের মনে। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল চোখ বেয়ে।

দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন সপারিষদ রাজামশায়। খুব হাসতে পারে তো হপ-ফ্রগ! হাপুসনয়নে কি রকম কাঁদছে দেখো!

কেঁদেও নিস্তার পেল না হপ-ফ্রগ। রাজার হাত থেকে মদের গেলাস নিয়ে খেতে হলো এক চুমুকে! দুচোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল সুরার কারণে।

ভীষণ মোটা প্রধানমন্ত্রী বললেন– এবার কাজের কথা।

হ্যাঁ, এবার কাজের কথা, বললেন রাজা। হপ-ফ্রগ, নতুন কিছু চরিত্র বাতলে দাও তো। বলে হেসে গড়িয়ে পড়লেন রাজা। অগত্যা হাসতে হলো সাত মন্ত্রীকেও।

হাসল হপ ফ্রগও। কিন্তু ফাঁকা হাসি।

হলো কি তোমার? অসহিষ্ণুভাবে বললেন রাজা–মাথা খেলছে না বুঝি?

ভাববার চেষ্টা করছি, বিমূঢ়ভাবে বলল হপ-ফ্রগ। মদ খেয়ে মাথা তার তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, ভাববার শক্তি নেই।

চেষ্টা করছো? মাথাটা এখনো সাফ হয়নি দেখছি–নাও, আর এক পেয়ালা খাও!

হপ-ফ্রগের তখন দম আটকে আসছে–চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

রেগে গেলেন রাজা–খেতে বলছি না?

দ্বিধায় পড়ল বামন। রেগে লাল হয়ে গেলেন রাজা। মন্ত্রীরা আরো উস্কে দিলেন তাঁকে। ভয়ে পার হয়ে গেল ট্রিপেটা। সে রাজার পায়ের কাছে বসল-মিনতি করে বলল বন্ধুকে ছেড়ে দিতে।

রাজা তো হতবাক! মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয়! কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঠেলে ফেলে দিয়ে মদের গেলাসের সবটুকু মদ ছুঁড়ে দিলেন ট্রিপেটার মুখের ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ট্রিপেটা। ক্ষীণতম দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল না। গিয়ে বসল টেবিলে।

আধমিনিটটাক কোনো শব্দ নেই। গাছের পাতা পড়লে বা পাখির পালক উড়ে এলেও শোনা যায়, এমনি নৈঃশব্দ। তারপর সেই অসহ্য নীরবতা ভঙ্গ হলো একটা চাপা দাঁত কড়মড়ানির শব্দে। মনে হলো যেন ঘরের চার কোণ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল ভয়াবহ শব্দটা।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজা। তেড়ে গেলেন হপ-ফ্রগকে–ফের যদি ও রকম আওয়াজ করবি তো–

হপ-ফ্রগ মদের নেশা কাটিয়ে উঠেছিল। রাজার চোখে চোখ রেখে বললে শান্তকণ্ঠে, আমি? এমন আওয়াজ করা আমার পক্ষে কি সম্ভব?

একজন মন্ত্রী বলল –আমার তো মনে হলো আওয়াজটা এল ঘরের বাইরে থেকে। কাকাতুয়া জানালা বা খাঁচা ঠোকরাচ্ছে বোধ হয়।

হতে পারে। গরগর করে বললেন নিষ্ঠুর রাজা। আমার কিন্তু মনে হলো ঐ বেঁটে বদমাসের মুখ থেকেই বেরোলো আওয়াজটা।

শুনেই বড় বড় দাঁত বের করে হেসে ফেলল হপ ফ্রগ। রাজা এমন হকচকিয়ে গেলেন যে সভার মাঝে ভাঁড়ের হাসি দেখে প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেলেন। তবে হপ-ফ্রগ শক্ত

দাঁতের হাসি গোপন করে প্রশান্ত কণ্ঠে আরো মদ্যপান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই রাজার রাগ জল হয়ে গেল।

এক পেয়ালা মদ চেঁ-চো করে মেরে দিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে মুখোশ নাচের অভিনব পরিকল্পনা শোনাতে বসল হপ-ফ্রগ। মদ খেয়ে তিলমাত্র বিকার ঘটেছে বলে মনে হলো না। জীবনে যেন মদ স্পর্শ করেনি, এমনি শান্ত, সমাহিত কণ্ঠে বললে –আইডিয়াটা মাথায় এল রাজামশায়ের মদ ছোঁড়া দেখে আর জানালার বাইরে কাকাতুয়ার ঠোঁটে বিচ্ছিরি আওয়াজটা শুনে। পরিকল্পনাটা একেবারেই অভিনব-গতানুগতিক নয় মোটেই। এ নাচ আমরা। নাচি আমাদের দেশে। কিন্তু এখানে এ জিনিস একদম নতুন-দরকার কিন্তু আট জন।

হো-হো করে হেসে রাজা বললেন–বারে আমরা তো আটজনই!

বিকৃত বামন বললে-–এ নাচের নাম শিকলবাঁধা আট ওরাংওটাং। অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে নাচের সার্থকতা।

করব! করব! ভাল অভিনয় করব! লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন রাজা।

এ খেলায় সব চেয়ে বড় মজা হলো, মেয়েরা দারুণ ভয় পায়। বলল হপ-ফ্রগ।

তাই তো চাই! তাই তো চাই! সে কি আনন্দ আটজনের। হপ-ফ্রগ বলল –আপনাদের ওরাংওটাং সাজানোর ভার আমার। অবিকল ওরাংওটাং সেজে ঘরে ঢুকলে অভ্যাগতরা চিনতেও পারবে না আপনাদের মনে করবে সত্যিকারের ওরাংওটাং-পালিয়ে এসেছে খাঁচা ভেঙে। আপনারা মিছিমিছি তাড়া করবেন, বিকট চেঁচাবেন-দারুণ ভয় পাবে সকলে-চেঁচামেচি, হুটোপুটি শুরু হয়ে যাবে। ঘর ভর্তি মেয়ে-পুরুষরা দামী দামী জামাকাপড় পরে থাকবে-অথচ আপনারা আটজনে কদাকার সাজে সেজে থাকবেন। ফারাকটা অবিশ্বাস্য হওয়ায় মজা জমবে আরো বেশি।

ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, বলে মন্ত্রীদের নিয়ে উঠে পড়লেন রাজা। অনেক দেরি হয়ে গেছে তৈরি হতে হবে তো!

.

খুব সহজেই আটজনকে ওরাংওটাং সাজিয়ে দিল হপ-ফ্রগ। আগে টাইট শার্ট আর পাজামা পরালো প্রত্যেককে। তার ওপর বেশ করে লাগাল আলকাতরা। একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করলেন-পালক লাগানো হোক আলকাতরার ওপর। হপ-ফ্রগ আপত্তি করল পালক নয়, ওরাংওটাংয়ের গায়ের লোম নকল করতে পারে শুধু পাট। পাটের পুরু স্তর চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়া হলো আলকাতরার ওপর। তারপর একটা শেকল জড়ানো হলো আটজনের কোমরে। গোল হয়ে দাঁড়াল আটজনে-এক শেকলে বাঁধা অবস্থায়। বাড়তি

শিকলটা বৃত্তের মাঝখানে কোণাকুণি করে রেখে দুটি ব্যাস তৈরি করল হপ ফ্রগ। বোর্ণিতে শিম্পাঞ্জী ধরা হয় ঠিক এই কায়দায়।

ওরাংওটাং পৃথিবীর খুব কম লোকই দেখেছে। আটজনের অতি কদাকার বীভৎস সাজসজ্জা দেখে তাই কারো বোঝবার উপায় রইল না যে ওরা ছদ্মবেশী মানুষ সত্যিকারের বনমানুষ নয়।

যে ঘরে মুখোশ নাচ হবে, সেটি গোলাকার। ছাদের ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র স্কাইলাইট দিয়ে সূর্যালোক আসে। সেখানে দিয়েই একটি শিকল মেনে এসেছে ঘরের মধ্যে। শিকল থেকে ঝোলে প্রকান্ড ঝাড়বাতি। তাতে জ্বলে মোমবাতি। শিকলটা ছাদের ফুটো দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়েছে। কপিকলের সাহায্যে ভারী ঝাড় বাতিকে তোলা নামা করা হয় বাইরে থেকে।

এ ঘরের সাজসজ্জার ভার ট্রিপেটার ওপর। কিন্তু ঠান্ডা মাথা হপ-ফ্রগ তাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে এ ব্যাপারে। তাই ঝাড়বাতিটাকে সরিয়ে ফেলা হলো ঘর থেকে। কারণ, এই গরমে মোমের ফোঁটা পড়ে অভ্যাগতদের মূল্যবান পোশাক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার বদলে দেয়ালে জ্বলতে লাগল পঞ্চাশ যাটটা বড় মশাল।

রাত বারোটার সময়ে পাশবিক চিৎকার করতে করতে আটটা ওরাংওটাং ঢুকল সেই ঘরে। ঘরে তখন আর তিল ধারণের জায়গা নেই। সঙ্গে সঙ্গে রাজার হুকুমে সব কটা দরজা বন্ধ করে চাবিটা দেওয়া হল হপ-ফ্রগের হাতে।

আতঙ্ক চরমে উঠল আটটা বীভৎস মূর্তি দেখে আর তাদের অপার্থিব হুঙ্কার শুনে। বুদ্ধি করে আগেই রাজা হুকুম দিয়েছিলেন, অভ্যাগতরা অস্ত্র বাইরে রেখে ঘরে ঢুকবেন। নইলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাঘাতে নিহত হতেন। সপারিষদ রাজামশায়।

সেকী হট্টগোল! ঠেলাঠেলিতে ছিটকে পড়ল নরনারীরা! ঝনঝন শব্দে শিকল বাজিয়ে এলোপাতারি ছুটছে আট ওরাংওটাং। কারো খেয়াল নেই। ছাদের দিকে। থাকলে দেখতে পেত ঝাড়বাতির সেই শিকলটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে মেঝের দিকে-ডগায় ঝুলছে একটা হুক!

ঠিক সেই সময়ে হুল্লোড় করতে করতে আর মনে মনে পেট ফাটা হাসি হাসতে হাসতে রাজা আর মন্ত্রীরা এসে পড়লেন ঝুলন্ত হুকের তলায়। তৈরি হয়ে ছিল হপ-ফ্রগ। টুক করে হুকটা আটকে দিল কোণাকুণিভাবে লাগানো শিকল দুটির ঠিক মাঝখানে। তৎক্ষণাৎ হ্যাঁচকা টানে নাগালের বাইরে উঠে স্থির হয়ে গেল হুকটা। ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো আটজন ওরাংওটাং।

প্রথমে চমকে উঠলেও এখন হো হো করে হেসে উঠল অভ্যাগতরা। এতক্ষণে সবাই বুঝল, পুরো ব্যাপারটা সাজানো এবং হাস্যরসের জন্যই পরিকল্পিত। নরবানরদের দুর্গতি দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল প্রত্যেকের।

হাসির অট্টরোল ছাপিয়ে শোনা গেল হপ-ফ্রগের তীক্ষ্ণ চীৎকার-ওদের ভার আমার! আমি ওদের চিনি–আপনাদেরও চিনিয়ে দেব এখুনি।

বলেই, হঁচড় পাঁচড় করে উঠে গেল অভ্যাগতদের ঘাড়ের ওপর। ঘাড়ে পা দিয়েই লাফাতে লাফাতে গেল দেওয়ালের কাছে-একটা জ্বলন্ত মশাল খামচে ধরে ফিরে এল সেই পথেই। এক লাফে গিয়ে উঠল রাজার মাথায়। সেখান থেকে বিদ্যুৎগতিতে শিকল বেয়ে উঠে গেল খানিকটা ওপরে। তারপর মশালটা নামিয়ে ওরাংওটাংদের মুখ দেখতে দেখতে বলল বিষম তীব্র কণ্ঠে–বলছি, বলছি, এখনি বলছি ওরা কারা!

আটজন ওরাংওটাং সমেত অভ্যাগতরা তখন বেদম হাসিতে লুটিয়ে পড়তে পড়লে বাঁচে। হাসাতেও পারে বটে ভাঁড়টা! ঠিক তখনি তীক্ষ্ম শিষ দিয়ে উঠল হপ-ফ্রগ। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাতের হ্যাঁচকা টানে তিরিশ ফুট ওপরে উঠে গেল শিকলটা, টেনে তুলে নিয়ে গেল আট ওরাংওটাংকে ছটফট করতে লাগল আটটা মিশমিশে কালো কুৎসিত মূর্তি ছাদের স্কাইলাইটের কাছে।

হপ-ফ্রগ কিন্তু তখনো নির্বিকারভাবে ঝুলছে শিকল ধরে এবং যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে জ্বলন্ত মশাল নাড়ছে ওরাংওটাংদের মুখের কাছে।

সব চুপ। ঘর নিস্তব্ধ। দারুণ অবাক হয়ে অভ্যাগতরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে নতুন খেলা। উঁচ পড়লেও তখন শোনা যায়, এমনি স্তব্ধতা বিরাজ করছে অত বড় ঘরে।

আচমকা সেই থমথমে নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে শোনা গেল একটা আশ্চর্য শব্দ। দাঁতে দাঁতে পেষার রক্ত জল করার আওয়াজ। ঠিক এই শব্দই শোনা গিয়েছিল রাজামশায় যখন মদ ছুঁড়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলেন ট্রিপেটার মুখ। তখন শব্দের উৎস ধরা যায় নি-এখন ধরা গেল।

আওয়াজটা আসছে হপ-ফ্রগের দাঁতের পাটির মধ্য থেকে। শূদন্তের মত দাঁত কিড়মিড় করছে হপ-ফ্রগ, মুখের কোণ দিয়ে বেরুচ্ছে ফেনা-জ্বলন্ত চোখে উন্মত্ত ক্রোধে চেয়ে আছে রাজা আর তাঁর সাত মন্ত্রীর ঊর্ধ্বমুখের পানে।

অমানবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বেঁটে বামন-চিনেছি! চিনেছি! এবার তোদের চিনেছি! বলে, জ্বলন্ত মশালটা নামিয়ে মুখ দেখার অছিলায় আগুন ধরিয়ে দিল রাজার গায়ে। আধমিনিটের মধ্যেই আটজনের আলকাতরা ভিজানো পাটের সাজ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। নীচের শিহরিত আতঙ্কিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েই গেল প্রতিকার করতে পারল না।

আগুন লেলিহান হয়ে উঠল। গা বাঁচাতে শিকল বেয়ে বানরের মত ক্ষিপ্রগতিতে ওপরে উঠে গেল বেঁটে–আবার দম বন্ধ করা নীরবতা নেমে এল ঘরে। জনতা মূক হয়ে চেয়ে রইল অবিশ্বাস্য এই দৃশ্যের দিকে।

তীব্র কণ্ঠে বলল বামন ভাড়-শুনুন আপনারা, শুনুন। এরা কারা এখন চিনতে পারছেন? রাজা আর তার সাত মন্ত্রী। অসহায় একটি মেয়েকে আঘাত করতে রাজার বিবেকে আটকায়নি। মন্ত্রীরা বাধা দেয়নি-বরং উসকে দিয়েছে। আর আমি? আমি হপ-গ-আপনাদের ভড়। কিন্তু এই আমার শেষ ভাঁড়ামো!

পাটের সাজ তখন আরো জোরে পটপট শব্দে জ্বলছে। আটটা কদর্য মাংসপিন্ড একত্রে ঝুলছে শেকলের প্রান্তে। পুড়ে কালো হয়ে চেনা দায়। বিকৃত বামন জ্বলন্ত মশাল জ্বলন্ত দেহগুলোর ওপর ছুঁড়ে মেরে অলস ভঙ্গীমায় উঠে গেল আরো ওপরে বেরিয়ে গেল স্কাইলাইট দিয়ে।

ছাদে দাঁড়িয়েছিল ট্রিপেটা। কপিকল ঘুরিয়ে সে-ই তুলেছে। ওরাংওটাংদের। প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছে হপ-ফ্রগকে। দুই বন্ধু ছাদ থেকে নেমে পালিয়ে গেল স্বদেশে-আর তাদের দেখা যায় নি।